প্রকাশক :

জানকীনাথ বসু

বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড

১ শংকর ঘোষ লেন

কলিকাতা—৯

শাখা :

পাটনা : এলাহাবাদ : কলিকাতা

মুদ্রাকর :

প্রভাতচন্দ্র চৌধুরী

লোক-সেবক প্রেস

৮৬-এ লোয়ার সারকুলার রোড

কলিকাতা—১৪

পদাবলী-সাহিত্যের গবেষণার পথিকৃৎ

কবিগুরুর সহচর

আচার্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

করকমলে

ভূমিকা

কিশোর বয়স হইতেই রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলীর কাব্য-সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু বৈষ্ণবধর্মের যে সাধনপ্রণালী শ্রীরূপ গোস্বামীর দ্বারা প্রদর্শিত ও নরোত্তম ঠাকুর কর্তৃক অনুসৃত হইয়াছে তাহা তিনি স্বীকার করিতে পারেন নাই। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের উপর বৈষ্ণব প্রভাব দেখাইবার বিশেষ কোন চেষ্টা এই গ্রন্থে করা হয় নাই। ১২৮২ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া অন্ততঃ ১৩৪৫ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘকালের তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে পদাবলীর রস আস্বাদনের কিরূপ পরিচয় আছে তাহা ঐতিহাসিক কালানুক্রম অনুসারে আটটি অধ্যায়ে বিচার করা হইয়াছে। কবিগুরু এইরূপভাবেই তাঁহার চিন্তাধারার আলোচনা করিতে নির্দেশ দিয়াছেন— "যে মানুষ সুদীর্ঘকাল থেকে চিন্তা করতে করতে লিখেছে তার রচনার ধারাকে ঐতিহাসিকভাবে দেখাই সংগত" (রবীন্দ্ররচনাবলী ২৪।৪৩৭ পৃঃ)।

গ্রন্থের পরিশিষ্টে রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক ১২৯২ সালে সম্পাদিত পদরত্নাবলীর পদগুলির যে পাঠ অষ্টাদশ শতাব্দীর সংকলনগ্রন্থাদিতে পাওয়া যায় তাহা মূলে ও পাঠান্তরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথধৃত পাঠ প্রদত্ত হইল। অপরিচিত ভাব, শব্দ ও সিদ্ধান্ত প্রভৃতি যাহাতে সকলে বুঝিতে পারেন সেইজন্য কোথাও কোথাও সংক্ষিপ্ত টীকা লিখিয়া দেওয়া হইল।

ত্রিশ বৎসর পূর্বে পদাবলী-সাহিত্যের অদ্বিতীয় পণ্ডিত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় পদকল্পতরুর ভূমিকায় পদরত্নাবলীর পদনির্বাচনের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছিলেন---"এই ক্ষুদ্র অথচ উৎকৃষ্ট সংগ্রহখানাও অধুনা অপ্রাপ্য হইয়াছে। সে সময়ে পদকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থের কোনও প্রামাণিক সংস্করণ প্রচারিত হয় নাই; এজন্য উক্ত পদাবলীর অনেক পদে অনেক স্থলে পাঠের ভুল রহিয়া গিয়াছে; তদ্ভিন্ন উহার পদাবলীর দুরূহ শব্দ বা বাক্যের কোনও টীকা দেওয়া হয় নাই। রবীন্দ্র-নাথের অনুমতি গ্রহণে তাঁহার কোনও শিষ্য কর্তৃক এখন পুনরায় ঐ গ্রন্থখানির একটি বিশুদ্ধ সটীক সংস্করণ প্রকাশিত হইলে নব্য শিক্ষিত সমাজে উহা বিশেষ সমাদর লাভ করিতে পারে।" গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে এই কার্যে কেহ অগ্রসর হন নাই দেখিয়া আমি অযোগ্য হইলেও এই গুরুভার মাথায় করিয়া লইলাম।

আমার কনিষ্ঠ পুত্র পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজির অধ্যাপক শ্রীমান্ ভগবান-প্রসাদ মজুমদার তথ্যাদি সংগ্রহ ব্যাপারে আমাকে অনেক সাহায্য করিয়াছেন।

নিখিল-আনন্দ কুঞ্জ
১১।১বি ওরিয়েন্ট রো
পার্ক সার্কাস ময়দানের দক্ষিণ,
কলিকাতা—১৭
১০ই বৈশাখ, ১৩৬৭

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

পদাবলীর পুনরুজ্জীবনে রবীন্দ্রনাথ

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে শিক্ষিত সমাজে বৈষ্ণব পদাবলীকে জনপ্রিয় করিবার জন্য যাঁহারা উদ্যোগী হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম না হইলেও সর্বপ্রধান হইতেছেন রবীন্দ্রনাথ। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীকে পদাবলী সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা যাইতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কিছু কিছু মাঝারি ধরণের পদ রচিত হইলেও, মূলতঃ ঐ সময় হইতেছে সংকলনের যুগ। বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর ক্ষণদা গীতি-চিন্তামণি, রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃতসমুদ্র, দীনবন্ধু দাসের সংকীর্তনামৃত নরহরি চক্রবর্তীর গীতচন্দ্রোদয়, গৌরসুন্দর দাসের কীর্তনানন্দ ও গোকুলানন্দ সেন বা বৈষ্ণবদাসের পদকল্পতরু অষ্টাদশ শতাব্দীতে সংকলিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কমলাকান্ত দাস (১৭২৮ শক বা ১৮০৬ খৃষ্টাব্দ) পদরত্নাকর এবং গৌরীমোহন দাস (১৮৪৯ খৃষ্টাব্দ) পদকল্পলতিকা সংকলন করিয়া ঐ ধারা বজায় রাখেন।

কিন্তু পদাবলীর আদর কেবলমাত্র ভজননিষ্ঠ বৈষ্ণবদের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। তাঁহারা নিভৃতে অন্তরঙ্গজনের সঙ্গে মহাজনীপদাবলী আলোচনা করিতেন এবং উহা কীর্তন করিয়া ভজনপথে অগ্রসর হইতেন। বিশুদ্ধ মনোহরসাহী ও গরাণহাটী কীর্তন সাধারণে বুঝিত না। তাঁহারা ঢপ কীর্তন, কৃষ্ণযাত্রা, পাঁচালী, কবিগান প্রভৃতি শুনিয়া দুধের স্বাদ ঘোলে মিটাইতেন। হুতোম প্যাঁচার নক্‌শায় কলিকাতাস্থ "সিমুলের শাম ও বাগবাজারের নিস্তারিণীর কেত্তনের" উল্লেখ আছে। কিন্তু তাহারা বিশুদ্ধ পদাবলী কীর্তন করিত না, আর শিক্ষিতব্যক্তিরা তাহা শুনিতে যাইতেন না। কালীপ্রসন্ন সিংহ কীর্তনের শ্রোতাদের লইয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়াছেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে যখন তিনি ঐ বই লেখেন তখন নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি পদাবলী সাহিত্যের উপর পড়ে নাই। তাঁহারা উন্নাসিকতা সহকারে পদাবলী ও কীর্তনগানকে কৃপার চক্ষে দেখিতেন। ইংরাজী শিক্ষার সব চেয়ে বেশী কুফল দেখা গিয়াছিল দেশের জনসাধারণের সহিত ইংরাজীওয়ালাদের অন্তরের যোগসূত্রের বিচ্ছেদে। যে গান, কীর্তন, কথকতায় সাধারণ লোকে যুগযুগান্তর ধরিয়া শিক্ষা ও আনন্দ পাইয়া আসিয়াছে, তাহার প্রতি কোনরূপ অনুরাগ দেখানোকে তাঁহারা কুরুচির অথবা কুসংস্কারের নিদর্শন বলিয়া মনে করিতেন। অন্যদিকে টোলের পণ্ডিতেরা শুধু পদাবলী নহে, বাংলাভাষায় লিখিত যে কোন পুস্তককেই অবজ্ঞা করিতেন।

এইরূপ মানসিক আবহাওয়ার মধ্যে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে যশোহরের সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় "মহাজনপদাবলী-সংগ্রহ" প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হইলেন। তিনি ১২৭৬ সালের ৭ই ফাল্গুন (ইংরাজী ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৮৭০) তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিলেন যে মাত্র দুইশত ব্যক্তি ঐ

গ্রন্থ একটাকা মূল্যে কিনিতে প্রতিশ্রুত হইলেই তিনি 'বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস' নামক গ্রন্থ সটীক ছাপাইতে আরম্ভ করিবেন। এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের প্রায় দেড় মাস পরে ১২৭৬ সালের ১৯শে চৈত্র তারিখে অমৃতবাজারে শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিলেন যে তিনি ঐ পুস্তকের পাণ্ডুলিপি দেখিয়াছেন; উহা খুব সুন্দর হইয়াছে; সুতরাং গ্রন্থের গ্রাহক হইয়া উহার প্রকাশে সাহায্য করা উচিত। মহাত্মা শিশিরকুমার ঐ প্রসঙ্গে আরও লিখিলেন যে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস "প্রেম পদার্থ কি, তাহা তাঁহারা অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম খণ্ড করিয়া দেখাইয়াছেন.; বৈষ্ণবধর্মেও তাঁহারা অনেক সুরস মিশাইয়াছেন। অদ্যাপি যে আমরা ঢপ ও কীর্তন শুনিয়া এত মোহিত হই, তাহার কারণ, এই সমুদায় গীতে তাঁহাদের সৃজিত রসবিন্দু মিশান হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের কবিতাতে আধুনিক ঢপ-গায়কেরা শব্দ-চাতুরী, অনুপ্রাস প্রভৃতি মিশাইয়াও উহা সম্পূর্ণ বিকট করিতে পারেন নাই। আগুন, বেগুন, গুণ, এই সমুদয় শব্দরাশির মধ্য হইতে মাঝে মাঝে এরূপ এক একটি উজ্জ্বল ভাব দৃষ্টিগোচর হয় যে, তাহাতে এই শব্দরাশি ঢাকিয়া ফেলে।" এই সম্পাদকীয় মন্তব্য হইতে একদিকে যেমন ঐ সময়ে কীর্তনের দুর্দশার কথা জানা যায়, তেমনি দেশের শিক্ষিত সমাজে পদাবলীর আদর কত কম ছিল তাহা প্রমাণিত হয়। দুই বৎসর ধরিয়া অনেক আবেদন নিবেদনের পর ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে, ১২৭৯ সালে ডিমাই ১২ পেজি সাইজের ৩৯৬ পৃষ্ঠার বইখানি বাহির হইল।* বিজ্ঞাপনে ও ভূমিকায় বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী সংগ্রহের কথা থাকিলেও ইহাতে কেবলমাত্র বিদ্যাপতির পদাবলীই মুদ্রিত হইয়াছিল। বোধ হয় আশানুরূপ গ্রাহক সংখ্যা না হওয়ার জন্য চণ্ডীদাসের পদাবলী মুদ্রিত হয় নাই।

জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় তাঁহার "মহাজনপদাবলী সংগ্রহের" একখানি প্রতিলিপি অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের পিতা গঙ্গাচরণ সরকারকে উপহার দিয়াছিলেন। "বঙ্গভাষার লেখক" নামক গ্রন্থে অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন 'যে, "জগদ্বন্ধু বাবু কর্তৃক পিতার নাম সম্বলিত 'বিদ্যাপতির পদাবলী' পাইয়া আমি মহা আনন্দিত হইলাম। সেই আনন্দ ফলস্বরূপ শ্রীযুক্ত (জজ)সারদাচরণ মিত্র মহোদয়ের সঙ্গে আমা কর্তৃক প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ প্রকাশ।" জগদ্বন্ধুবাবুর গ্রন্থপ্রকাশের দুইবৎসর পরে, ১২৮১ হইতে ১২৮৩ সালের মধ্যে 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ' প্রকাশিত হয়। উহাতে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাসের পদাবলী খণ্ডে খণ্ডে বাহির হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ জগদ্বন্ধু ভদ্র সম্পাদিত "মহাজনপদাবলী সংগ্রহের" কথা কোথাও উল্লেখ করেন নাই, কেন না ঐ গ্রন্থ প্রকাশের সময় তাঁহার বয়স এগার বৎসর মাত্র। তাঁহার বয়স যখন তের চৌদ্দ তখন তাঁহার হাতে প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ পড়ে। তাঁহার দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নিকট "এই সংগ্রহের অনিয়মিত ভাবে প্রকাশিত খণ্ডগুলি আসিত।" রবীন্দ্রনাথ ১৩৪৬ সালের প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলীর দ্বিতীয়

*২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল লাইব্রেরীতে ঐ গ্রন্থ তালিকাবদ্ধ হয়।

খণ্ডে "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র সূচনায় লিখিয়াছেন—"অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় পর্যায়ক্রমে বৈষ্ণব পদাবলী প্রকাশের কাজে যখন নিযুক্ত হয়েছিলেন, আমার বয়স তখন যথেষ্ট অল্প। সময় নির্ণয় সম্বন্ধে আমার স্বাভাবিক অন্যমনস্কতা তখনো ছিল এখনো আছে। সেই কারণে চিঠিতে আমার তারিখকে যাঁরা ঐতিহাসিক বলে ধরে নেন তাঁরা প্রায়ই ঠকেন। বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের কাল অনুমান করা অনেক সহজ। বোম্বাইয়ে মেজদাদার কাছে যখন গিয়েছিলুম তখন আমার বয়স ষোলোর কাছাকাছি, বিলাতে যখন গিয়েছি তখন আমার বয়স সতেরো। নূতন প্রকাশিত পদাবলী নিয়ে নাড়াচাড়া করছি সে আরো কিছুকাল পূর্বের কথা। ধরে নেওয়া যাক তখন আমি চোদ্দোয় পা দিয়েছি। খণ্ড খণ্ড পদাবলীগুলি প্রকাশ্যে ভোগ করবার যোগ্যতা আমার তখন ছিল না। অথচ আমাদের বাড়িতে আমিই একমাত্র তার পাঠক ছিলুম। দাদাদের ডেস্ক থেকে যখন সেগুলি অন্তর্ধান করত তখন তাঁরা তা লক্ষ্য করতেন না।" রবীন্দ্রনাথ এখানে যে কাল নির্ণয় করিয়াছেন তাহা নির্ভুল; শুধু এইটুকু মনে রাখিতে হইবে যে ১২৮১ সালে কবি তের বৎসর উত্তীর্ণ হইবার কয়েকমাস বাদে প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ প্রথম প্রকাশিত হয়। হয়তো ১২৮২ সালে রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথমে পদাবলীর সংস্পর্শে আসেন।

আধুনিক ভারতের শ্রেষ্ঠ কবির সহিত প্রাচীন বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিতার প্রথম পরিচয় একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই তিনি বহু স্থানে এই ঘটনাটির উল্লেখ করিয়াছেন। কবি তাঁহার জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন—"শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র ও অক্ষয় সরকার মহাশয়ের প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ সে সময়ে আমার কাছে একটি লোভের সামগ্রী হইয়াছিল। গুরুজনেরা ইহার গ্রাহক ছিলেন কিন্তু নিয়মিত পাঠক ছিলেন না। সুতরাং এগুলি জড়ো করিয়া আনিতে আমাকে বেশি কষ্ট পাইতে হইত না।" ঐ গ্রন্থেরই আর এক স্থানে তিনি লিখিয়াছেন যে তিনি প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ বিশেষ আগ্রহের সহিত পড়িতেন। "গাছের বীজের মধ্যে যে অংকুর প্রচ্ছন্ন ও মাটির নিচে যে রহস্য অনাবিষ্কৃত, তাহার প্রতি যেমন একটি একান্ত কৌতূহল বোধ করিতাম, প্রাচীন পদকর্তাদের রচনা সম্বন্ধেও আমার ঠিক সেই ভাবটা ছিল। আবরণ মোচন করিতে করিতে একটি অপরিচিত ভাণ্ডার হইতে একটি-আধটি কাব্যরত্ন চোখে পড়িতে থাকিবে এই আশাতেই আমাকে উৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছিল।" তাঁহার রত্ন উদ্ধার করিবার দশ বৎসরব্যাপী উদ্যম ১২৯২ সালের বৈশাখ মাসে সাফল্যমণ্ডিত হয়। ঐ কাব্যরত্নগুলিই তিনি পদরত্নাবলী নামে প্রকাশিত করেন।*

* কবি ১২৯০ সালের ভারতীতে 'বাউলের গীত' নামক প্রবন্ধে কোন ভিখারীর গান বলিয়া লিখিয়াছেন—

(ওরে) মার খেয়েছি না হয় আরো খাব;
ওরে তবু হরির নামটি দিব আয়।

কবি প্রৌঢ়বয়সে Religion of Man সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদানের সময় পদাবলী সাহিত্যের সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয়ের কথা এবং তাঁহার কাব্যের উপর উহার সুদূরপ্রসারী প্রভাবের কথা বিশদভাবে বলেন— "Fortunately for me a collection of old lyrical poems composed by the poets of the Vaishnava sect came to my hand when I was young. I became aware of some underlying idea deep in the obvious meaning of these poems. .... I was sure that these poets were speaking about the supreme Lover, whose touch we experience in all our relations of love -- the love of nature's beauty of animal, the child, the comrade, the beloved, the love that illuminates our consciousness of reality. They sang of a love that ever flows through numerous obstacles between man and Man the Divine, the eternal relation which has the relationship of mutual dependence for fulfilment that needs perfect union of individuals and the universal."

অর্থাৎ আমার খুবই সৌভাগ্যের কথা যে আমার অল্প বয়সে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কবিদের রচিত প্রাচীন গীতিকবিতার এক সংগ্রহ আমার হাতে আসে। বাহির হইতে দেখিলে যেগুলিকে প্রেমের কবিতা বলিয়া মনে হয়, তাহার ভিতর যে একটি গভীর ভাব লুকাইয়া আছে তাহা আমি জানিতে পারিলাম। আমি ঠিক বুঝিতে পারিলাম যে এই কবিরা সেই পরম প্রেমিকের কথা বলিতেছেন যাঁহার স্পর্শ আমরা অনুভব করি আমাদের সকল প্রেমের সম্বন্ধের মধ্যে—প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি প্রেম, পশুর প্রতি, শিশুর প্রতি, সখার প্রতি, দয়িতের প্রতি প্রেমের ভিতর দিয়া যে প্রেম আমাদের বাস্তবের চেতনাকে আলোকিত করে। তাঁহারা এমন এক প্রেমের কথা গাহিয়াছেন যে প্রেম অসংখ্য বাধাকে অতিক্রম করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে মানুষ ও মানুষের স্বর্গীয় সত্তার ভিতরে। সেই প্রেম এমন শাশ্বত সম্বন্ধ স্থাপন করে যাহার ভিতর উভয়ের পূর্ণত্ব লাভের জন্য একে অন্যের উপর নির্ভর করে এবং যাহার চরিতার্থতা ঘটে ব্যক্তিসত্তার সহিত বিশ্বসত্তার পরিপূর্ণ মিলনে।

রবীন্দ্রনাথ তরুণ বয়সেই যে এত তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন তাহা নহে। বৈষ্ণব পদাবলীর সৌন্দর্য ও মাধুর্য তাঁহাকে প্রথমে বিমুগ্ধ করিয়াছিল। তাহার পর তিনি কালক্রমে তাহার অন্তর্নিহিত ভাব হৃদয়ঙ্গম করেন ও সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া অনেক কবিতা রচনা করেন। সংগীত সৃষ্টিতেও বৈষ্ণব-কবিতা তাঁহার মনে কেমন অনুপ্রেরণা জাগাইয়াছিল তাহা তাঁহার মৃত্যুর সতের মাস পূর্বে "ছেলে বেলা"তে লিখিয়াছেন। তাঁহার বয়স যখন ষোল কি সতেরো, তখন গঙ্গার ধারে এক দোতালা বাড়িতে বাস করিতেছিলেন। সেই সময়ের একদিনের কথা কবি লিখিতেছেন—"নতুন বর্ষা নেমেছে। মেঘের ছায়া ভেসে চলেছে স্রো...

উপর ঢেউ খেলিয়ে মেঘের ছায়া কালো হয়ে ঘনিয়ে রয়েছে ওপারে বনের মাথায়। অনেক বার এই রকম দিনে নিজে গান তৈরি করেছি সেদিন তা হল না। বিদ্যাপতির পদটি জেগে উঠল আমার মনে এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর।' নিজের সুর দিয়ে ঢালাই করে রাগিণীর ছাপ মেরে তাকে নিজের করে নিলুম। গঙ্গার ধারে সেই সুর দিয়ে মিনে করা এই বাদল দিন আজও রয়ে গেছে আমার বর্ষাগানের সিন্দুকটিতে।

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির যুগের পর বৈষ্ণবকবিতা গভীরতর অনুভূতির বাহক হইল। শ্রীচৈতন্যের অপূর্ব প্রেমোন্মাদনা পদকর্তাদের মনে অনুপ্রেরণা জোগাইল। গৌরচন্দ্রের ভাবোপলব্ধি রাধাভাবের বিচিত্র লীলার চাবিকাঠি হইল বলিয়া প্রত্যেক কীর্তনের পালার প্রথমে গৌরচন্দ্রিকা গান করিবার রীতি প্রবর্তিত হইল। শ্রীচৈতন্যের উপর রবীন্দ্রনাথের অসীম শ্রদ্ধা ছিল।

পদরত্নাবলী প্রকাশের কয়েক মাস পরেই চিঠিপত্রে (গ্রন্থাকারে ১২৯৪ সালে প্রকাশিত) তিনি লেখেন আমাদের বাঙালির মধ্য হইতেই তো চৈতন্য জন্মিয়াছিলেন। তিনি তো বিঘা কাঠার মধ্যেই বাস করিতেন না তিনি তো সমস্ত মানবকে আপনার করিয়াছিলেন। তিনি বিস্তৃত মানবপ্রেমে বঙ্গভূমিকে জ্যোতির্ময়ী করিয়া তুলিয়াছিলেন। তখন তো বাংলা পৃথিবীর এক প্রান্তভাগে ছিল তখন তো সাম্য ভ্রাতৃভাব প্রভৃতি কথাগুলির সৃষ্টি হয় নাই। সকলেই আপন আপন আহ্নিক তর্পণ ও চণ্ডীমণ্ডপটি লইয়া ছিল তখন এমন কথা কী করিয়া বাহির হইল –

'মার খেয়েছি না হয় আরও খাব
তাই বলে কি প্রেম দিব না? আয়'

এ কথা ব্যাপ্ত হইল কি করিয়া? সকলের মুখ দিয়া বাহির হইল কী করিয়া? আপন আপন বাঁশ বাগানের পার্শ্বস্থ ভদ্রাসনবাটীর মনসাসিজের বেড়া ডিঙাইয়া পৃথিবীর মাঝখানে আসিতে কে আহ্বান করিল এবং সে আহ্বানে সকলে সাড়া দিল কী করিয়া? একদিন তো বাংলাদেশে ইহাও সম্ভব হইয়াছিল। একজন বাঙালি তো একদিন সমস্ত পৃথিবীকে পাগল করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছিল এবং বাঙালিরা সেই ষড়যন্ত্রে তো যোগ দিয়াছিল। বাংলার সে এক গৌরবের দিন। তখন বাংলা স্বাধীনই থাকুক আর অধীনই থাকুক মুসলমান নবাবের হাতেই থাকুক আর স্বদেশীয় রাজার হাতেই থাকুক তাহার পক্ষে সে একই কথা। সে আপন তেজে আপনি তেজস্বী হইয়া উঠিয়াছিল। আসল কথা বাংলায় সেই একদিন সমস্ত একাকার হইবার জো হইয়াছিল। তাই কতকগুলো লোক খেপিয়া চৈতন্যকে কলসীর কানা ছুঁড়িয়া মারিয়াছিল। কিন্তু কিছুই করিতে পারিল না। কলসীর কানা ভাসিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে এমনি একাকার হইল যে জাতি রহিল না,

হল না।" কবি পদাবলী-সাহিত্য যেমন যত্নের সহিত পড়িয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্য-
শ্রীচৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যের জীবনীগ্রন্থগুলি তেমন ভাল করিয়া

পড়েন নাই। পড়িলে, নিত্যানন্দের মারখাওয়ার কথা শ্রীচৈতন্যে আরোপ করিতেন না।

গানটি নিশ্চয়ই নিত্যানন্দের উক্তি।

বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্য ভাগবতে (২।১৩) লিখিয়াছেন যে একদিন রাত্রিকালে নিত্যানন্দ নগর ভ্রমণ করিতেছেন এমন সময় জগাই মাধাই মাতাল হইয়া আসিয়া তাঁহাকে ধরিল, তাহারা

"মদ্যের বিক্ষেপে বোলে 'কিবা নাম তোর?'
নিত্যানন্দ বোলে 'অবধূত নাম মোর॥'
'অবধূত নাম শুনি মাধাই কুপিয়া।
মারিল প্রভুর শিরে মুটকী তুলিয়া॥'

এ স্থানে 'প্রভু' অর্থে নিত্যানন্দ।

লোচন তাঁহার শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে লিখিয়াছেন যে নিমাই পণ্ডিত সাঙ্গোপাঙ্গোদের সহিত একদিন পথ দিয়া কীর্তন করিয়া যাইতেছিলেন, কীর্তনের শব্দে জগাই মাধাইয়ের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় বলিয়া তাহারা খুব চটিয়া যায়।

ক্রোধেতে মাধাই ধায় হাতে লয়া দণ্ড।
সম্মুখে পাইল ভগ্ন কুম্ভ একখণ্ড॥
কলসীর কাণা সে ফেলিয়া মারে রোখে।
নির্ভরে লাগিল নিত্যানন্দের মস্তকে॥

নিত্যানন্দ প্রভু আহত হইয়াও জগাই মাধাইয়ের উপর রাগ করিলেন না; তিনি বলিলেন—

মারিলি কলসীর কাণা সহিবারে পারি।
তোদের দুর্গতি আমি সহিবারে নারি॥
মেরেছিস মেরেছিস তোরা তাহে ক্ষতি নাই।
সুমধুর হরিনাম মুখে বল ভাই॥

শ্রীচৈতন্য জাতি ও সম্প্রদায়কে ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন, চণ্ডালও ভক্ত হইলে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয় বলিয়াছিলেন এবং যবন হরিদাসের মৃতদেহ কোলে করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন এই সব ঘটনা রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। রাজা রামমোহন রায়ের বহুপূর্বেও যে একজন বাঙ্গালি ব্রাহ্মণ সামাজিক ভেদবুদ্ধি বিলোপ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন ইহাতে তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ১৩০৮ সালে তিনি বঙ্গদর্শনে 'ব্যাধি ও প্রতিকার' প্রবন্ধে লিখিলেন—"চৈতন্য যখন ভক্তিবন্যায় ব্রাহ্মণ চণ্ডালের ভেদবাঁধ ভাঙ্গিয়া দিবার কথা বলিলেন তখন যে-হীনবর্ণ সম্প্রদায় উৎফুল্ল হইয়া ছুটিল, তাহারা বৈষ্ণব হইল কিন্তু ব্রাহ্মণ হইল না।" কবি ১৩১১ সালে 'পাগল' শীর্ষক প্রবন্ধে (বিচিত্র প্রবন্ধ) শ্রীচৈতন্যের প্রতি শুধু শ্রদ্ধা নহে ভালবাসার অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছেন—"পাগল শব্দটা আমাদের কাছে ঘৃণার শব্দ নহে। খ্যাপা নিমাইকে আমরা খ্যাপা বলিয়া ভক্তি করি—আমাদের খ্যাপা-দেবতা

মহেশ্বর।" শ্রীচৈতন্যের কোন প্রামাণিক চরিতগ্রন্থে 'খ্যাপা নিমাই' আখ্যা দেখা যায় না বটে, কিন্তু 'নরহরি' ভনিতাযুক্ত একটি পদে পাওয়া যায়—

পরাণ নিমাই মোর খেপা বড় বটে গো"

পদটি অষ্টাদশ শতাব্দীর কোন সংকলন গ্রন্থে ধৃত হয় নাই। কবি এটি পদকল্পলতিকা হইতে গ্রহণ করিয়া পদরত্নাবলীতে স্থান দিয়াছিলেন। পদরত্নাবলী প্রকাশের আট নয় বৎসর পরে জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় পদটির একটি পূর্ণতর পাঠ পাইয়া তাহা গৌরপদতরঙ্গিণীতে ধরেন। কিন্তু পদটির ভাব বা ভাষার সঙ্গে নরহরি সরকারের রচনাশৈলীর সাদৃশ্য দেখা যায় না।

পদাবলী লেখা হইয়াছিল গাহিবার জন্য। সেই গানই কীর্তন। রবীন্দ্রনাথ কীর্তনের অপূর্ব উন্মাদনার কথা তাঁহার ছাব্বিশ বছর বয়সের সময় লিখিয়াছেন— "চৈতন্য যখন পথে বাহির হইলেন তখন বাংলা দেশের গানের সুর পর্যন্ত ফিরিয়া গেল। তখন এককণ্ঠ বিহারী বৈঠকি সুরগুলো কোথায় ভাসিয়া গেল। তখন সহস্র হৃদয়ের তরঙ্গ-হিল্লোলে সহস্র কণ্ঠ উচ্ছ্বসিত করিয়া নূতন সুরে আকাশে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। তখন রাগরাগিণী ঘর ছাড়িয়া পথে বাহির হইল, একজনকে ছাড়িয়া সহস্র জনকে বরণ করিল। বিশ্বকে পাগল করিবার জন্য কীর্তন বলিয়া এক নূতন কীর্তন উঠিল। যেমন ভাব তেমনি তাহার কণ্ঠস্বর—অশ্রুজলে ভাসাইয়া সমস্ত একাকার করিবার জন্য ক্রন্দনধ্বনি। বিজন কক্ষে বসিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া একটিমাত্র বিরহিনীর বৈঠকি কান্না নয়, প্রেমে আকুল হইয়া নীলাকাশের তলে দাঁড়াইয়া সমস্ত বিশ্ব জগতের ক্রন্দনধ্বনি" (চিঠিপত্র, রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ ৫২৯)।

কবি তাঁহার ছেষট্টি বৎসর বয়সে ১৩৩৪ সালে "জাভাযাত্রীর পত্রে" কীর্তনকে বাংলার জাতীয় জীবনে আরও উচ্চস্থান দিয়াছেন। জাভার লোকে যেমন নৃত্যের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে, বাংলার লোকে তেমনি কীর্তনের মাধ্যমে নিজেদের ভাব ফুটাইয়া তুলে। তিনি লিখিয়াছেন—"এক একটি জাতির আত্মপ্রকাশের এক একটি বিশেষ পথ থাকে। বাংলা দেশের হৃদয় যেদিন আন্দোলিত হয়েছিল সেদিন সহজেই কীর্তন গানে সে আপন আবেগ সঞ্চারের পথ পেয়েছে, এখনো সেটা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নি।'

বৈষ্ণব পদাবলীর মুখ্য বিষয় পরকীয়া প্রেম। পরকীয়া প্রেমের প্রবল বাধা হইতেছে সমাজ। রবীন্দ্রনাথ ১৩০৫ সালে "গ্রাম্যসাহিত্য" নামক প্রবন্ধে লেখেন— "বৈষ্ণব পদাবলীতে সেই সমাজবাধার চতুর্দিকে প্রেমের তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। এমন কি বৈষ্ণব কাব্যশাস্ত্রে পরকীয়া অনুরক্তির বিশেষ গৌরব বর্ণিত হইয়াছে। সে গৌরব সমাজনীতির হিসাবে নহে, সেকথা বলাই বাহুল্য। তাহা নিছক প্রেমের হিসাবে। ইহাতে যে আত্মবিস্মৃতি, বিশ্ববিস্মৃতি, নিন্দা-ভয়-লজ্জা-শাসনসম্বন্ধে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য, কঠিন কুলাচার-লোকাচারের প্রতি অচেতনতা প্রকাশ পায় তদ্দ্বারা প্রেমের প্রচণ্ড বল, দুর্বোধ রহস্য, তাহার বন্ধন-বিহীনতা, সমাজ-

সংসার স্থান-কাল-পাত্র এবং যুক্তিতর্ক-কার্যকারণের অতীত একটা বিরাট ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এই কারণে যাহা বিশ্বসমাজে সর্বত্রই একবাক্যে নিন্দিত, সেই অভ্রভেদী কলঙ্ক চূড়ার উপরে বৈষ্ণব কবিগণ তাঁহাদের বর্ণিত প্রেমকে স্থাপন করিয়া তাহার অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন। এই সর্বনাশী, সর্বত্যাগী, সর্ববন্ধনচ্ছেদী প্রেমকে আধ্যাত্মিক অর্থে গ্রহণ করিতে না পারিলে কাব্য হিসাবে ক্ষতি হয় না, সমাজনীতি হিসাবে হইবার কথা"। কালিদাসের কুমারসম্ভব ও অভিজ্ঞানশকুন্তলের আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সমাজবন্ধনবিহীন প্রেমকে ধিক্কৃত করিয়া বলিয়াছেন—"যে উন্মত্ত প্রেম প্রিয়জনকে ছাড়া আর সমস্তই বিস্মৃত হয়, তাহা সমস্ত বিশ্বনীতিকে আপনার প্রতিকূল করিয়া তোলে, সেই জন্য সে-প্রেম অল্পদিনের মধ্যেই দুর্ভর হইয়া উঠে, সকলের বিরুদ্ধে আপনাকে আপনি সে আর বহন করিয়া উঠিতে পারে না।" কিন্তু পদাবলী সাহিত্যে বর্ণিত রাধার উন্মত্ত প্রেমকে রবীন্দ্রনাথ সর্বান্তিঃকরণে অভিনন্দিত করিয়াছেন। তাহার কারণ—পদাবলীতে সৌন্দর্যের পরশপাথর ছুঁয়াইয়া কামকে প্রেমে পরিণত করা হইয়াছে। কবিগুরু 'গ্রাম্যসাহিত্য' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"বৈষ্ণব কবিরা সেই বন্ধননাশী প্রেমের গভীর দুর্নিবার আবেগকে সৌন্দর্যক্ষেত্রে অধ্যাত্মলোকে বহমান করিয়া তাহাকে অনেক পরিমাণে সংসারপথ হইতে মানসপথে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছেন। আমাদের সমাজের সেই চিরক্ষুধাতুর প্রেতটাকে পবিত্র গয়ায় পিণ্ডদান করিবার আয়োজন করিয়াছেন। তাঁহারা কামকে প্রেমে পরিণত করিবার জন্য ছন্দোবন্ধ কল্পনার বিবিধ পরশপাথর প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহাদের রচনার মধ্যে যে ইন্দ্রিয়বিকার কোথাও স্থান পায় নাই তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু বৃহৎ স্রোতস্বিনী নদীতে যেমন অসংখ্য দূষিত ও মৃত পদার্থ প্রতিনিয়ত আপনাকে আপনি সংশোধন করে তেমনি সৌন্দর্য এবং ভাবের বেগে সেই সমস্ত বিকার সহজেই শোধিত হইয়া চলিয়াছে।"

এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিবার চার বৎসর পরে, ১৩০৯ সালে দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ পুনরায় শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে কি ভাবে বাংলা সাহিত্য ও সংগীত সমৃদ্ধ হইয়াছে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন। কবি প্রথমে দেখাইয়াছেন কি ভাবে জীব ও ঈশ্বরের দ্বৈতবাদ উভয়ের মধ্যে প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে—"বৈষ্ণবধর্মের শক্তি হ্লাদিনী শক্তি—সে-শক্তি বলরূপিণী নহে, প্রেমরূপিণী। তাহাতে ভগবানের সহিত জগতের যে দ্বৈতবিভাগ স্বীকার করে, তাহা প্রেমের বিভাগ, আনন্দের বিভাগ। তিনি বল ও ঐশ্বর্য বিস্তার করিবার জন্য শক্তি প্রয়োগ করেন নাই, তাঁহার শক্তি সৃষ্টির মধ্যে নিজেতে নিজে আনন্দিত হইতেছে—এই বিভাগের মধ্যে তাঁহার আনন্দ নিয়ত মিলনরূপে প্রতিষ্ঠিত। শাক্তধর্মে অনুগ্রহের অনিশ্চিত সম্বন্ধ, বৈষ্ণবধর্মে প্রেমের নিশ্চিত সম্বন্ধ। শক্তির লীলায় কে দয়া পায়, কে না পায় তাহার ঠিকানা নাই; কিন্তু বৈষ্ণবধর্মে প্রেমের সম্বন্ধ যেখানে সেখানে সকলেরই

নিত্য দাবি। শাক্তধর্মে ভেদকেই প্রাধান্য দিয়াছে—বৈষ্ণবধর্মে এই ভেদকে নিত্যমিলনের নিত্য উপায় বলিয়া স্বীকার করিয়াছে।"

জীব ও ঈশ্বর তত্ত্বতঃ পৃথক্ হইয়াও প্রেমের বন্ধনে একভূমিতে সমান সমান রূপে মিলিত হইয়াছে, এইটিকে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব ধর্মের ও পদাবলী সাহিত্যের প্রাথমিক সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এই ভাবটি তাঁহার বহু কবিতার মধ্যে রূপ লইয়াছে। তাহার দৃষ্টান্ত পরে দিব। বৈষ্ণবধর্মে জীব ও ঈশ্বর যখন প্রেমের ক্ষেত্রে সমান হইয়াছে তখন মানুষে মানুষে যে বৈষম্য থাকিবে না তাহা আর বিচিত্র কি? রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন "বৈষ্ণব এইরূপে ভেদের উপরে সাম্য স্থাপনা করিয়া প্রেমপ্লাবনে সমাজের সকল অংশকে সমান করিয়া দিয়াছিলেন। এই প্রেমের শক্তিতে বলীয়সী হইয়া আনন্দ ও ভাবের এক অপূর্ব স্বাধীনতা প্রবলবেগে বাংলা সাহিত্যকে এমন এক জায়গায় উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে যাহা, পূর্বাপরের তুলনা করিয়া দেখিলে, হঠাৎ খাপছাড়া বলিয়া বোধ হয়। তাহার ভাষা, ছন্দ, ভাব, তুলনা, উপমা ও আবেগের প্রবলতা, সমস্ত বিচিত্র ও নূতন। তাহার পূর্ববর্তী বঙ্গভাষা বঙ্গসাহিত্যের সমস্ত দীনতা কেমন করিয়া এক মুহূর্তে দূর হইল, অলংকার শাস্ত্রের পাষাণবন্ধন সকল কেমন করিয়া এক মুহূর্তে বিদীর্ণ হইল, ভাষা এত শক্তি পাইল কোথায়, ছন্দ এত সংগীত কোথা হইতে আহরণ করিল? ....

..... মুক্তি কেবল জ্ঞানীর নহে, ভগবান কেবল শাস্ত্রের নহেন, এই মন্ত্র যেমনি উচ্চারিত হইল, অমনি দেশের যত পাখি সুপ্ত হইয়াছিল, সকলেই একনিমেষে জাগরিত হইয়া গান ধরিল। ইহা হইতেই দেখা যাইতেছে বাংলাদেশ আপনাকে যথার্থভাবে অনুভব করিয়াছিল বৈষ্ণবযুগে। সেই সময়ে এমন একটি গৌরব সে প্রাপ্ত হইয়াছিল, যাহা অলোকসামান্য, যাহা বিশেষরূপে বাংলাদেশের—যাহা এ-দেশ হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া অন্যত্র বিস্তারিত হইয়াছিল। শাক্তযুগে তাহার দীনতা ঘোচে নাই, বরঞ্চ নানারূপে পরিস্ফুট হইয়াছিল, বৈষ্ণবযুগে অযাচিত—ঐশ্বর্যলাভে সে আশ্চর্যরূপে চরিতার্থ হইয়াছে" (সাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী, অষ্টমখণ্ড, পৃ ৪৪৪)।

এখানে বলা প্রয়োজন যে ভারতইতিহাসে যেমন বৌদ্ধযুগ (Buddhist India), ব্রাহ্মণযুগ বলিয়া বিভাগ করাকে এখন অনৈতিহাসিক বিবেচনা করা হয়, বাংলার ইতিহাসেও তেমনি শাক্তযুগ, বৈষ্ণবযুগ বলিয়া বিভিন্ন কালকে আখ্যা দেওয়াও অযৌক্তিক। যে সময়ে চিরঞ্জীব সেনের পুত্র গোবিন্দ দাস মুর্শিদাবাদ জেলার তেলিয়া বুধুরি গ্রামে বসিয়া বৈষ্ণবপদাবলী রচনা করিতেছিলেন, সেই সময়েই মুকুন্দরাম চক্রবর্তী চণ্ডীমঙ্গল লিখিয়াছিলেন। আবার রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের সমসময়ে রাধামোহন ঠাকুর, গৌরসুন্দর দাস, উদ্ধব দাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।

১৩১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় শিল্প প্রদর্শনীক্ষেত্রে সাহিত্য-সম্মিলন

উপলক্ষে 'সাহিত্য সম্মিলন' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি পুনরায় বলিয়াছেন—"বৈষ্ণব ধর্মপ্লাবনের সময় বিশ্বপ্রেম যেদিন বাংলাদেশে মানুষের মধ্যে সমস্ত কৃত্রিম সংকীর্ণতার বেড়া ভাঙিয়া দিয়া উচ্চনীচ শুচি-অশুচি সকলকেই এক ভগবানের আনন্দলোকে আহ্বান করিল, সেইদিনকার বাংলাদেশের গান বিশ্বের গান হইয়া জগতের নিত্যসাহিত্যে স্থান পাইয়াছে।...................... বৈষ্ণবকাব্যেই আমাদের দেশের সাহিত্যকে প্রথম রাজসভার সংকীর্ণ আশ্রয় হইতে বৃহৎভাবে জনসমাজের মধ্যে বাহির করিয়া আনিল। পর্বতের গুহা ভেদ করিয়া ঝরনা বাহির হইল।" (সাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী, অষ্টমখণ্ড, পৃ-৪৯৯-৫০০; শিক্ষা, পৃঃ ১১০-১১১)

তিন চার শত বৎসর ধরিয়া বৈষ্ণব পদাবলী ভগবৎপরায়ণ বৈষ্ণব সাধকেরা আস্বাদন করিয়া আসিতেছেন। অনেক অবাঙগালী সাধুও এই পদাবলীর মাধুর্য আস্বাদন করিবার জন্য বাসুঘোষ, লোচনদাস প্রভৃতির পদ দেবনাগরী অক্ষরে লিখাইয়া লইতেন। দুইশ তিনশ বছরের প্রাচীন দেবনাগরী হরপে লেখা পদাবলীর কয়েকখানি পুথি বরানগর পাটবাড়ীর শ্রীগোরাঙগগ্রন্থমন্দিরে সংরক্ষিত আছে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ পর্যন্ত কেবল বৈষ্ণবধর্মে অনুরাগী ব্যক্তিরাই পদাবলী আলোচনা করিতেন। তাঁহারা ইহার সাহিত্যিক মূল্যে যাচাই করিতে যাইতেন না। বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগে কয়েকজন ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তি পদাবলীর কাব্য-সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করিতে অগ্রসর হন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথমে বিশ্বসাহিত্যে পদাবলীর স্থান নির্ধারণ করিতে প্রবৃত্ত হন। তিনিই সর্বপ্রথমে ঘোষণা করেন যে আধ্যাত্মিক মূল্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও পদাবলী নিছক কাব্যহিসাবে 'জগতের নিত্য সাহিত্যে' স্থান পাইবার যোগ্য। পদাবলীর অন্তর্নিহিত রসের বিশ্লেষণে তাঁহার পারদর্শীতা অতুলনীয়। একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে তাহার পরিচয় দিব। এখানে একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি।

রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানদাসের 'মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে' ইত্যাদি পদটি ১২৯২ সালে পদরত্নাবলীতে উদ্ধৃত করেন। এই পদটি তাঁহার মনে বিশেষভাবে দোলা দিয়াছিল। তিনি বহুস্থানে ইহার এই কলিটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন
ঝিমিঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ন রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে॥"

১৩২৪ সালে সবুজপত্রে ছন্দ সম্বন্ধে প্রবন্ধে তিনি এই কলিটি তুলিয়া লেখেন যে "কাব্যের লক্ষ্য হচ্ছে বিষয়কে অতিক্রম করা: সেই বিষয়ের চেয়ে বেশিটুকুই হচ্ছে অনির্বচনীয়। ছন্দের গতি কথার মধ্য থেকে সেই অনির্বচনীয়কে জাগিয়ে তোলে। বাদলার রাতে একটি মেয়ে বিছানায় শুয়ে ঘুমাচ্ছে, বিষয়টা এইমাত্র কিন্তু ছন্দ এই বিষয়টিকে

আমাদের মনে কাঁপিয়ে তুলতেই এই মেয়ের ঘুমোনো ব্যাপারটি যেন নিত্যকালকে আশ্রয় করে একটি পরম ব্যাপার হয়ে উঠল—এমন কি, জর্মন কাইজার অ.জ যে চার বছর ধরে দুর্দান্ত প্রতাপে লড়াই করছে সেও এর তুলনায় তুচ্ছ এবং অনিত্য। ওই লড়াইয়ের তথ্যটাকে একদিন বহুকষ্টে ইতিহাসের বই থেকে মুখস্থ করে ছেলেদের এক্‌জামিন পাস করতে হবে কিন্তু 'পালংকে শয়ান রঙ্গে, বিগলিত চীর অঙ্গে, নিন্দ যাই মনের হরিষে' এ পড়া—মুখস্থ করার জিনিস নয়। এ আমরা আপনার প্রাণের মধ্যে দেখতে পাব, এবং যা দেখব সেটা একটি মেয়ের বিছানায় শুয়ে ঘুমানোর চেয়ে অনেক বেশি।" জ্ঞানদাসের ছন্দের মধ্যে যে অপরূপ মাধুর্য প্রকাশ পাইয়াছে তাহা অন্য কোন ছন্দে লিখিলে যে মন্দীভূত হইবে তাহা দেখাইবার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঐ কলিটিকে নিম্নলিখিতছন্দে লিখিয়াছেন—

শ্রাবণ মেঘে তিমির ঘন শর্বরী
বরিষে জল কাননতল মর্মরি॥
জলদরব-ঝংকারিত ঝঞ্ঝাতে
বিজন ঘরে ছিলাম ঘুম-তন্দ্রাতে,
অলস মম শিথিল তনু-বল্লরী।
মুখর শিখী শিখরে ফিরে সঞ্চরি ॥

ইহার উপর কবি মন্তব্য করিয়াছেন—"এ ছন্দে হয়তো বাইরের ঝড়ের দোলা কিছু আছে কিন্তু মেয়েটির ভিতরের গভীর কথা ফুটল না। এ আর-এক জিনিস হল।'

১৩৪৩ সালে (৩০।৫।১৯৩৬) কবি "শ্যামলী"র অন্তর্গত 'স্বপন' নামক গদ্য কবিতায় পুনরায় এই কলিটির মর্মার্থ উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন—

মনে পড়ছে ঐ পদটা

"রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন
স্বপন দেখিনু হেন কালে।"
সেদিন রাধিকার ছবির পিছনে
কবির চোখের কাছে,
কোন্‌ একটি মেয়ে ছিল
ভালবাসার কুঁড়ি-ধরা তার মন
মুখচোরা সেই মেয়ে
চোখে কাজল-পরা
ঘাটের থেকে নীল শাড়ি
নিঙাড়ি নিঙাড়ি চলা
আজ এই ঝড়ো রাতে
তাকে মনে আনতে চাই
তার সকালে, তার সাঁঝে
তার ভাষায়, তার ভাবনায়
তার চোখের চাহনিতে
তিনশ বছর আগেকার
কবির জানা সেই বাঙালি মেয়েকে।

কবিতার শেষে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

শ্রাবণের রাত্রে এমনি করেই রয়েছে সেদিন

বাদলের হাওয়া,
মিল রয়ে গেছে
সেকালের স্বপ্নে আর একালের স্বপ্নে।

১৩৪৫ সালে রবীন্দ্রনাথ "বাংলাভাষা-পরিচয়" গ্রন্থে পুনরায় এই পদটির প্রসঙ্গে বলেন—"কবিতার বিশেষত্ব হচ্ছে তার গতিশীলতা। সে শেষ হয়েও শেষ হয় না। গদ্যে যখন বলি "একদিন শ্রাবণের রাত্রে বৃষ্টি পড়েছিল, তখন এই বলার মধ্যে এই খবরটা ফুরিয়ে যায়। কিন্তু কবি যখন বললেন—

রজনী শাঙনঘন, ঘন দেয়া গরজন
রিম্ ঝিম্ শবদে বরিষে

তখন কথা থেমে গেলেও বলা থামে না। এ বৃষ্টি যেন নিত্যকালের বৃষ্টি, পঞ্জিকা-আশ্রিত কোনো দিনক্ষণের মধ্যে বদ্ধ হয়ে এ বৃষ্টি স্তব্ধ হয়ে যায় নি। এই খবরটির উপর ছন্দ যে দোলা সৃষ্টি করে দেয় সে দোলা ঐ খবরটিকে প্রবহমান করে রাখে।"

বৈষ্ণব কবিদের পদাবলীর ভাব, ভাষা ও ছন্দ লইয়া এমন অনবদ্য সুন্দর সমালোচনা করা একমাত্র রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব। শ্রেষ্ঠ কবিতা পাঠককে কবি করিয়া তুলে। আবার কবি না হইলে কাব্যরস উপলব্ধি করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ যেমন মেঘদূত, কুমারসম্ভব, অভিজ্ঞান-শকুন্তলা প্রভৃতির সমালোচনা করিতে যাইয়া কালিদাসকে নূতন করিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন, তেমনি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বসন্তরায় প্রভৃতি কবির পদাবলীর সৌন্দর্য বিশ্লেষণ উপলক্ষ্যে এমন এক রসের সঞ্চার করিয়াছেন যাহা পাঠক পূর্বে কখনও কল্পনা করিতে পারেন নাই। এইরূপ সমালোচনার ফলেই মহাজন পদাবলী সাহিত্যের আসরে সাদরে অভ্যর্থিত হইল। বৈষ্ণবের কুটীরে যাহা নিবদ্ধ ছিল তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুউচ্চ প্রাসাদে উন্নীত হইল। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের নিদর্শন হিসাবে শিক্ষিত সমাজে ইহার অধ্যয়ন অধ্যাপনা সুরু হইল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পদাবলীসাহিত্যের অমূল্য সম্পদগুলি সুরক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং অনেক গ্রন্থের বিদ্বজনসম্মত সংস্করণ প্রকাশ করিয়া বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ পদাবলী সাহিত্যের নিকট কতটা ঋণী তাহা তিনি মনস্বী দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের নিকট ১৩২৮ সালের ১৬ই কার্তিক তারিখে লিখিত একখানি পত্রে ব্যক্ত করিয়াছেন "বৈষ্ণব সাহিত্য এবং উপনিষৎ বিমিশ্রিত হইয়া আমার মনের হাওয়া তৈরি করিয়াছে। নাইট্রোজেনে এবং অক্সিজেনে যেমন মেশে তেমনি করিয়াই তাহারা মিশিয়াছে। আমার রচনায় সীমা ও অসীমের দ্বন্দ্ব নাই, মিলন আছে; তাহার কারণটি কেবলমাত্র আমার ব্যক্তিগত প্রকৃতিতে নাই, আমার চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির বেড়ার ভিতর দিয়া ইহা বুঝা যায় না। আমার পিতার হৃদয়ে হাফিজ ও উপনিষদের এই সঙ্গম ঘটিয়াছিল—সৃষ্টির পক্ষে এইরূপ দুই বিষমের মিলনের প্রয়োজন আছে—সৃষ্টিকর্তার চিত্তের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই আছেন, নহিলে একভাবে সৃষ্টি হইতেই পারে না।"

বৈষ্ণব সাহিত্য বলিতে এখানে বৈষ্ণব পদাবলীই মুখ্যতঃ বুঝিতে হইবে; কেননা রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব দর্শন, জীবনচরিত বা 'প্রার্থনা', 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' জাতীয় উপাসনার গ্রন্থের মতবাদ মানিয়া লইতে পারেন নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পদকর্তা রবীন্দ্রনাথ

কিশোর বয়সে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাসের পদাবলী পড়িয়া রবীন্দ্রনাথ এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তাঁহারও ঐ সব মহাজনের ন্যায় পদকর্তা হইবার সাধ হইয়াছিল। চ্যাটার্টনের গল্প শুনিয়া তিনি নিজের রবি নামকে সমার্থবাচক ভানুতে পরিবর্তন করিয়া অন্তরঙ্গ ব্যক্তিদিগকে চমক লাগাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সত্যই যখন ঐসব পদকে প্রাচীন কবির রচনা বলিয়া মনে করিলেন, তখনই নিজের লেখা বলিয়া ঐ গুলিকে স্বীকার করিলেন। তিনি যখন চৌদ্দবছরে পা দিয়াছেন তখন প্রাচীন কাব্যসংগ্রহে সংকলিত পদাবলীর সংস্পর্শে আসেন, আর তাঁহার ষোলবৎসর বয়সের সময়, ১২৮৪ সালে, 'ভারতী'তে ভানুসিংহ ঠাকুরের সাতটি পদ প্রথম প্রকাশিত হয়। তারপর নয় বৎসরের মধ্যে আরও কয়েকটি পদ লেখেন। ষোল হইতে পঁচিশ বৎসরের তরুণের রচনা বলিয়া ভানুসিংহের পদাবলীকে অগ্রাহ্য করা চলে না। কেননা রবীন্দ্রনাথ ঐ বয়সেই যেরূপ মানসিক বিকাশের পরিচয় দিয়াছেন তাহার তুলনা মেলা ভার। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয় 'রবীন্দ্রনাথঃ জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থে 'ভারতী'তে ১২৮৪ সাল হইতে ১২৮৭ সালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কি কি বিষয়ে লিখিয়াছিলেন তাহার বিবরণ দিয়াছেন। উহাতে দেখা যায় যে রবীন্দ্রনাথ কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গের ও অভিজ্ঞান শকুন্তলে কিয়দংশের অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে, Moore, Burns ও Shakespeareর কবিতাও ১৬ বছর বয়সে অনুবাদ করিয়াছেন, বিয়াত্রীচে, দান্তেও তাঁহার কাব্য, পিত্রার্কা ও লরা সম্বন্ধে কবিতানুবাদসহ প্রবন্ধ ১৭ বছর বয়সে প্রকাশ করিয়াছেন; ১৮ বছর বয়সে চ্যাটার্টনের কবিতার অনুবাদসহ ঐ বালক-কবির উপর প্রবন্ধ এবং Shelley ও Tennyson এর কবিতার অনুবাদ করিয়াছেন। ভানুসিংহের নাম দিয়া কোন পদ লিখিবার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ 'কবিকাহিনী' ও 'বনফুল' কাব্যও লিখিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য পঞ্চাশ বৎসর বয়সে জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন যে ভানু-সিংহের পদাবলীতে "আমাদের দিশি নহবতের প্রাণ গলান ঢালা সুর নাই, তাহা আজকালকার সস্তা আর্গিনের বিলাতি টুং টাং মাত্র।" 'সঞ্চয়িতার' ভূমিকায় তিনি লেখেন যে ঐ কাব্যের 'মরণ রে তুহুঁ মম শ্যাম সমান' এবং 'কো তুহুঁ বোলবি মোয়" এই দুইটি মাত্র কবিতা স্বীকারযোগ্য। কিন্তু ১৩৩৮ সালে সংকলিত গীতবিতানে ভানুসিংহের পদাবলীর প্রায় সমস্ত পদই গৃহীত হইয়াছে। কবি বোধ হয় বৃদ্ধ বয়সে ঐ গ্রন্থের সাহিত্যিক মূল্য সম্বন্ধে নিজের মত পরিবর্তন করিয়াছিলেন।

বিশ্বভারতী হইতে প্রকাশিত রচনাবলী সংস্করণের দ্বিতীয়খণ্ডের সূচনায়

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"ভানুসিংহের পদাবলী ছোটো বয়স থেকে অপেক্ষাকৃত বড়ো বয়স পর্যন্ত দীর্ঘকালের সূত্রে গাঁথা। পদের মধ্যে ভালোমন্দ সমান দরের নয়।" ছোট বয়স বলিতে ষোল বছর ও অপেক্ষাকৃত বড়ো বয়স বলিতে বড় জোর পঁচিশ বছর বয়স বুঝাইবে। ভানুসিংহের পদাবলী ১২৯১ সালে, কবির ২৩ বৎসর বয়সের সময় প্রকাশিত হয়। কিন্তু উহাতে "আজু সখি মুহু মুহু" "মরণরে তুহুঁ মোর শ্যাম সমান" এবং "কো তুহুঁ বোলবি মোয়" এই পদ কয়টি ছিল না। ছবি ও গানের প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে কবি বলেন যে শেষের তিনটি কবিতা ছাড়া অন্য গুলি ১২৮৯ সালে লিখিত হয়। শেষের তিনটি কবিতার মধ্যে "আজু সখি মুহু মুহু" ও "মরণ রে তুহুঁ মোর শ্যাম সমান" ১২৮৯ সালের পূর্বেকার লেখা বলিয়া কবি জানাইয়াছেন। "কো তুহুঁ বোলবি মোয়" পদটি ১২৯৩ সালে কড়ি ও কোমলের প্রথম সংস্করণে প্রকাশিত হয়—তখন কবির বয়স পঁচিশ বৎসর।

ভানুসিংহের পদাবলী লইয়া কবি পরিণত বয়সে একটা সঙ্কোচের ভাব পোষণ করিতেন। তাহার কারণ বোধ হয় এই যে তিনি পদাবলীর ভাষা ও আঙ্গিককে নকল করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বৈষ্ণবীয় ভাবানুভূতিকে নিজের সাধনার দ্বারা আপনার করিয়া লইতে পারেন নাই। তিনি ১৩৪৬ সালে লেখেন যে তিনি অক্ষয় চৌধুরী মহাশয়ের কাছে বালক কবি চ্যাটার্টনের গল্প শুনিয়া পদাবলী জাল করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু "একথা মনেই ছিল না যে ঠিকমতো নকল করতে হলেও শুধু ভাষায় নয় ভাবে খাঁটি হওয়া চাই। নইলে কথার গাঁথুনিটা ঠিক হলেও সুরে তার ফাঁকি ধরা পড়ে। পদাবলী শুধু কেবল সাহিত্য নয় তার রসের বিশিষ্টতা বিশেষ ভাবের সীমানার দ্বারা বেষ্টিত। সেই সীমানার মধ্যে আমার মন স্বভাবিক স্বাধীনতার সঙ্গে বিচরণ করতে পারে না। তাই ভানুসিংহের সঙ্গে বৈষ্ণবচিত্তের অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা নাই।" কোন কোন আধুনিক সমালোচক কিন্তু ভানুসিংহের পদাবলীকে কাব্যহিসাবে বেশ উঁচুস্থান দিয়াছেন। সেই জন্য এই পদগুলির একটু বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন।

প্রথমেই লক্ষ্য করা দরকার যে ভানুসিংহের পদাবলী একখানি কাব্য নহে, কুড়িটি খণ্ড কবিতার সংগ্রহমাত্র। এই কবিতাগুলি এমনভাবে সন্নিবিষ্ট হয় নাই যাহাতে নায়িকা রাধার ক্রমপরিণতি লক্ষ্য করা যায়। পূর্বরাগ, অভিসার, মিলন ও বিরহের ধরাবাঁধা ছকের মধ্যে ভানুসিংহের পদগুলিকে ফেলা যায় না। প্রথম পদে দেখা যায় বসন্তের আগমনে সমস্ত প্রকৃতি আনন্দে ভরিয়া উঠিয়াছে, শুধু দুঃখিনী রাধা তাঁহার প্রিয়তমের জন্য বিলাপ করিতেছেন। দ্বিতীয় পদে সখী সব জায়গা খুঁজিয়া আসিয়া বলিলেন শ্যামকে কোথাও পাওয়া গেল না। তৃতীয় পদে রাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক্ষায় বিরহ-কাতর হৃদয়ে রজনী যাপন করিতেছেন। চতুর্থপদে সখী মথুরায় যাইয়া কৃষ্ণকে রাধার বিরহদুখের কথা বলিয়া ধিক্কার দিলেন। পঞ্চম পদে সখী রাধাকে বলিতেছেন যে শ্যাম মৃদু পদে গান গাহিতে গাহিতে আসিতেছে

তাই এখন সাজসজ্জা করা প্রয়োজন। ষষ্ঠ পদে রাধাকৃষ্ণের মিলন। এই ছয়টি পদের মধ্যে ঘটনার পৌর্বাপর্য রক্ষিত হইয়াছে।

সপ্তম পদে রাধা বাঁশির ডাক শুনিয়া অভিসারে যাইতেছেন। অষ্টম পদেও সখীদের সঙ্গে রাধার অভিসারের বর্ণনা। নবম পদে রাধা অন্ধকারে কুঞ্জে প্রতীক্ষা করিতে করিতে বাঁশীর শব্দ শুনিতে পাইলেন। দশম পদে রাধা কৃষ্ণকে বাঁশী বাজাইতে বলিতেছেন ও প্রেম নিবেদন করিতেছেন। একাদশ পদে মিলনের দৃশ্য। দ্বাদশপদে নিদ্রিত শ্যামের সৌন্দর্য বর্ণনা ও নিশা অবসান হওয়ায় আক্ষেপ। সপ্তম হইতে দ্বাদশপদ লইয়া ভানুসিংহের পদাবলীর যেন দ্বিতীয় স্তবক গ্রথিত হইয়াছে।

ত্রয়োদশ পদে রাধার এবং চতুর্দশ পদে শ্রীকৃষ্ণের বর্ষাভিসার। পঞ্চদশ পদে রাধার মান ও অনুতাপ। ষোড়শ পদে মথুরা গমনে উদ্যত শ্যামের প্রতি রাধার ব্যবহারের বর্ণনা। সপ্তদশ পদে মথুরা হইতে হতাশা লইয়া প্রত্যাগতা সখীর প্রতি রাধার অনুযোগ। অষ্টাদশ পদে রাধা তাঁহার মৃত্যুর পর শ্যাম কি করিবেন তাহা লইয়া সখীর সহিত আলোচনা করিতেছেন। ঊনবিংশ পদে মৃত্যুকেই শ্যামরূপে সম্বোধন। বিংশ পদে "কো তুহুঁ বোলবি মোয়" বলিয়া প্রেম নিবেদন। এই শেষ আটটি পদ যেন ভানুসিংহের পদাবলীর তৃতীয় গুচ্ছ।

ভানুসিংহের পদাবলীর ভাষা কৃত্রিম। বিদ্যাপতির পদ বলিয়া যাহা সে সময়ে বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল তাহাও মৈথিলী পদ ভাঙিয়া বাঙালীর বোধ-যোগ্য ভাষায় লিখিত। বিদ্যাপতি নিজে ঠিক ঐ ভাষায় লেখেন নাই। নেপালের পুথিতে বিদ্যাপতির ভাষার খানিকটা নমুনা পাওয়া যায় কিন্তু সে পুথির ভাষাও যে মোরঙ্গ প্রদেশের ভাষার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় নাই এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না। রামভদ্রপুরের পুথিতে বিদ্যাপতির যে পদ পাওয়া যায় তাহার ভাষায় সহিত পদ-কল্পতরু জাতীয় সংকলনগ্রন্থে ধৃত বিদ্যাপতির পদের ভাষার আকাশ পাতাল তফাৎ। গ্রিয়ার্সন সাহেব মিথিলায় লোকের মুখে শুনিয়া বিদ্যাপতির যে পদগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহার ভাষা আবার নেপালের পুথির ও রামভদ্রপুরের পুথির ভাষা হইতে পৃথক। বিদ্যাপতির যে সকল পদ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল. তাহার অনুকরণ করিয়া গোবিন্দ দাস কবিরাজ তাঁহার পদাবলী রচনা করেন। গোবিন্দ দাস এমন অনেক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন যাহা মিথিলার লোকের পক্ষে দুর্বোধ্য অথচ বাঙালীর নিকট সুপরিচিত।

যেমন 'হৃদয়-মন্দিরে মোর কানু ঘুমাওল' পদের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া একজন অবাঙালী টীকাকার লিখিয়াছেন যে কানু আমার হৃদয় মন্দিরে চলাফেরা করে। তিনি ঘুমাওল মানে যে নিদ্রা যাইল তাহা জানেন না; তিনি উহাকে 'ঘুমতা ফিরতা হ্যায়' গোছ কোন কথা ভাবিয়াছিলেন। গোবিন্দ দাস অনেক ক্ষেত্রে নিজে শব্দ সৃষ্টি করিয়াছেন ও তাহা তাঁহার অভিপ্রেত অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। যেমন 'পহিলহি

কুল তুল সম উয়ল,' এখানে উয়ল মানে উদিত হইল নহে, কিন্তু উড়িয়া গেল।

সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বিদ্যাপতির যে পদাবলী ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করেন, তাহাতে ১২৫টি মাত্র পদ ছিল। তাহার মধ্যে—

"শুন শুন মাধব কি কহব আন।
তুলনা দিতে নারি পিরীতি সমান॥" (৫২)

অথবা যেখানে সতত বৈসে রসিক-মুরারি।
সেখানে লিখিহ মোর নাম দুই চারি॥ (৮৬)

প্রভৃতি কয়েকটি পদের ভাষা খাঁটি বাংলা। এইরূপ বিদ্যাপতিকে সামনে রাখিয়া কিশোর রবীন্দ্রনাথ যে পদ রচনা করিয়াছেন তাহার মধ্যে নবম পদে কিছু বা ব্রজবুলি কিছু বা খাঁটি বাংলা আছে। যেমন--

তৃষিত নয়াণে, বন-পথ পানে
নিরখে ব্যাকুল বালা

খাঁটি বাংলা, কিন্তু তাহার পরের চরণ ব্রজবুলি—

দেখ ন পাওয়ে, আঁখ ফিরাওয়ে
গাঁথে বন-ফুল মালা।

রবীন্দ্রনাথ এমন অনেক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন যাহার প্রয়োগ পদাবলীসাহিত্যে বিরল।

যথা— জর জর রিঝসে দুখ জ্বালা সব
দূরে দূরে চলি গেল।

এখানে রিঝসে মানে হৃদয় হইতে। রিঝত, রিঝি, রীঝ প্রভৃতি শব্দ হৃষ্ট হয়, হৃষ্ট হইয়া, হৃষ্ট করে প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়; কেবল পদকর্তা ভূপতি একবার মাত্র রিঝি শব্দ হৃদয় অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন—"রিঝি দেয়ল মণি—মাল" (পদকল্পতরু ৪৮৩)। রবীন্দ্রনাথ আম্র মঞ্জরীর ব্রজবুলি করিয়াছেন 'অমুয়া মঞ্জরী" (১); সঞ্চরণ করে অর্থে সঞ্চলে (২) জামা অর্থে আঙিয়া (৫) শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। বিদ্যাপতি মাধব মাধাই প্রভৃতি নামে কৃষ্ণকে ডাকিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ নামটি আরও সংক্ষেপে করিয়া মাধা (১) করিয়াছেন; বোধ হয় সুরদাসের মধ্যে মাধো শব্দের প্রয়োগ তিনি শুনিয়াছিলেন।

ভানুসিংহের পদাবলীর প্রথম পদটি বিদ্যাপতি-নামাঙ্কিত একটি পদের অনুসরণ। বিদ্যাপতি ভণিতার পদটি সারদাচরণ মিত্রের সংস্করণ হইতে তুলিয়া দিতেছি—

ফুটল কুসুম নব কুঞ্জ কুটীর বন
কোকিল পঞ্চম গাওইরে।
মলয়ানিল হিমশিখরসি ধাবল ১
পিয়া নিজ দেশ না আওইরে॥

চাঁদ চন্দন তনু অধিক উতাপাই
উপবনে অলি উতরোল।
সময় বসন্ত কান্ত রহু দূরদেশ
জানলু বিহি প্রতিকূল॥
অনিমিখ নয়নে নাহ মুখ নিরখিতে
তিরপিত না হোয় ২ নয়নে।
এ সুখ সময়ে সহজে এত শংকট। ৩
অবলোকন কঠিন পরাণ॥ ৪
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু হিমে কমলিনী জনু
না জানি কি ইহ পরিযন্ত।
বিদ্যাপতি কহ ধিক ধিক জীবন
মাধব নিকরুণ-অন্ত॥

পদকল্পতরু ১৭১৩ সংখ্যক পদে ইহার বিশুদ্ধ পাঠ (১) শিখয়ে সিধারল (২) না হয়ে (৩) সহয়ে এত সঙ্কট (৪) অবলা কঠিন পবাণ।

জয়দেব যেমন বসন্তকালে কন্দর্পজ্বরজনিত চিন্তাকুলা রাধার কথা বলিয়া গীতগোবিন্দ আরম্ভ করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ তেমনি বসন্তের আবির্ভাবে নিখিল জগতের হর্ষ ও রাধার প্রিয় বিরহ দুঃখ বর্ণনা করিয়া ভানুসিংহের পদাবলী সুরু করিয়াছেন। তিনি প্রথম পদে লিখিয়াছেন—

বসন্ত আওল রে!
মধুকর গুণ গুণ, অমুয়া মঞ্জরী
কানন ছাওল রে।
শুন শুন সজনী হৃদয় প্রাণ মম
হরষে আকুল ভেল;
জর জর রিঝসে দুখ জ্বালা সব
দূর দূর চলি গেল।
মরমে বহই বসন্ত সমীরণ
মরমে ফুটই ফুল,
মরম-কুঞ্জ পর বোলই কুহু কুহু
অহরহ কোকিল কুল।
সখি রে উছসত প্রেমভরে অব
ঢল ঢল বিহ্বল প্রাণ,
নিখিল জগত জনু হরখ-ভোর ভই
গায় রভস-রস গান।

বসন্ত-ভূষণ-ভূষিত ত্রিভুবন
কহিছে দুখিনী রাধা,
কঁহিরে সো প্রিয়, কঁহি সো প্রিয়তম
হৃদি-বসন্ত সো মাধা?
ভানু কহত অতি গহন রয়ন অব,
বসন্ত সমীর শ্বাসে
মোদিত বিহ্বল চিত্ত-কুঞ্জতল
ফুল্ল বাসনা-বাসে।

বিদ্যাপতির পদে রাধা বসন্তের শোভা দেখিয়া অধিকতর বিরহে সন্তপ্ত হইতেছেন ও বিধাতাকে প্রতিকূল জানিয়া প্রতিকারবিহীন দুঃখ ভোগ করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের রাধা শুধু প্রকৃতির পানেই চাহেন না, নিজের মরমের প্রতি তাঁহার বেশী দৃষ্টি। তাই প্রাকৃতিক শোভার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অনুভব করিতেছেন যে তাঁহার মরমেও বসন্ত সমীর বহিতেছে, মরমে তাঁহার ফুল ফুটিতেছে; শুধু বনে নহে মনেও কোকিল কুহু কুহু রব করিতেছে। ইহাতে রাধার সুখ হইতেছে কি দুঃখ হইতেছে তাহা কবি ঠিক বুঝিতে পারিতেছেন না। প্রথমে রাধা বলিলেন "হৃদয় প্রাণ মম হরষে (হর্ষে) আকুল ভেল" কিন্তু নিখিল জগত যখন হর্ষে বিহ্বল হইয়া উঠিয়াছে, ত্রিভুবন বসন্তরূপ ভূষণে বিভূষিত হইয়াছে তখন রাধা নিজেকে দুঃখিনী বলিতেছেন, কেননা তাঁহার হৃদয়ের বসন্তস্বরূপ সেই মাধব, সেই প্রিয়, সেই প্রিয়তম কোথায়? বিদ্যাপতির রাধা বসন্তের শোভা দেখিয়া প্রথমেই বলিয়াছেন "পিয়া নিজ দেশ না আওই রে"; কিন্তু ভানুসিংহের রাধা প্রথমটায় প্রকৃতির বসন্তোৎসব দেখিয়া যেন প্রিয় কাছে না থাকিলেও আনন্দে বিহ্বল হইয়াছেন। ইহাতে তাঁহার প্রেমের গভীরতার অভাব দেখা যায়।

ভানুসিংহের তৃতীয় পদেও ভাবের পৌর্বাপর্য রক্ষিত হয় নাই। রাধা কৃষ্ণের প্রতীক্ষায় বৃথাই সারা রাত্রি কাটাইলেন—

বিরহবিষে দহি বহি গেল রয়নী
নহি নহি আওল কালা।

সেই জন্য রাধা নিজের জীবন ও যৌবনকে বিফল জানিয়া বলিতেছেন—

চল সখি গৃহ চল, মুঞ্চ নয়ন-জল
চল সখি চল গৃহকাজে

যাহার জীবন যৌবনে ধিক্কারবোধ জন্মিয়াছে সে অবশ্য নয়নজল ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু তার পরেই গৃহকাজে যাইবার কথা ভাবিতে পারে কি রূপে? "মুঞ্চ নয়ন জল" কি এখানে চোখের জল মুছ এই অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে? ইহার চেয়েও বেশি সঙ্গতি দেখা যায় ঐ পদে শ্যামের দর্শন-আশায় রাধার

আকুল জীবন থেহ না মানে
অহরহ জ্বলত হুতাশে।

এই কলির পর পরই মাধব এখন আমাকে বুকে বুকে রাখেন, এমন প্রেম করে খোয়াইব এই ভয়ে আমি অস্থির হই বলায়—

সজনি, সত্য কহি তোয়,
খোয়াব কব হম শ্যামক প্রেম
সদা ডর লাগায় মোয়।
হিয়ে হিয়ে অব রাখত মাধব
সো দিন আসব সখি রে
বাত ন বোলবে, বদন ন হেরবে
মরিব হলাহল ভখি রে।

মিলনের সময়েই বিরহের আশংকাকে বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে প্রেমবৈচিত্ত্য বলা হইয়াছে, ভানুসিংহ রাধার বিরহের মধ্যে নিজের সৌভাগ্য ঘোষণা, (স্ব সৌভাগ্য খ্যাপন) —'হিয়ে হিযে অব রাখত মাধব' দেখাইযাছেন, আবার শ্যামের ভালবাসা হারাইলে রাধা যে বিষ খাইবেন তাহা বলাইযাছেন।

অষ্টাদশ পদে রাধা ভাবিতেছেন তিনি যদি মারা যান তাহা হইলে 'রাধা রাধা' বলিয়া মুরলীধ্বনি করিলে- যখন অন্যান্য গোপীরা ছুটিয়া আসিবে তখন কি শ্যাম আকুল হইয়া রাধারই আশায় কুঞ্জের পথপানে চাহিয়া থাকিবেন? শ্যাম কি বনে বনে ঘুরিয়া রাধা রাধা নাম করিযা উচ্চৈঃস্বরে ডাকিবেন? রাধা এই প্রশ্ন করিয়াই উত্তর দিতেছেন, না কৃষ্ণ তাহা করিবেন না, তাঁহার কত শত প্রেয়সী আছে।

হাম যব যাওব শত শত রাধা
চবণে রহবে তারি।

সুতরাং এমন বহুবল্লভ প্রেমিকের জন্য দেহত্যাগ করিয়া লাভ কি? তাহার চেয়ে নিকুঞ্জে যাই—

তব সখি যমুনে, যাই নিকুঞ্জে
কাহ তয়াগব দে?

এখানেও প্রাচীন কবিদের রাধার সংগে ভানুসিংহের রাধার যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। বিদ্যাপতির রাধা বলেন—"পিয়া বিছুরল যদি কি আর জীবনে"।

"মরণ রে তুহুঁ মোর শ্যাম সমান" কবিতাংশ সুন্দর সন্দেহ নাই, কিন্তু বৈষ্ণব কবিরা কখনও মরণকে শ্যামের সমান বলিবেন না, আর তাঁহাদের রাধাও কখনও মরণকে বলিবেন না যে

দূর সঙে তুঁহু বাঁশি বজাওসি
অনুখন ডাকসি, অনুখন ডাকসি
বাধা রাধা রাধা।

পদের ভনিতাংশে অবশ্য ভানুসিংহ খাঁটি বৈষ্ণবের মতন রাধাকে তাহার চঞ্চলতার জন্য তিরস্কার করিয়া বলিতেছেন—একবার ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখ দেখি আমার প্রভু মাধব মরণের চেয়ে বেশী প্রিয় কি না—

ভানুসিংহ কহে—ছিয়ে ছিয়ে রাধা
চঞ্চল হৃদয় তোহারি,
মাধব পহু মম, পিয় স মরণসে
অব তুঁহু দেখ বিচারি।

বিদ্যাপতির পদের ভণিতায় মঞ্জরী ভাবের সেবাবাসনা নাই, গোবিন্দ দাসের পদে আছে। তাহারই অনুসরণ করিয়া ভানুসিংহ গভীর নিশীথে অভিসারিকা রাধার সঙ্গে চলিতেছেন—তাঁহাকে নির্ভয় করিবার জন্য—

নদী-মগন মহী, ভয় ডর কছু নাহি
ভানু চলে তব সাথ।

কিন্তু কোন বৈষ্ণব কবি রাধাকে অভিসারে যাইতে মানা করেন না। ভানুসিংহ বলেন যে একে রাত্রি গভীর, তাহার উপর মেঘের ঘন ঘন গর্জন, সুতরাং রাধা তুমি ভয় পাইবে, শ্যামের অভিসারে বাহির হইও না—

গহন রয়নমে ন যাও বালা
নওল কিশোরক পাশ।
গরজে ঘন ঘন, বহু ডর পাওব
কহে ভানু তব দাস॥

এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে কবি ভণিতায় নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবদের মতন নিজেকে রাধার দাস বলিয়াছেন। মঞ্জরীভাবের অনুপ্রেরণায় দাসী বলিলে আরও বৈষ্ণবতা প্রকাশ পাইত।

সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে অল্পবিস্তর গরমিল থাকিলেও ভানুসিংহের পদাবলীতে এমন কয়েকটি পদ আছে যাহা যে কোন পদাবলীরসিক অনাবিল আনন্দের সহিত উপভোগ করিতে পারেন। পদাবলী সাহিত্যে রসের পর রসালসের পদ আছে। তাহাতে নিদ্রিত রাধাকৃষ্ণের শয়নের অপরূপ সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কোথাও রাধা জাগিয়া উঠিয়া সুপ্ত মাধবের মুখের হাসিটি দেখিয়া মোহিত হইতেছেন এমন বর্ণনা নাই। ভানুসিংহ এই পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া রাধাকে দিয়া বলাইতেছেন—

শ্যাম, মুখে তব মধুর অধরমে
হাস বিকাশত কায়,
কোন স্বপন অব দেখত মাধব
কহবে কোন হমায়।

প্রাচীন পদাবলীতে পাওয়া যায় যে সখীরা রাধাকৃষ্ণের ঘুম ভাঙাইতে কষ্টবোধ

করিতেছেন, অথচ না ভাঙগাইলেও নয়—কেননা 'অকরুণ বাল অরুণ' উঁকি ঝুঁকি মারিতেছে। ভানুসিংহের রাধা স্বয়ং বলিতেছেন, হে নির্দয় রবি তুমি কেন এখন আসিলে? কেন আমাদের বিরহ ঘটাইতেছ?

নিরদয় রবি, অব কাহ তু আওলি
জ্বাললি বিরহক আগি।

কবি রাধার সঙ্গে সুর মিলাইয়া বলিতেছেন—

ভানু কহত অব—"রবি অতি নিষ্ঠুর
নলিন মিলন অভিলাষে
কত নরনারীক মিলন টুটাওত
ডারত বিরহ হুতাশে!"

রবীন্দ্রনাথ 'শেষের কবিতায়' John Donne-এর কবিতার প্রতি অনুরাগ দেখাইয়াছেন; ভানুসিংহের পদাবলী লিখিবার সময় তিনি উঁহার কবিতা পড়িয়াছিলেন কিনা জানা নাই। কিন্তু ঐ কবির The Sunne Rising নামক কবিতায় এই ভাবটি দেখা যায়—

Busie old foole, unruly sunne,
Why dost thou thus,
Through windowes, and through curtaines call
Must to thy motions lovers seasons run?

ভানুসিংহের পদাবলীর নবম পদটিতে কিশোর কবি অপূর্ব নৈপুণ্যের সহিত জয়দেবের ছন্দের সুরটি বাংলা কবিতায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে
শঙ্কিত ভবদুপযানম্।
রচয়িত শয়নং সচকিত নয়নং
পশ্যতি তব পন্থানম্॥

জয়দেবের এই পদের অবিকল প্রতিধ্বনি

সতিমির রজনী, সচকিত সজনী
শূন্য নিকুঞ্জ অরণ্য।
কলয়িত মলয়ে, সুবিজন নিলয়ে
বালা বিরহ-বিষন্ন!

বৈষ্ণব কবিতায় বংশীধ্বনিতে যমুনার উজান বহার কথা আছে; কিন্তু বাঁশীর তানের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া যমুনার কল্লোল-ধ্বনির কথা নাই। রবীন্দ্রনাথ এই নূতন ঐক্যতানের সৃষ্টি করিয়াছেন—

চকিত গহন নিশি, দূর দূর দিশি
বাজত বাঁশি সুতানে।

কণ্ঠ মিলাওল ঢল ঢল যমুনা
কল কল কল্লোল গানে॥

রাধিকার দূতী মথুরায় যাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে অনেক গঞ্জনা দিয়াছেন, কুব্জাকে লইয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন এরূপ বহু বর্ণনা মহাজন-পদাবলীতে পাওয়া যায়; কিন্তু কেমন করিয়া তুমি রাধার হৃদয়কমলাসন ছাড়িয়া স্বর্ণাসনে তৃপ্ত হইতে পারিলে এমন মর্মান্তিক উক্তি একমাত্র ভানুসিংহের পদাবলীতেই পাওয়া যায়—

কৈসে মিটাওসি প্রেম-পিপাসা
কঁহা বজাওসি বাঁশি?
পীতবাস তুঁহু কথি রে ছোড়লি
কথি সো বঙ্কিম হাসি?
কনক-হার অব পহিরলি কণ্ঠে
কথি ফেকলি বনমালা?
হৃদিকমলাসন শূন্য করলি রে
কনকাসন কর আলা!

মথুরায় এই রাজসভার পরিবেশের মধ্যে তোমার প্রেম-পিপাসা মিটাইবার সুযোগ-সুবিধা কোথায়? এখানে তুমি রাজা; কত গুরুদায়িত্বভার তোমার! এখানে কি তুমি বাঁশি বাজাইতে পার? এখানে তোমার রাজবেশ, ব্রজের সেই পীতবাস তুমি কোথায় ছাড়িয়া ফেলিয়াছ? আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে তোমার সেই সুমধুর বঙ্কিম হাসিটিও যে অন্তর্হিত হইয়াছে তাহা তুমি খেয়াল করিয়াছ কি? বনমালা ফেলিয়া তুমি সোনার হার গলায় পরিয়াছ, তাহা কি তোমার শৃঙ্খল হয় নি? এই পদের ধ্বনি ও ব্যঞ্জনার মধ্যে সুগভীর আন্তরিকতার সুরই আমরা শুনিতে পাই, কৃত্রিমতার কোন চিহ্নই দেখিতে পাই না।

রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে ভানুসিংহের পদাবলীর প্রথম গানটি রচনার ইতিহাস দিয়াছেন—"একদিন মধ্যাহ্নে খুব মেঘ করিয়াছে। সেই মেঘলাদিনের ছায়াঘন অবকাশের আনন্দে বাড়ির ভিতরে এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া একটা স্লেট লইয়া লিখিলাম 'গহন কুসুমকুঞ্জ মাঝে।' লিখিয়া ভারি খুশি হইলাম; তখনই এমন লোককে পড়িয়া শুনাইলাম বুঝিতে পারিবার আশঙ্কামাত্র যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং সে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া কহিল, 'বেশ তো, এ তো বেশ হইয়াছে।'" কবি এখানে নিজেকে ব্যঙ্গ করিয়া নিজের উপর যথেষ্ট অবিচার করিয়াছেন। আমরা প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া পদাবলী পড়িতেছি। আমরা ঐ পদ শুনিলে অকুণ্ঠচিত্তে বলিতাম—'এ তো বেশ হইয়াছে।' ইহার উপরও আরেকটি কথা বলিতাম—ইহাতে গোবিন্দ দাসের সুপ্রসিদ্ধ রসের পদের ছন্দ ও সুরটি ধরা পড়িয়াছে।

গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন—

শরদ চন্দ পবন মন্দ
বিপিনে ভরল কুসুম-গন্ধ
ফুল্ল মল্লিকা মালতি যূথি
মত্ত মধুকর-ভোরণি।
বিসরি গেহ নিজহুঁ দেহ
এক নয়নে কাজর-রেহ
বাহে রঞ্জিত কঙ্কণ একু
একু কুণ্ডল ডোলনি॥

ইহার ছন্দ ও শব্দঝঙ্কারের সহিত ভানুসিংহের পদের তুলনা করুন—

গহন কুসুম-কুঞ্জ মাঝে
মৃদুল মধুর বংশি বাজে,
বিসরি ত্রাস লোক লাজে
সজনি, আও আও লো।
অঙ্গে চারু নীল বাস,
হৃদয়ে প্রণয় কুসুম রাশ,
হরিণ-নেত্রে বিমল হাস
কুঞ্জ বনমে আও লো॥

বিশুদ্ধ কাব্যরসের দিক্ দিয়া হয়তো ভানুসিংহের পদাবলীর শেষ দুইটি পদই সর্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু রাধিকার ভাব-বিশ্লেষণের দিক হইতে ষোড়শ সংখ্যক পদটিকে পদাবলী সাহিত্যের একটি অমূল্য রত্ন বলিয়া মনে করি। রাধিকার এক সখী অন্য সখীকে বলিতেছেন যে রাধা যখন জানিতে পারিলেন যে মাধব মথুরায় যাইবেন তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তিনি মাধবকে কোন প্রকার বাধা দিবেন না, কাঁদিবেন না, হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে বিদায় দিবেন। মাধব ধীর মন্থর গতিতে রাধিকার কাছে আসিলেন; রাধা তাঁহার মুখের দিকে তাকাইলেন, একবার দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া আর নয়ন ফিরাইতে পারিলেন না, কত মুহূর্ত অতিক্রান্ত হইয়া, দণ্ড বহিয়া গেল, রাধা মাধবের মুখের দিকে চাহিয়াই রহিলেন। মাধবের মুখের পানে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে রাধা তাঁহার পূর্ব প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গেলেন, নিজেকে আর সম্বরণ করিতে পারিলেন না, তাঁহার নয়ন হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রুধারা বহিয়া পড়িতে লাগিল—

মৃদু মৃদু গমনে আওল মাধা,
বয়ন-পান তছু চাহল রাধা
চাহয়ি রহল স চাহয়ি রহল,

মন্দ মন্দ সখি নয়নে বহল
বিন্দু বিন্দু জল-ধার।

ছন্দের বিলম্বিত গতি যেন রাধার ছবিখানি পাঠকের চোখের সামনে উপস্থিত করে; আমরা যেন শ্রীমতীর প্রতিজ্ঞারূপ পাষাণবাধা ভেদ করিয়া অশ্রুনির্ঝর উৎসারিত হইতে দেখি। শ্রীরাধার এই ভাববিহ্বলতা দেখিয়া শ্যাম তাঁহাকে আদর করিয়া মৃদু স্বরে কত প্রবোধ দিলেন। তাহাতে রাধার দুঃখ প্রশমিত না হইয়া আরও বৃদ্ধি পাইল—

ফুকরয়ি উছসয়ি কাঁদিল রাধা
গদগদ ভাষ নিকাশল আধা
শ্যামক চরণে বাহু পসারি
কহল—শ্যামরে, শ্যাম হমারি
রহ তুঁহু, রহ তুঁহু, বঁধু গো রহ তুঁহু,
অনুখন সাথ সাথ রে রহ পঁহু
তুঁহু বিনে মাধব, বল্লভ, বান্ধব
আছয় কোন হমার।

দুই বাহু দিয়া শ্যামের চরণ জড়াইয়া ধরিয়া রাধা যে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বারংবার তাঁহাকে বৃন্দাবনে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, তাঁহার যে মাধব ছাড়া আর কেহ নাই, তিনি যে একেবারে অসহায় তাহা ভানুসিংহ যেমন ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবিদের লেখনীর অনুপযুক্ত হইত না। রাধা শ্যামের চরণ ধরিয়া সারারাত্রি ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন—

পড়ল ভূমি 'পর শ্যামচরণ ধরি,
রাখল মুখ তছু শ্যামচরণ 'পরি,
উছসি উছসি কত কাঁদয়ি কাঁদয়ি
রজনী করল প্রভাত।

মাধব তাঁহাকে নানা প্রকারে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিলেন। সখী তাহার বান্ধবীকে জিজ্ঞেস করিতেছেন—

সখি লো সখি লো বোলত সখি লো
যত দুখ পাওল রাধা,
নিষ্ঠুর শ্যাম কিয়ে আপন মনমে
পাওল তছু কছু আধা?

শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমনের পূর্বে গোবিন্দদাসের রাধাও ম্লান মুখে চুপচাপ বসিয়াছিলেন। সখী আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে তুমি তোমার দুঃখ গোপন করিবার চেষ্টা করিলে কি হইবে? তোমার

"তনু মন দুই মুঝে দেয়ত সাখী"

তোমার দেহ ও মন এই দুই জনই সাক্ষী দিতেছে তোমার গভীর বেদনার। তখন রাধা বলিলেন—

জানহুঁ রে সখি মৌনক ওর।
পিয়া পরদেশ চলব মোহে ছোড়॥
গমনক সময়ে বিরোধ জনি কোয়।
পিয়াক অমঙ্গল যৈছে না হোয়॥

দয়িতের গমন সময়ে কেহ যেন বিরোধ করিওনা, বাধা দিও না। তাহাতে তাহার অমঙ্গল হইতে পারে। গোবিন্দদাস এই ইঙ্গিতটুকু মাত্র করিয়াছেন, ইহার পর আর অগ্রসর হন নাই। এইরূপ সংকল্প করার পর রাধিকা কিরূপ ব্যবহার করিলেন তাহা ভানুসিংহের এই পদটিতে অতুলনীয় কারুণ্যের সহিত বর্ণিত হইয়াছে। এই ধরণের পদ পড়িয়া কিশোর রবীন্দ্রনাথের বয়স্ক বন্ধু যদি বলিয়া থাকেন "এমন কবিতা বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের হাত দিয়াও বাহির হইতে পারিত না" (জীবনস্মৃতি, পৃঃ ৯৫), তাহা হইলে তাঁহাকে খুব বেশী অতিশয়োক্তি করার অপরাধে দোষী করা যায় না।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে যে-গ্রন্থে এমন সুন্দর পদ আছে তাহার জন্য রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে এত সঙ্কোচ বোধ করিয়াছেন কেন? তাহার কারণ তিনি বৈষ্ণব সাধনাকে, রাধাকৃষ্ণের যুগল মধুর রসের উপাসনাকে নিজের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারেন নাই। কবি রাগানুগা ভজনপ্রণালীকে আপন জীবনে স্বীকার করিয়া লইতে পারেন নাই বলিয়াই বোধ হয়, ১৩৪৬ সালে লিখিয়াছিলেন যে ভানুসিংহের পদাবলীকে "সাহিত্যে একটা অনধিকার প্রবেশের দৃষ্টান্ত বলেই গণ্য করি।"

তৃতীয় অধ্যায়

পদাবলীর মাধুর্য বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ

'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহে' বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও গোবিন্দ দাসের পদাবলী পড়িয়া রবীন্দ্রনাথ পদাবলী-সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি তিন হাজার এক শত এক পদ সম্বলিত পদকল্পতরু ও তিন শত একান্ন পদযুক্ত পদকল্পলতিকা পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। তখন ঐ সকল গ্রন্থের কোন বিশুদ্ধ ও বিদ্বজ্জনগ্রাহ্য সংস্করণ ছিল না। পদকল্পতরু বটতলা হইতে পুঁথির আকারে ছাপা হইয়াছিল। পদের মাধুর্যে মুগ্ধ হইয়া তিনি ছাপা ও কাগজের কদর্যতাকে পদাবলীর রসাস্বাদনে বাধা বলিয়া মনে করেন নাই। তিনি হাতে লেখা পুঁথিও কিছু কিছু দেখিয়াছিলেন। আবার ভিখারী বৈষ্ণবদের মুখে গান শুনিয়াও কিছু পদ লিখিয়া লইয়াছিলেন। এইভাবে পদাবলীর সহিত রবীন্দ্রনাথ যতই পরিচিত হইতে লাগিলেন ততই তিনি বিমোহিত হইলেন। ১২৮৪ হইতে ১২৮৮ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ভানুসিংহের পদাবলীর অধিকাংশ পদ লিখিবার পর কবি পদাবলীর সৌন্দর্য ও মাধুর্য বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহারই ফলস্বরূপ তিনি "ভারতী"তে ১২৮৮ সালের ফাল্গুন মাসে 'চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি,' ১২৮৯ সালের শ্রাবণ মাসে 'বসন্তরায়' এবং ১২৯১ সালের কার্তিক মাসের "নবজীবনে" 'বৈষ্ণব কবির গান' নামে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

এই প্রবন্ধ কয়টি হইতে দেখা যায় যে বিদ্যাপতি কিশোর রবীন্দ্রনাথের মনের উপর যে যাদু বিস্তার করিয়াছিলেন তাহার ঘোর যেন অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। বিদ্যাপতির চেয়ে চণ্ডীদাস এবং অপেক্ষাকৃত অজ্ঞাত বসন্তরায়কে তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথ অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতেছেন। তাই তিনি 'চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি' প্রবন্ধে লিখিলেন—

> "বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডীদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন। চণ্ডিদাসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন, চণ্ডিদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন। বিদ্যাপতি ভোগ করিবার কবি, চণ্ডিদাস সহ্য করিবার কবি। চণ্ডীদাস সুখের মধ্যে দুঃখ ও দুঃখের মধ্যে সুখ দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার সুখের মধ্যেও ভয় এবং দুঃখের প্রতিও অনুরাগ। বিদ্যাপতি কেবল জানেন যে মিলনে সুখ ও বিরহে দুঃখ, কিন্তু চণ্ডিদাসের হৃদয় আরো গভীর, তিনি উহা অপেক্ষা আরো অধিক জানেন। তাঁহার প্রেম, 'কিছু কিছু সুধা, বিষগুণ আধা,' তাঁহার কাছে শ্যাম যে মুরলী বাজান, তাহাও 'বিষামৃতে একত্র করিয়া।'

কি ২২৮

ন্ধের অন্য একস্থানে বিদ্যাপতির উপর আরও গুরুতর অভিযোগ

রবীন্দ্রনাথ আনিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—বিদ্যাপতির ন্যায় কবিগণ যাঁহারা সুখের জন্য প্রেম চান, তাঁহারা প্রেমের জন্য এতটা কষ্ট করিতে অক্ষম।"

রবীন্দ্রনাথ এখানে বিদ্যাপতির উপর সুবিচার করিতে পারেন নাই। তাহার প্রধান কারণ বিদ্যাপতির পদাবলীর একটি সামান্য অংশ মাত্র তিনি সারদাচরণ মিত্রের প্রাচীন কাব্যসংগ্রহে পাইয়াছিলেন। পদকল্পতরুতে বিদ্যাপতির নামাঙ্কিত ১৬৩টি মাত্র পদ আছে। রবীন্দ্রনাথ ১২৯৮ সালের চৈত্র মাসের "সাধনায়" 'বিদ্যাপতির রাধিকা' নামে আর একটি সমালোচনা প্রকাশ করেন। ঐ সময় পর্যন্ত বিদ্যাপতির তরৌণির পুথি, নেপালের পুথি ও রামভদ্রপুরের পুথি আবিষ্কৃত হয় নাই। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের বিদ্যাপতির পদাবলী ১৩১৬ সালে প্রকাশিত হয়।

সারদাবাবু অভিসার পর্যায়ে বিদ্যাপতির চারটিমাত্র পদ ছাপিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে আবার দুইটি—'করিবর রাজহংস-গতি-গামিনী' এবং 'আঁচরে বদন ঝাপহ গোরি' —অভিসারিকা রাধিকার রূপ বর্ণনা। বিদ্যাপতির অভিসারের সমগ্র পদাবলী যদি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিপথে পতিত হইত তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই লিখিতেন না যে "বিদ্যাপতির ন্যায় কবিরা প্রেমের জন্য এতটা কষ্ট সহ্য করিতে অক্ষম।" লোচনের রাগতরঙ্গিনীতে বিদ্যাপতির এই কবিতাটি পাওয়া যায়—

সখি হে আজ জায়ব মোহী।
ঘর গুরুজন ডর ন মানব,
বচন চুকব নহী।
চাঁদনে আনি আনি অঙ্গ লেপব
ভূষণ কএ গজমোতি।
অঞ্জন বিহুন লোচন জুগল
ধরত ধবল জোতী॥
ধবল বসনে তনু ঝপাওব
গমন করব মন্দা।
জইও সগর গগন উগত
সহসে সহসে চন্দা॥
ন হম কাহুক ডীঠি নিবারবি
ন হম করব ওতে।
অধিক চোরী পর সঁও করিঅ
ইহে সিনেহক লোতে॥

(মিত্র-মজুমদার সংস্করণ ৯৫)

ইহার ভাবার্থ এই যে সখি, আমি আজ যাবই, গৃহের লোকের ও গুরুজনের ভয় করিব না, তাহাদের ভয়ে আমি কানাইকে যে কথা দিয়াছি তাহার খেলাপ করিব না। জ্যোৎস্নায় আমাকে যাহাতে দেখা না যায় সে জন্য আমি চন্দনে দেহ লিপ্ত করিব,

গজমতির অলংকার পরিব, নয়নে অঞ্জন লাগাইব না, সুতরাং তাহাও ধবলজ্যোত ধারণ করিবে। শ্বেত বসনে অঙ্গ আবরণ করিব, যদিও আকাশ ভরিয়া হাজার হাজার চাঁদ উঠে তথাপি আমি ধীরে ধীরে গমন করিব। আমি কাহারও দৃষ্টি নিবারণ করিব না, আমি নিজেকে লুকাইব না।

এখানে রাধা কি প্রেমের জন্য সকল প্রকার দুঃখ মাথা পাতিয়া লইবার জন্য দৃঢ়সংকল্প দেখান নাই? তিনি কৃষ্ণকে সঙ্কেত-স্থানে আসিতে বলিয়াছেন, সুতরাং গুরুজন, পরিজন যতই কেন বাধা সৃষ্টি করুন না, তিনি যাইবেনই। মধ্যযুগের সামাজিক পরিবেশের মধ্যে কুলবধূর মনে এহেন সংকল্প তখনই জাগিতে পারে যখন সে প্রেমের জন্য সর্বপ্রকার দুঃখকষ্ট, গঞ্জনা, লাঞ্ছনা সহিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে।

নেপালের পুঁথিতে ও রাগতরঙ্গিনীতে বর্ষা অভিসারের একটি পদের পটভূমিকায় দেখি—

রয়নি কাজর বম ভীম ভুজঙ্গম
কুলিস পরএ দুরবার।
গরজ তরজ মন রোস ধরিস খন
সংসঅ পড় অভিসার।

রাত্রি যেন কজ্জল উদ্গীরণ করিতেছে, ভীম সর্প পথে বাহির হইয়াছে, দুর্বার কুলিশ বর্ষিত হইতেছে। গর্জনে মন ত্রস্ত হইল; মেঘ কুপিত হইয়া জলধারা বর্ষণ করিতেছে। অভিসারে সংশয় পড়িল। তথাপি নায়িকা অভিসারে বাহির হইলেন। তাহার

চরণ বেঢ়িল ফণি হিত মানলি ধনি
নেপুর ন করএ রোর।
সুমুখি পুছওঁ তোহি সরূপ কহসি মোহি
সিনেহক কত দুর ওর॥

সখী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—ঠিক করিয়া বল তো—প্রেমের সীমা কতদূর? আর একটি পদে (মিত্র—মজুমদার ৩৩২) আছে যে বর্ষণমুখর ভয়ঙ্কর রজনীতে রাধা একা অভিসারে বাহির হইল। যে সুমুখী ঘরের দেওয়ালে আঁকা সাপের ছবি দেখিলেও ভয় পায় সে আজ হাত দিয়া সাপের মাথার মণি ঢাকিয়া হাসিমুখে তোমার কাছে অভিসারে আসিল। বিদ্যাপতি ইহার উপর মন্তব্য করিতেছেন—

কাম পেম দুহু এক মত ভএ রহু
কখনে কী ন করাবে।

সুতরাং বিদ্যাপতির পদে নায়ক নায়িকা শুধু সুখের জন্যই প্রেম চান একথা ঠিক নহে। বিদ্যাপতি কামের সহিত প্রেমের যে পার্থক্য আছে তাহা জানিতেন। তাঁহার রাধা হাসিমুখে প্রেমের জন্য অশেষ কষ্ট ভোগ করিয়াছে।

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের তুলনামূলক আলোচনা লিখিবার দশবৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ "বিদ্যাপতির রাধিকা" প্রবন্ধ লেখেন। ইহাতে বিদ্যাপতির পদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য এমন ভাবে দেখান হইয়াছে যে সেই সমালোচনাই মনোরম কবিতা হইয়া উঠিয়াছে। বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধির পদগুলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"যৌবন, সেও সবে আরম্ভ হইতেছে, তখন সকলই রহস্যপরিপূর্ণ। সদ্য-বিকচ-হৃদয় সহসা আপনার সৌরভ আপনি অনুভব করিতেছে; আপনার সম্বন্ধে আপনি সবেমাত্র সচেতন হইয়া উঠিতেছে; তাই লজ্জায় ভয়ে আনন্দে সংশয়ে আপনাকে গোপন করিবে কি প্রকাশ করিবে ভাবিয়া পাইতেছে না—

কবহুঁ বান্ধয়ে কচ কবহুঁ বিথারি।
কবহুঁ ঝাঁপয়ে অঙ্গ কবহুঁ উখারি॥"

উল্লিখিত দুই চরণের কবিত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা বলিয়া উপরের কয়েক পংক্তিকে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু ইহার পর রবীন্দ্রনাথ যে কথা বলিয়াছেন তাহা পদব্যাখ্যা নহে—একটি স্বতন্ত্র ছোট্ট গদ্য-কবিতা—"হৃদয়ের নবীন বাসনাসকল পাখা মেলিয়া উড়িতে চায় কিন্তু এখনো পথ জানে নাই। কৌতূহল এবং অনভিজ্ঞতায় সে একবার ঈষৎ অগ্রসর হয় আবার জড়সড় অঞ্চলটির অন্তরালে আপনার নিভৃত কোমল কুলায়ের মধ্যে ফিরিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে।"

এই কথাটিই রবীন্দ্রনাথ অন্য ভাষায় পূর্বে আর একবার বলিয়াছেন—"বিদ্যাপতির রাধা নবীনা নবস্ফুট। আপনাকে এবং পরকে ভালো করিয়া জানে না। দূরে সহাস্য সতৃষ্ণ লীলাময়ী; নিকটে কম্পিত শঙ্কিত বিহ্বল। কেবল একবার কৌতূহলে চম্পকঅঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া অতিসাবধানে অপরিচিত প্রেমকে একটুমাত্র স্পর্শ করিয়া অমনি পলায়নপর হইতেছে।" এমন করিয়া নূতন কবিতা সৃজন করিয়া পুরাতন কবিকে বুঝাইবার চেষ্টা বোধ হয় সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল। বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধির ও নবোঢ়া মিলনের পদগুলির সহিত রবীন্দ্রনাথ সমীরচঞ্চল সমুদ্রের উপরিভাগের তুলনা করিয়া লিখিয়াছেন—"ঢেউ খেলিতেছে; ফেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে; মেঘের ছায়া পড়িতেছে; সূর্যের আলোক শত শত অংশে প্রতিস্ফুরিত হইয়া চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতেছে; তরঙ্গে তরঙ্গে স্পর্শ এবং পলায়ন, কলরব, কলহাস্য, করতালি; কেবল নৃত্য এবং গীত, আভাস এবং আন্দোলন, আলোক এবং বর্ণবৈচিত্র্য।" বিদ্যাপতির পদের চেয়ে রবীন্দ্রনাথের এই উপমা বোধ হয় বেশী উপভোগ্য।

রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতিকে সুখের কবি বলিয়াছেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে বিদ্যাপতি বুঝি তাঁহার অল্পবয়সেই সকল পদ রচনা করিয়াছিলেন। তাই তিনি লিখিয়াছেন—"বিদ্যাপতির প্রেমে যৌবনের নবীনতা এবং চণ্ডিদাসের প্রেমে অধিক বয়সের প্রগাঢ়তা আছে।" কিন্তু এখন তাঁহার ভণিতাংশে মিথিলার রাজা ও রাজপুরুষদের উল্লেখ হইতে দেখা যাইতেছে যে তিনি রবীন্দ্রনাথেরই ন্যায় সুদীর্ঘকাল ধরিয়া কবিতা লিখিয়াছিলেন। বিদ্যাপতির লেখা বিরহের যে সব পদ রবীন্দ্রনাথ

দেখিয়া যাইতে পারেন নাই, তাহার মধ্যে দুঃখের সুতীব্র অভিব্যক্তিও আছে।

বিদ্যাপতির পদাবলীতে অলঙ্কারের বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের মনকে পীড়িত করিয়াছিল। তিনি 'বসন্ত রায়' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ হইতে 'সজনি কি হেরনু ও মুখশোভা' ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনার পদটি উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন—"এই কবিতাটি রচনা করিবার সময় কবির হৃদয়ে ভাবের আবেশ উপস্থিত হয় নাই। কতকগুলি টানাবোনা বর্ণনা করিয়া গোটাকতক ছত্র মিলাইয়া দিয়াছেন। আমার বোধ হয়, যেন বিদ্যাপতি কৃষ্ণ হইয়া রাধার রূপ উপভোগ করিতে পারিয়াছেন, কিন্তু রাধা হইয়া কৃষ্ণের রূপ উপভোগ করিতে পারেন নাই।" এই উক্তি যথার্থ ও বিচারসহ। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে রাধাভাবভাবিত হইয়া কোন কবিই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

রবীন্দ্রনাথ চণ্ডীদাসের পদাবলীর মর্মকথা সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি লইয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার সন্ধানী দৃষ্টি প্রাক্-চৈতন্য যুগের আসল চণ্ডীদাসকে আবিষ্কার করিয়াছিল। তিনি "চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি" প্রবন্ধে চণ্ডীদাস—ভনিতা-যুক্ত যে কয়টি পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার কোনটিই দীন চণ্ডীদাসের রচনা নহে। কৃষ্ণকীর্তন প্রণেতা অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসের কোন পদের উল্লেখ এই প্রবন্ধে তো নাইই—(থাকিবার কথাও নহে) সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যের কোথাও নাই। ১৩২৩ সালে কৃষ্ণকীর্তন প্রকাশিত হইবার পর হইতে অনেক অনেক মহারথী উহাকে মহাকাব্য বলিয়া সম্বর্ধিত করিয়াছেন, কিন্তু কবিগুরু উহার সম্বন্ধে চিরকালই নীরব ঔদাসীন্য দেখাইয়াছেন।

১২৮৮ সালে যখন রবীন্দ্রনাথ 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি' প্রবন্ধ লেখেন তখন চণ্ডীদাস সম্বন্ধে কোন গবেষণাই হয় নাই। মুকুন্দদাসের সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ও তখন পর্যন্ত ছাপা হয় নাই। তথাপি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সহজাত কবিপ্রতিভার ফলে চণ্ডীদাসের এমন একটি পদ প্রথমেই উদ্ধৃত করিলেন যেটির একমাত্র রচয়িতার সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। কেননা "এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা" পদটিই সিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়ে চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়া ধৃত হইয়াছে। এই পদটির সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন যে সহজ কথার কবি চণ্ডীদাস যতটুকু বলেন, তাহার চেয়ে বেশী ইঙ্গিত করেন। এরূপ সহজ কথা "পাঠকদিগকে কবি হইবার পথ দেখাইয়া দেয়, যেদিকে কল্পনা ছুটাইতে হইবে, সেই দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া দেয় মাত্র, আর অধিক কিছু করে না।" কল্পনা ছুটাইয়া কিরূপে পদের মধ্যে যাহা বলা হয় নাই তাহা শোনা যায় তাহার দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ ঐ পদটির ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া দিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন—"রাধা শ্যামকে প্রথম দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন—

এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বাটে,

আঙিনার কোণে তিতিছে বঁধুয়া
দেখিয়া পরাণ ফাটে।

কিন্তু তাহার পরেই যে তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরাইয়া সখীদের ডাকিয়া কহিলেন,—

সই, কি আর বলিব তোরে
বহু পুণ্য ফলে সে হেন বঁধুয়া
আসিয়া মিলল মোরে।

ইহার মধ্যে কতটা কথা রাধার মনের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। কতটা কথা একেবারে বলাই হয় নাই। প্রথমেই শ্যামকে ভিজিতে দেখিয়া দুঃখ, তাহার পরেই সখীদের ডাকিয়া তাহাদের কাছে সুখের উচ্ছ্বাস, ইহার মধ্যে শৃঙ্খলটি কোথায়? সে শৃঙ্খল পাঠকদিগকে গড়িয়া লইতে হয়। রাধা যা কহিল, তাহা ত সামান্য কিন্তু রাধা যাহা কহিল না তাহা কতখানি! যাহা বলা হইল না পাঠকদিগকে তাহাই শুনিতে হইবে। শ্যামকে ভিজিতে দেখিয়া রাধার দুঃখ, ও শ্যামকে ভিজিতে দেখিয়াই রাধার সুখ, উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব হইতেছে। রাধার হৃদয়ের এই তরঙ্গ-ভঙ্গ, এই উত্থান-পতন, কত অল্প কথায় কত সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে। প্রথম দুই ছত্রে শ্যামকে দেখিয়া দুঃখ, দ্বিতীয় দুই ছত্রে সুখ, তৃতীয় দুই ছত্রে আবার দুঃখ, চতুর্থ দুই ছত্রে আবার সুখ। রাধা হাসিবে কি কাঁদিবে ভাবিয়া পাইতেছে না। রাধা সুখে দুঃখে আকুল হইয়া পড়িয়াছে। শেষে রাধা এই মীমাংসা করিল শ্যাম আমার জন্য কত কষ্ট পাইয়াছে। আমি শ্যামের জন্য ততোধিক কষ্ট স্বীকার করিয়া শ্যামের সে ঋণ পরিশোধ করিব।"

এই পদের শেষে আছে--

বঁধুর পিরীতি আরতি দেখিয়া
মোর মনে হেন করে,
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া
অনল ভেজাই ঘরে।

তাহার অর্থ আমাদের মতন অকবি পাঠকেরা করে যে বন্ধু আমাকে এত ভালবাসে, সুতরাং তাহার ভালবাসার প্রতিদান দিবার জন্য আমি কুলত্যাগিণী হইব। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে দেখাইয়া দিলেন এরূপ বুঝিলে পদটির আসল কথাই অবুঝা রহিয়া যাইবে। শ্যাম রাধার জন্য এই আঁধার বাদল রাতে অভিসারে আসিয়া আঙিনার কোণে দাঁড়াইয়া ভিজিতেছেন। এ তাঁহার অসাধারণ ভালবাসার নিদর্শন; তিনি কত কষ্ট পাইতেছেন। রাধা যদি তাহার ধ্রুব আশ্রয়স্বরূপ স্বামীর ঘরে আগুন দিয়া কলঙ্কের পসরা মাথায় করিয়া বাহির হইয়া যায় তবে তাহাকে যে কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে তাহা নিশ্চই শ্যামের কষ্টস্বীকার অপেক্ষা অধিক হইবে। তাহাতেই কিন্তু শ্যামের ভালবাসার যথার্থ প্রতিদান হইবে।

রবীন্দ্রনাথ চণ্ডীদাসের—

সই, কেমনে ধরিব হিয়া
আমার বঁধুয়া আন বাড়ি যায়
আমার আঙিনা দিয়া।

ইত্যাদি পদের ভাব ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন যে রাধার বঁধুকে যে এমন করিল তাহাকে রাধা অভিশাপ দিলেন—"আমার পরাণ যেমতি করিছে তেমতি হউক্ সে।" এই কথাটার মধ্যে কতটা কথা আছে! রাধা সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর অভিশাপ খুঁজিয়া পাইল না। শত সহস্র অভিশাপের পরিবর্তে সে কেবল একটি কথা কহিল। সে কহিল, "আমার পরাণ যেমন করিছে, তেমনি হউক সে!" ইহাতেই বুঝিতে পারিয়াছি রাধার পরাণ কেমন করিতেছে। ঐ এক "যেমন করিছে" শব্দের মধ্যে নিদারুণ কষ্ট প্রচ্ছন্ন আছে। সে বর্ণনা না করিলে যতটা বর্ণিত হয়, এমন আর কিছুতে না। উপরি-উক্ত পদটির মধ্যে রাধা দুইবার অভিশাপ দিতে গিয়াছে, কিন্তু উহার অপেক্ষা গুরুতর অভিশাপ সে আর কোন মতে খুঁজিয়া পাইল না। ইহাতেই রাধার হৃদয় দেখিতে পাইলাম।"
স্পষ্ট করিয়া না বলিয়া ব্যঞ্জনার দ্বারা প্রকাশ করা যে কত হৃদয়স্পর্শী হইতে পারে তাহার আর একটি দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ চণ্ডীদাসের পদ হইতে দিয়াছেন।

তোমারে বুঝাই বঁধু, তোমারে বুঝাই
ডাকিয়া শুধায় মোরে হেন কেহ নাই,
অনুক্ষণ গৃহে মোরে গঞ্জয়ে সকলে
নিচয় জানিও মুঞি ভখিমু গরলে।

এই পদের উপর রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করিতেছেন—"এত করিয়া বুঝাইবার আবশ্যক কি? শ্যাম কি বুঝেন না? কিন্তু তবু রাধার সর্বদাই মনে হয়, 'কি জানি।' মনে হয় শ্যামও পাছে আমাকে ডাকিয়া না শুধায়। যদিও শ্যামের সেরূপ ভাব দেখে নাই, তবুও ভয় হয়।" শেষে উদ্ধৃত দুই ছত্রের সম্বন্ধে বলিতেছেন—"আমাকে গৃহে সকলে গঞ্জনা করে, অতএব—সে অতএব কি, তাহা কি কাহাকেও বলিতে হইবে? সেই অতএব যদি পূর্ণ না হয় তবে রাধা বিষ খাইবে। "কে মোর ব্যথিত আছে, কারে কব দুখ?" রাধা শ্যামের মুখ হইতে শুনিতে চায়। আমি তোমার ব্যথিত, আমি তোমার দুঃখ শুনিব। রাধা শ্যামকে কহিল না যে, তুমি আমার দুঃখে দুঃখ পাও, তুমি আমার ব্যথার ব্যথী হও, সে শুধু শ্যামের মুখ চাহিয়া রহিল, "কে মোর ব্যথিত আছে, কারে কব দুখ?"

রবীন্দ্রনাথের মতে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির অপেক্ষা অনেক বড় কবি। বিদ্যাপতির কলম দিয়া কখনও এমন কথা বাহির হয় নাই যে—

সই পিরীতি না জানে যারা

এ তিন ভুবনে জনমে জনমে
কি সুখ জানয়ে তারা ?

অথবা—

বিধি যদি শুনিত মরণ হইত
ঘুচিত সকল দুখ
চন্ডীদাস কয়, এমতি হইলে
পিরীতির কিবা সুখ!

রবীন্দ্রনাথ বলেন—"দুখই যদি ঘুচিল তবে আর সুখ কিসের? এত গম্ভীর কথা বিদ্যাপতি কোথাও প্রকাশ করেন নাই।" তাঁহার মতে "বিদ্যাপতির সমস্ত পদাবলীতে একটি মাত্র কবিতা আছে, চন্ডিদাসের কবিতার সহিত যাহার তুলনা হইতে পারে।" সেটি হইতেছে "জনম অবধি হম রূপ নেহারনু"। বসন্তরায় শীর্ষক প্রবন্ধের এবং 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে এই পদটি বিদ্যাপতির বলিয়া উল্লেখ করিলেও রবীন্দ্রনাথ পদরত্নাবলীতে ইহার ভণিতা পদকল্পতরুর প্রমাণ অনুসারে ছাপিয়াছেন—

কহ কবিবল্লভ হৃদয় জুড়াইতে
মিলয়ে কোটিমে একি ॥

তিনি উহার পাদটীকায় অবশ্য লিখিয়াছেন—"এই কবিতা সাধারণতঃ বিদ্যাপতির বলিয়া পরিচিত।" এই উক্তি পড়িয়া মনে হয় রবীন্দ্রনাথ এটিকে কবিবল্লভের পদ বলিয়াই ১২৯২ সালে মনে করিয়াছিলেন। বল্লভ নরোত্তম দাসের শিষ্য ও গোবিন্দদাসের সমসাময়িক কবি ছিলেন। গোবিন্দদাস কয়েকটি পদের ভণিতায় বল্লভের নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং একটি পদে বলিয়াছেন যে "শ্রীবল্লভ জানে রস মরিযাদ" অর্থাৎ রসের যে মর্যাদা তাহা বল্লভই জানেন। 'জনম অবধি' পদে আছে—

যত যত রসিক জন রস অনুমগন
অনুভব কহে, না পেখে।

ইহাকে যদি রসমর্যাদার কথা বলিয়া ধরা যায় তাহা হইলে ঐ সুপ্রসিদ্ধ পদটিকে বল্লভের রচনা বলিয়াই মানিতে হয়। মিথিলায় বা নেপালের কোন পুথিতে ঐ পদটি পাওয়া যায় নাই; অন্যদিকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণবদাস এটি বল্লভের ভণিতাসহ ধরিয়াছেন। অবশ্য এ কথাও বলা প্রয়োজন যে বল্লভভণিতাযুক্ত অন্য কোন পদে এরূপ গভীর রসনাভূতির কথা পাওয়া যায় না। তাহার উত্তরে বলা যায় যে কোন কোন কবি একটি মাত্র পদেই তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ উপলব্ধির সাক্ষ্য রাখিয়া গিয়াছেন।

অনাগত ভবিষ্যতে যে প্রেমের যুগ আসিবে বলিয়া রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, সেই যুগের কবি বলিয়া চন্ডীদাসকে সম্বর্ধনা জানাইয়াছেন। প্রেমের জগৎ আসার স্বপ্ন রবীন্দ্রনাথ ১২৮৮ সালেও যে দেখিতেন তাহার প্রমাণ 'চন্ডীদাস ও বিদ্যাপতি'

প্রবন্ধের উপসংহারে পাওয়া যায়—"কঠোর ব্রত স্বরূপে প্রেম সাধনা করা চণ্ডীদাসের ভাব, সে ভাব তাঁহার সময়কার লোকের মনোভাব নহে, সে ভাব এখনকার সময়ের ভাবও নহে, সে ভাবের কাল ভবিষ্যতে আসিবে। যখন প্রেমের জগৎ হইবে, যখন প্রেম বিতরণ করাই জীবনের একমাত্র ব্রত হইবে; পূর্বে যেমন যে যত বলিষ্ঠ ছিল সে ততই গণ্য হইত, তেমনি এমন সময় যখন আসিবে যখন যে যত প্রেমিক হইবে সে ততই আদর্শস্থল হইবে, যাহার হৃদয়ে অধিক স্থান থাকিবে, যে যত অধিক লোককে হৃদয়ে প্রেমের প্রজা করিয়া রাখিতে পারিবে সে ততই ধনী বলিয়া খ্যাত হইবে, যখন হৃদয়ের দ্বার দিবারাত্রি উদ্ঘাটিত থাকিবে ও কোন অতিথি রুদ্ধদ্বারে আঘাত করিয়া বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া না যাইবে, তখন কবিরা গাইবেন;—

পিরীতি নগরে বসতি করিব
পিরীতে বাঁধিব ঘর,
পিরীতি দেখিয়া পড়শি করিব
তা বিনু সকলি পর।

এই রচনার ষাট বৎসর পরে, ১৩৪৮ সালের ১লা বৈশাখ তারিখে 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ এই প্রেমের জগতের আবির্ভাবের আশ্বাস দিয়াছেন—

উদয়শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব
নবজীবনের আশ্বাসে।
'জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয়'
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে।

বসন্তরায়কে রবীন্দ্রনাথের আবিষ্কার বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সঙ্গে তিনি বসন্তরায়কে প্রায় সমান আসন দিয়াছেন। না, বিদ্যাপতির চেয়ে বসন্তরায়কে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। তাঁহার মতে বিদ্যাপতির ভাষা কৃত্রিম, তাহাতে টানাবোনা তুলনার বাহুল্য; আর বসন্তরায়ের সহজ ভাষার মধ্যে এমন একটি যাদু-গিরি আছে যে প্রাণে সৌন্দর্যের পরশ লাগাইয়া দেয় ও আনন্দের হিল্লোল বহাইয়া দেয়। দ্বিতীয়তঃ বিদ্যাপতির মতে রূপ উপভোগ্য বলিয়া সুন্দর, আর বসন্তরায় যেন বলেন রূপ সুন্দর বলিয়া উপভোগ্য। তৃতীয়তঃ বিদ্যাপতির সম্ভোগের পদে শুধু সম্ভোগটুকুই বর্ণনা করিয়াছেন, আর বসন্তরায় সম্ভোগের কবিত্ব ও মাধুর্যটুকু বর্ণনা করিয়াছেন। চতুর্থতঃ বসন্তরায় যেমন করিয়া বস্তুগত বর্ণনা হইতে সহসা এমন ভাবের কথা বলেন যে পাঠকের কল্পনা পাখা ছড়াইয়া উড়িয়া যায়, বিদ্যাপতির পদে সাধারণতঃ সেরূপ দেখা যায় না। আর সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে বসন্তরায়ের

প্রাণনাথ, কেমন করিব আমি
তোমা বিনে মন করে উচাটন
কে জানে কেমন তুমি!

ইত্যাদি পদের প্রথম দুটি ছত্রে ভাবের অধীরতা; ভাষার বাঁধ ভাঙিবার জন্য ভাবের আবেগ কি চমৎকার প্রকাশ পাইতেছে! "প্রাণনাথ কেমন করিব আমি!" ইহাতে কতখানি আকুলতা প্রকাশ পাইতেছে! আমার প্রাণ তোমাকে লইয়া কি যে করিতে চায় কিছু বুঝিতে পারি না। এত দেখিলাম এত পাইলাম, তবুও প্রাণ আজও বলিতেছে "প্রাণনাথ কেমন করিব আমি!" বিদ্যাপতি বলিয়াছেন,

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়ে জুড়ন না গেল।

বিদ্যাপতি সমস্ত কবিতাটিতে যাহা বলিয়াছেন, ইহার এক কথায় তাহার সমস্তটা বলা হইয়াছে এবং তাহা অপেক্ষা শতগুণ অধীরতা ইহাতে ব্যক্ত হইতেছে। "প্রাণনাথ কেমন করিব আমি"! দ্বিতীয় ছত্রে রাধা শ্যামের মুখের দিকে আকুল নেত্রে চাহিয়া কহিতেছেন "কে জানে কেমন তুমি" যাহার এক তিল ঊর্ধ্ব উঠিলেই ভাষা মরিয়া যায়, সেই ভাষার শেষ সীমায় দাঁড়াইয়া রাধা বলিতেছেন "কে জানে কেমন তুমি!"

রবীন্দ্রনাথের এই সমালোচনা পড়িয়া 'শেষের কবিতা'র অমিত রায়ের কথা মনে পড়ে। অমিত নিবারণ চক্রবর্তী নামে নিজেরই ছদ্মনামের কবিকে আমদানি করিয়া রবিঠাকুর যে তাহার তুলনায় কবিই নয় তাহা প্রমাণ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল। অমিত লাবণ্যকে বলিয়াছিল—"নিবারণ চক্রবর্তী বাসরঘরের উপর একটা কবিতা লিখেছে: সেটা তোমাদের কবিবরের তাজমহলের সংক্ষিপ্ত উত্তর......। রবিঠাকুর কেবল চলে যাবার কথাই বলে, রয়ে যাবার গান গাইতে জানে না।"

বসন্তরায়কে রবীন্দ্রনাথের আবিষ্কার বলিতেছি বলিয়া কেহ যেন এরূপ বুঝিবেন না যে বসন্তরায় বলিয়া কোন কবির অস্তিত্বই ছিল না। বসন্তরায় নামক কবির ৫১টি পদ পদকল্পতরুতে ধৃত হইয়াছে। কিন্তু তাহার মধ্যে ৪৯টিই পদকল্পতরুর একেবারে শেষ খণ্ডে অনেকটা পরিশিষ্ট ভাগের মতন স্থানে। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে, রাধামোহনঠাকুর পদামৃতসমুদ্রে এবং দীনবন্ধু দাস সংকীর্তনামৃতে রায় বসন্তের কোন পদ ধরেন নাই। রায় বসন্তের নরোত্তমবন্দনা ভক্তিরত্নাকরে আছে। নরহরি চক্রবর্তী ঐ গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

শ্রীনরোত্তমের শিষ্য নাম শ্রীবসন্ত।
বিপ্রকুলোদ্ভব মহাকবি বিদ্যাবন্ত॥

এই বসন্ত রায় ব্রাহ্মণ ছিলেন, সুতরাং তিনি বঙ্গকায়স্থকুলোদ্ভব যশোহরের অধিপতি প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত নহেন—যদিও 'বৌঠাকুরাণীর হাটে' বসন্তরায় বৈষ্ণব ও পদাবলীপ্রিয় বলিয়া চিত্রিত হইয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ বসন্তরায়ের পদ ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া উহাতে যে অনেক কথা আরোপ করিয়াছেন তাহার একটি উদাহরণ দিতেছি। বসন্তরায়ের রাধা বলিতেছেন—

ওহে নাথ, কিছুই না জানি,
তোমাতে মগন মন দিবস রজনী,
জাগিতে ঘুমিতে চিতে তোমাকেই দেখি,
পরাণ পুতলী তুমি জীবনের সখি!
অংগ অভরণ তুমি শ্রবণ রঞ্জন,
বদনে বচন তুমি নয়নে অঞ্জন!
নিমিখে শতেক যুগ হারাই হেন বাসি,
রায় বসন্ত কহে পহু প্রেমরাশি।

"ঠিক কথা বটে—নিমিখে শতেক যুগ হারাই হেন বাসি! যতই সময় পাওয়া যায়, ততই কাজ করা যায়। আমাদের হাতে "শতেক যুগ" নাই বলিয়া আমাদের অনেক কাজ অসম্পূর্ণ থাকে। শতেক যুগ পাইলে আমরা অনেক কাজ সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারি, কিন্তু প্রেমের সময়-গণনা যুগ-যুগান্তর লইয়া নহে। প্রেম নিমিখ লইয়া বাঁচিয়া থাকে, এই নিমিত্ত প্রেমের সর্বদাই ভয়, পাছে নিমিখ হারাইয়া যায়। এক নিমিখে মাত্র আমি যে একটি চাহনি দেখিয়াছিলাম, তাহাই হৃদয়ের মধ্যে লালন করিয়া আমি শতেক যুগ বাঁচিয়া থাকিতে পারি; আবার হয়ত শতেক যুগ অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছি, কখন আমার একটি নিমেষ আসিবে একটি মাত্র চাহনি দেখিব! দৈবাৎ সেই একটি মুহূর্ত হারাইলে আমার অতীত কালের শতেক যুগ ব্যর্থ হইল, আমার ভবিষ্যৎ কালের শতেক যুগ হয়ত নিষ্ফল হইবে। প্রতিভার স্ফূর্তির ন্যায় প্রেমের স্ফূর্তিও একটি মাহেন্দ্রক্ষণ একটি শুভ মুহূর্তের উপর নির্ভর করে। হয়ত শতেক যুগ আমি তোমাকে দেখিয়া আসিতেছি, তবুও তোমাকে ভালবাসিবার কথা আমার মনে আসে নাই—কিন্তু দৈবাৎ একটি নিমিখ আসিল, তখন না জানি কোন্ গ্রহ কোন্ কক্ষে ছিল—দুই জনে চোখোচোখি হইল, ভাল বাসিলাম। সেই এক নিমিখ হয়ত পদ্মার তীরের মত অতীত শতযুগের পাড় ভাঙিয়া দিল ও ভবিষ্যৎ শতযুগের পাড় গড়িয়া দিল। এই নিমিত্তেই রাধা যখন ভাগ্যক্রমে প্রেমের শুভ-মুহূর্ত পাইয়াছেন, তখন তাঁহার প্রতিক্ষণে ভয় হয় পাছে এক নিমিখ হারাইয়া যায়, পাছে সেই এক নিমিখ হারাইয়া গেলে শতেক যুগ হারাইয়া যায়। পাছে শতেক যুগের সমুদ্রের মধ্যে ডুবিয়া সেই নিমিখের হারাণ রত্নটুকু আর খুঁজিয়া না পাওয়া যায়! সেই জন্য তিনি বলিয়াছেন "নিমিখে শতেক যুগ হারাই হেন বাসি।"

উদ্ধৃতি সুদীর্ঘ হইল, কিন্তু সমস্তটা উদ্ধৃত না করিলে বুঝা কঠিন যে বসন্ত রায়ের এক দুই ছত্র কবিতা ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া রবীন্দ্রনাথ কত ছত্র অনবদ্য সুন্দর কবিতা রচনা করিয়াছেন। বসন্ত রায় যা অন্য কোন কবি নিশ্চই রবীন্দ্রনাথ-ব্যাখ্যাত প্রেমের মাহেন্দ্রক্ষণের কথা ঐ ভাবে কখনও কল্পনাও করেন নাই। পরিণত বয়সে এইরূপ ব্যাখ্যার অযৌক্তিকতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই কি ১৩১৯

সালে রবীন্দ্র গ্রন্থাবলীর হিতবাদী সংস্করণে এই সমালোচনাটি স্থান দিয়া পরে এটিকে বাতিল ও অচলিত করিয়া দিয়াছিলেন?

কিন্তু প্রবন্ধটিতে পদাবলী আলোচনার এমন এক মরমী রীতির পথনির্দেশ করা হইয়াছে যে ইহাকে বিস্মৃতির গর্ভ হইতে উদ্ধার করা প্রয়োজন। বসন্ত রায়ের এই পদটি পদকল্পতরুর একেবারে শেষে (২৯৫৫ সংখ্যক) লুকাইয়া ছিল—

আলো ধনি, সুন্দরি, কি আর বলিব।
তোমা না দেখিয়া আমি কেমনে রহিব॥
তোমার মিলন মোর পুণ্য-পুঞ্জ রাশি।
মরমে লাগিছে মধুর মৃদু-হাসি॥
আনন্দ-মন্দির তুমি জ্ঞান শকতি।
বাঞ্ছাকল্পলতা মোর কামনা মুরতি॥
সঙ্গের সঙ্গিনী তুমি সুখময় ধাম।
পাসরিব কেমনে জীবনে রাধা নাম॥
গলে বনমালা তুমি, মোর কলেবর।
রায় বসন্ত কহে প্রাণের গুরুতর॥

রবীন্দ্রনাথ এই পদটি যে আকর হইতে তুলিয়াছেন তাহাতে হয়তো চতুর্থ ও পঞ্চম চরণ হিসাবে নিম্নলিখিত দুই চরণ ছিল না—

না দেখিলে নিমিখে শতেক যুগ বাসি।
বদন-কমল তোমার সম্পূরণ শশী॥

সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের আদর্শ ক, খ ও চ পুঁথিতেও এই দুইটি চরণ নাই। এই পদের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন যে ইহাতে কয়েকটি সম্বোধন চমৎকার। "রাধাকে যে কৃষ্ণ বলিতেছেন—তুমি আমার কামনার মূর্তি, আমার শরীর তৃপ্ত হয়—না, তুমি তাহারো অধিক, তুমি আমার শরীর, আমাতে প্রকাশ পাইতেছে, ইহা কি সুন্দর! তুমি আমার গলে বনমালা, তোমাকে পরিলে আমার শরীর তৃপ্ত হয়—না—তুমি তাহারো অধিক, তুমি আমার শরীর, আমাতে তোমাতে প্রভেদ আর নাই; না, শরীর না, তুমি শরীরের চেয়েও অধিক, তুমি আমার প্রাণ, সর্ব শরীরকে ব্যাপ্ত করিয়া যাহা রহিয়াছে, যাহার আবির্ভাবে শরীর বাঁচিয়া আছে, শরীরে চৈতন্য আছে, তুমি সেই প্রাণ—রায় বসন্ত কহিলেন, না, তুমি তাহারো অধিক, তুমি প্রাণেরো গুরুতর, তুমি বুঝি প্রাণকে প্রাণ দিয়াছ, তুমি আছ বলিয়াই বুঝি প্রাণ আছে।" শেষ দুই চরণের মধ্যে যে চারটি স্তরভেদ করিয়া রাধার গুরুত্ব দেখান হইয়াছে তাহা রবীন্দ্রনাথ আমাদের ন্যায় অন্ধের চক্ষু উন্মীলন করাইয়া দেখাইয়া না দিলে দেখিতে পাইতাম না নিশ্চয়ই।

১২৯১ সালের কার্তিক সংখ্যার 'নবজীবন' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানদাসের বংশী শিক্ষার পদেরও এইরূপ একটি মরমী ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পদটি—পদরত্নাবলীর

৭৮ সংখ্যক পদরূপে ধৃত হইয়াছে। ইহার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য প্রকট করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"সৌন্দর্য-স্বরূপের হাতে সমস্ত জগতই একটি বাঁশী। ইহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে নূতন নূতন সুর উঠিতেছে। মানুষের মন আর কি ঘরে থাকে? তাই সে ব্যাকুল হইয়া বাহির হইতে চায়। সৌন্দর্যই তাঁহার আহ্বান গান। সৌন্দর্যই সেই দৈববাণী। কদম্বফুল তাঁহার বাঁশীর স্বর, বসন্ত ঋতু তাঁহার বাঁশীর স্বর, কোকিলের পঞ্চম তান তাঁহার বাঁশীর স্বর। সে বাঁশীর স্বর কি বলিতেছে; জ্ঞানদাস হাসিয়া বুঝাইলেন, সে কেবল বলিতেছে, "রাধে তুমি আমার"—আর কিছুই না। আমরা শুনিতেছি, সেই অসীম সৌন্দর্য অব্যক্ত কণ্ঠে আমাদেরই নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন। তিনি বলিতেছেন—"তুমি আমার, তুমি আমার কাছে আইস!" এই জন্য, আমাদের চারিদিকে যখন সৌন্দর্য বিকশিত হইয়া উঠে, তখন আমরা যেন একজন-কাহার বিরহে কাতর হই, যেন একজন-কাহার সহিত মিলনের জন্য উৎসুক হই—সংসারে আর যাহারই প্রতি মন দিই, মনের পিপাসা যেন দূর হয় না।"

জ্ঞানদাসের পদের মধ্যে এধরণের কোন কথা যে আছে তাহা সাধারণ পাঠকের চোখে পড়ে না। জ্ঞানদাসের রাধা জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

কোন রন্ধ্রে রসালে ফুটয়ে পারিজাত।
কোন রন্ধ্রে কদম্ব ফুটে হে প্রাণনাথ॥
কোন রন্ধ্রে ষড়ঋতু হয় এককালে।
কোন রন্ধ্রে নিধুবন হয় ফুলে ফলে॥

শেষোক্ত দুই চরণের কোন ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ করেন নাই। পদের ভনিতাংশে আছে—

জ্ঞানদাস কহে হাসি
"রাধে মোর" বোল বাজিবেক বাঁশী॥

শ্রীরূপগোস্বামী কর্তৃক প্রবর্তিত ভজনপ্রণালী যাঁহারা অনুসরণ করিয়া চলেন তাঁহারা রাধার সঙ্গে কখনই নিজেকে অভিন্ন করিয়া দেখেন না; তাঁহারা মঞ্জরী ভাবে সখীর অনুগা হইয়া রাধাকৃষ্ণের সেবা করিতে চাহেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী যখন "রাধামোর" বলিয়া ডাকিতেছে তখন কোন মঞ্জরী ভাবের সাধক বলিবেন না যে বাঁশী তাঁহারই নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। রবীন্দ্রনাথ ১২৯১ সালে সৌন্দর্য দেখিয়া আমরা যে বিরহভাব বোধ করি লিখিয়াছেন, ১২৯৮ সালে 'মেঘদূত' প্রবন্ধে তাহাই বিশদ করিয়া বলিয়াছেন—"প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অতলস্পর্শ বিরহ। আমরা যাহার সহিত মিলিত হইতে চাহি, সে আপনার মানস-সরোবরের অগম তীরে বাস করিতেছে, সেখানে কেবল কল্পনাকে পাঠানো যায়, সেখানে সশরীরে উপনীত হইবার কোনো পথ নাই।" মেঘদূতের মর্মকথা প্রকাশ করিতে যাইয়াও রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"এই চিরবিরহের কথা উল্লেখ করিয়া বৈষ্ণব কবি গাহিয়াছেন—

"দুহুঁ কোলে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া"

ঐ বিরহ-বেদনা বোধের কারণ দেখাইতে যাইয়া রবীন্দ্রনাথ বলরাম দাসের নিম্নলিখিত পদাংশের এক অচিন্তিত-পূর্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

পদটির আরম্ভে আছে—"তুমি মোর নিধি রাই তুমি মোর নিধি" পদটি শেষ হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি দিয়া—

হিয়ার ভিতর হইতে কে কৈলে বাহির।
তেঁঞি বলরামের পহুঁর চীত নহে থীর॥

রবীন্দ্রনাথ মেঘদূত প্রবন্ধে লিখিয়াছেন--"আমরা যেন কোনো এক কালে একত্র এক মানসলোকে ছিলাম, সেখান হইতে নির্বাসিত হইয়াছি। তাই বৈষ্ণব কবি বলেন, তোমায় "হিয়ার ভিতর হইতে কে কৈল বাহির!" এ কী হইল। যে আমার মনো-রাজ্যের লোক, সে আজ বাহিরে আসিল কেন। ওখানে তো তোমার স্থান নয়। বলরাম দাস বলিতেছেন "তেঁঞি বলরামের পহুঁর চিত নহে স্থির।"* যাহারা একটি সর্বব্যাপী মনের মধ্যে এক হইয়াছিল, তাহারা আজ সব বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাই পরস্পরকে দেখিয়া চিত্ত স্থির হইতে পারিতেছে না। বিরহে বিধুর, বাসনায় ব্যাকুল হইয়া পড়িতেছে। আবার হৃদয়ের মধ্যে এক হইবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু মাঝখানে বৃহৎ পৃথিবী।" অদ্বৈতবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাখ্যাও নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবেরা স্বীকার করিয়া লইতে পারেন না, কেননা জীবতত্ত্বের সঙ্গে ঈশ্বরতত্ত্ব ও শ্রীরাধার রূপে হ্লাদিনী শক্তির অচিন্ত্য ভেদাভেদই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের মূলকথা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব নহেন, বৈদান্তিক নহেন, কোন সাম্প্রদায়িক গণ্ডীই তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। তাঁহার ঐ বিরহবোধের ব্যাখ্যা বলরামদাস হয়তো মানিয়া লইতে পারিতেন না, কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্যের অনুরাগীরা পরম সম্পদ বলিয়া গণ্য করিবেন।

বলরাম দাসের আর একটি ছত্র রবীন্দ্রনাথের খুব ভাল লাগিত- "পাষাণ মিলাঞা যায় গায়ের বাতাস।" পদরত্নাবলীর ২৭ সংখ্যক পদে--"কিশোর বয়স বৈদগধি ঠাম" ইত্যাদি পদে--ইহা আছে। ছন্দ প্রবন্ধেও ঐ ছত্রটি তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন। ১৩৪৫ সালে রবীন্দ্রনাথ 'বাংলাভাষা পরিচয়ে' ঐটি এবং গোবিন্দ দাসের 'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি' উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে এই সব কথা ভাল লাগা বোঝাইতে বলা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"ঠিক যেন কী'র ভাষা অভিধানে বেঁধে দেওয়া নেই, তাই সাধারণ ভাষা দিয়েই কবিকে কৌশলে কাজ চালাতে হয়। তাকেই বলা যায় কবিত্ব। বস্তুত কবিত্ব এত বড়ো জায়গা পেয়েছে তার প্রধান কারণ, ভাষার শব্দ কেবল আপন সাদা অর্থ দিয়ে সব ভাব প্রকাশ করতে পারে না। তাই কবি

*রবীন্দ্রনাথের পদরত্নাবলী ও প্রাচীন বৈষ্ণব সংকলন গ্রন্থগুলি হইতে আমরা বিশুদ্ধ পাঠ দিলাম। রবীন্দ্র রচনাবলীর পঞ্চমখণ্ডে (পৃঃ ৫১০) পাঠ—"তেঁঞি বলরামের, পহু, চিত নহে স্থির।" এই পাঠ ভুল।

লাবণ্য শব্দের যথার্থ সংজ্ঞা ত্যাগ ক'রে বানিয়ে বললেন, যেন লাবণ্য একটা ঝরনা শরীর থেকে ঝরে পড়ে মাটিতে। কথার অর্থটাকে সম্পূর্ণ নষ্ট ক'রে দিয়ে এ হল ব্যাকুলতা; এতে বলার সঙ্গে সঙ্গেই বলা হচ্ছে 'বলতে পারছিনে।'.................. লাবণ্যকে কবি যে লাবণি বলেছেন সেও একটা অধীরতা। প্রচলিত শব্দকে অপ্রচলিতের চেহারা দিয়ে ভাষার আভিধানিক সীমানাকে অনির্দিষ্ট ভাবে বাড়িয়ে দেওয়া হল।"

এই ভাবে পদের ব্যাখ্যা করিবার ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথ 'বাংলাভাষা পরিচয়' লিখিবার চৌদ্দ বৎসর পূর্বে, ১৩৩১ সালের বৈশাখ সংখ্যা বঙ্গবাণীতে 'তথ্য ও সত্য' শীর্ষক প্রবন্ধেও দিয়াছেন। সেখানেও তিনি বলিয়াছেন—"কবিতা যে-ভাষা ব্যবহার করে সেই বিশেষ অর্থেই শব্দের তথ্যসীমা। এই সীমাকে ছাড়িয়ে শব্দের ভিতর দিয়েই তো সত্যের অসীমতাকে প্রকাশ করতে হবে। তাই কত ইশারা, কত কৌশল, কত ভঙ্গি। জ্ঞানদাসের একটি পদ মনে পড়ছে—

রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল।
যৌবনের বনে মন পথ হারাইল॥

তথ্যবাগীশ এই কবিতা শুনে কী বলবেন। ডুবেই যদি মরতে হয় তো জলের পাথার আছে; রূপের পাথার বলতে কী বোঝায়। আর, চোখ যদি ডুবেই যায় তবে রূপ দেখবে কী দিয়ে। আবার যৌবনের বন কোন্ দেশের বন। সেখানে পথ পায়ই বা কে আর হারায়ই বা কী উপায়ে। যাঁরা তথ্য খোঁজেন তাঁদের এই কথাটা বুঝতে হবে যে নির্দিষ্ট শব্দের নির্দিষ্ট অর্থ যে-তথ্যের দুর্গ ফেদে বসে আছে ছলে, বলে কৌশলে তারই মধ্যে ছিদ্র ক'রে নানা ফাঁকে নানা আড়ালে সত্যকে দেখতে হবে।" শব্দের ধ্বনি ও ব্যঞ্জনা ধরিবার এই কৌশলটি ধরাইয়া দিয়া রবীন্দ্রনাথ সাধারণভাবে কবিতা এবং বিশেষভাবে পদাবলী বুঝিবার উপায় করিয়া দিয়াছেন।

পদাবলীতে ব্যবহৃত শব্দগুলির প্রকৃত অর্থ কি তাহা বাহির করিবার আগ্রহ রবীন্দ্রনাথের কিশোর বয়স হইতেই ছিল। চৌদ্দ বছর বয়সের সময় বিদ্যাপতির পদাবলী পড়িতে পড়িতে তিনি টীকায় প্রদত্ত অর্থ মানিয়া লইতে পারেন নাই। তিনি ১৩৪৬ সালে ভানুসিংহের পদাবলীর সূচনায় লিখিয়াছেন—"এক শব্দ যতবার পেয়েছি তার সমুচ্চয় তৈরি করে যাচ্ছিলুম। একটি ভালো বাঁধান খাতা শব্দে ভরে উঠেছিল। তুলনা করে আমি অর্থ নির্ণয় করেছি।"

১২৯৮ সালের চৈত্র ও ১২৯৯ সালের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ ও চৈত্র সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ বহু পদ উদ্ধৃত করিয়া নিছনি ও পঁহু শব্দের অর্থ বাহির করিতে চেষ্টা করিতেছেন দেখিতে পাই। ১২৯৮ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় এক ব্যক্তি লিখিয়াছিলেন যে নিছনি শব্দের অর্থ অনিচ্ছা। এই অর্থ ভুল। সেই জন্য রবীন্দ্রনাথ ঐ শব্দের নানা প্রকার প্রয়োগ দেখাইয়া মানে করেন, (১) বালাই (শান্তিকর্ম) (২) উপহার (৩) আরতি করা (৪) সেবা করা (৫) মোছান (৬) পূজা, আরাধনা। নিছনি শব্দটি নির্মঞ্ছনের অপভাষা ধরিয়া তিনি বলেন "নির্মঞ্ছন শব্দের যতগুলি

অর্থ আছে নিছনি শব্দের তদতিরিক্ত অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা বিরল।" অভিধানে নির্মঞ্ছন শব্দের অর্থ লেখা আছে—"নীরাজন, আরতি, সেবা, মোছা।" রবীন্দ্রনাথ যে সব পদাংশ ধরেন নাই তাহার কয়েকটি লইয়া বিচার করিলে তাঁহার প্রদত্ত অর্থের যৌক্তিকতা বুঝা যাইবে। অনন্ত দাসের পদে আছে—

হাসির হিল্লোলে মোর পরাণ-পুতলী দোলে
দিতে চাই যৌবন নিছনি। (পদকল্পতরু ১২৫)

এখানে নিছনি শব্দ উপহার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

গোবিন্দ চক্রবর্তীর পদে---

রসে ঢর ঢর গোরা অঙ্গের মুজাঙ নিছনি

এখানে নিছনি অর্থে বালাই লইয়া মরি (অমঙ্গল দূরে করিবার জন্য শান্তি কর্ম করি)।

চন্ডীদাসের—

কনক বরণ কিয়ে দরপণ
নিছনি দিয়ে যে তার। (পদকল্পতরু ২০৬)

এখানেও অর্থ সেই মুখের বালাই লইয়া মরি। ঐ কবিরই "শ্যাম বঁধুর সনে পিরীতি করিয়া নিছি দিনু জাতি কুল" অর্থে জাতি কুল ডালি দিলাম বা উপহার দিলাম। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের পদকল্পতরুর পরিশিষ্টে বা হরিদাস বাবাজী মহাশয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে 'নিছনি' শব্দের এত বিভিন্ন অর্থ দেন নাই। সুতরাং এক্ষেত্রে দেখিতেছি তরুণ রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণবপদাবলীর প্রবীণ বিশেষজ্ঞগণ অপেক্ষা শব্দার্থ নিরূপণে অধিক কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। কিন্তু 'পঁহু' শব্দে তিনি যে প্রভু, পুনঃ এবং ভণে অর্থে ধরিয়াছেন তাহা স্বীকার করিয়া লওয়া যায় না। পহুঁ শব্দের একটি মাত্র অর্থ হইতেছে প্রভু। তিনি

রাধামোহন পহুঁ দুহুঁ অতি নিরুপম

অর্থে বলেন "এস্থলে পহুঁ-র ভণে অর্থ না হইলে আর কোন অর্থ পাওয়া যায় না।" একথা ঠিক নহে; ইহার মানে হইতেছে—রাধা এবং কৃষ্ণ দুইজনই রাধামোহনের প্রভু এবং উভয়েই অতিশয় নিরুপম। রবীন্দ্রনাথ ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তরে ১২৯৯ সালে লেখেন যে

অথির নয়ন, শরঘাতে বিষম জ্বর ছটফট জলজ শয়ান।
রাধামোহন পঁহু কহই অপরূপ নহ যাহে লাগায়ে পাঁচবাণ॥

"রাধামোহনের প্রভু বলিতেছেন "এরূপ অর্থ অসঙ্গত। কারণ কৃষ্ণের মুখে এরূপ উত্তর নিতান্ত রসভঙ্গজনক।" কিন্তু রাধামোহন সুকৌশলে নিজের নামটি বসাইবার জন্য কৃষ্ণের দ্বারা সাধারণ মন্তব্য হিসাবে বলাইতে পারেন যে বিরহিনী রাধা পদ্মের উপর শয়ন করিয়া ছটফট করিতেছেন তাহা অসম্ভব নহে, কেননা তাঁহার

মনে পঞ্চবাণ আঘাত করিয়াছে। আবার গোবিন্দ দাসের যুগলমিলনের পদে আছে--

গোবিন্দদাস পহু ধন্দ।
অরুণ নিয়ড়ে পুণ চন্দ॥

এখানেও 'পহু'র অর্থ ভণে করিতে যাইয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"গোবিন্দ দাসের প্রভুর ধাঁদা লাগিয়াছে একথা বলা যায় না, কারণ তিনিই বর্ণনার বিষয়।" কিন্তু পদটির বর্ণনার বিষয় একা কৃষ্ণ নহেন, রাধাকৃষ্ণের যুগল মিলন; সুতরাং তাহা দেখিয়া গোবিন্দ দাসের প্রভুর ধাঁধা লাগার কথা রাধাকৃষ্ণের একীভূত তনু চৈতন্যের ভক্তের পক্ষে বলা অসম্ভব নহে।

রবীন্দ্রনাথ 'তথ্য ও সত্য' প্রবন্ধে বিদ্যাপতির 'যব গোধূলি সময়ে বেলি, ধনি মন্দির বাহির ভেলি'র মানে করিয়াছেন "গোধূলিবেলায় পুজো শেষ করে বালিকা মন্দির থেকে বাহির হয়ে ঘরে ফেরে" মানে করিয়াছেন। কিন্তু মন্দির মানে এখানে ঘর, বাড়ী, temple নহে। তুলনা করুন গোবিন্দদাসের—

"মাধব তুয়া অভিসারক লাগি
দূতর পন্থ—গমন ধনি সাধয়ে
মন্দিরে যামিনি জাগি॥"

এজায়গায় মন্দির মানে নিজের বাড়ীতে, কেননা গভীর রাত্রে রাধা পিছলের মধ্যে পথ চলা অভ্যাস করিতেছে।

সাহিত্যিকদের মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলীর ছন্দ বৈচিত্র্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথমে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১২৯৯ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'সাধনায়' রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানদাসের "মন্দপবন, কুঞ্জভবন, কুসুমগন্ধ, মাধুরী" সম্বন্ধে লেখেন—"এই দুটি ছত্রে অক্ষরের গুরুলঘু নিরূপিত হওয়াতে এই সামান্য গুটিকয়েক কথার মধুর ভাবে সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া লয়। কিন্তু এই ভাব সমমাত্রক ছন্দে নিবিষ্ট হইলে অনেকটা নিষ্ফল হইয়া পড়ে।" ১৩২৪ সালে চৈত্র মাসে সবুজপত্রে 'ছন্দ নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ চন্ডীদাসের 'সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম সম্বন্ধে লেখেন-"শ্যামের নাম রাধা শুনেছে। ঘটনাটা শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু যে—একটা অদৃশ্য বেগ জন্মালো তার আর শেষ নাই। আসল ব্যাপারটাই হল তাই। সেই জন্যে কবি ছন্দের ঝংকারের মধ্যে এই কথাটাকে দুলিয়ে দিলেন। যতক্ষণ ছন্দ থাকবে ততক্ষণ এই দোলা আর থামবে না। 'সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।' কেবলই ঢেউ উঠিতে লাগল। ওই কটি কথা ছাপার অক্ষরে যদিও ভালোমানুষের মতো দাঁড়িয়ে থাকার ভাণ করে, কিন্তু ওদের অন্তরের স্পন্দন আর কোন দিনই শান্ত হবে না। ওরা অস্থির হয়েছে এবং অস্থির করাই ওদের কাজ।" সাধারণ পাঠকের গায়ে অবশ্য প্রত্যক্ষ ভাবে ঢেউ লাগে না, রবীন্দ্রনাথের গায়ে ঢেউ লাগিয়া যে জলতরঙ্গের সৃষ্টি হয় তাহাই আমাদের মতন পাঠকের গায়ে আসিয়া লাগে। রবীন্দ্রনাথ উক্ত প্রবন্ধে গোবিন্দ দাসের "শরদ চন্দ পবন মন্দ, বিপিন ভরল কুসুমগন্ধ," "চিকনকালা

গলায় মালা বাজন নূপুর পায়" এবং বলরামদাসের "পাষাণ মিলায়ে যায় গায়ের বাতাসে" ছত্র উদ্ধৃত করিয়া ছন্দবিচার করিয়াছেন। সুদীর্ঘ জীবনের শেষে ১৩৪৫ সালে বাংলা ভাষা-পরিচয় গ্রন্থেও রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিতার ছন্দের মাধুর্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

'পয়ার ছন্দের একেশ্বরত্ব ছাড়িয়ে গিয়ে বিচিত্র হয়েছে ছন্দ বৈষ্ণব পদাবলীতে। তার একটা কারণ, এগুলি একটানা গল্প নয়। এই পদগুলিতে বিচিত্র হৃদয়াবেগের সংঘাত লেগেছে। দোলায়িত হয়েছে সেই আবেগ তিনমাত্রার ছন্দে।"

বিদ্যাপতি মিথিলার কবি অথচ বাংলা সাহিত্যে তাঁহার পদাবলীতে স্থান দেওয়া হয় কেন তাহা লইয়া আজ পর্যন্ত বহু বিচার আলোচনা হইয়াছে। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের বিদ্যাপতির পদাবলী প্রকাশের পূর্বে বাংলাদেশের লোক পদকল্পতরু প্রভৃতি সংকলনগ্রন্থে ধৃত বিদ্যাপতি-নামাঙ্কিত পদাবলীকেই বিদ্যাপতির একমাত্র রচনা বলিয়া জানিত। রবীন্দ্রনাথ ঐ গ্রন্থ প্রকাশের দুই বৎসর পূর্বে ১৩১৪ সালে সাহিত্যসৃষ্টি প্রবন্ধে (সাহিত্য) এই সমস্যা সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন মিথিলা ও বাংলার বহু পণ্ডিতের বহু গবেষণা সত্ত্বেও তাহাই আজ পর্যন্ত শেষ কথা রহিয়া গিয়াছে—"মিথিলার বিদ্যাপতির গান কেমন করিয়া বাংলা পদাবলী হইয়া উঠিয়াছে তাহা দেখিলেই বুঝা যাইবে, স্বভাবের নিয়মে এক কেমন করিয়া আর হইয়া উঠিতেছে। বাংলার প্রচলিত বিদ্যাপতির পদাবলীকে বিদ্যাপতির বলা চলে না। মূল কবির প্রায় কিছুই তাহার অধিকাংশ পদেই নাই। ক্রমেই বাঙালি গায়ক ও বাঙালি শ্রোতার যোগে তাহার ভাষা, তাহার অর্থ, এমন কি তাহার রসেরও পরিবর্তন হইয়া সে এক নূতন জিনিস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গ্রিয়ার্সন মূলে বিদ্যাপতির যে-সকল পদ প্রকাশ করিয়াছেন, বাংলা পদাবলীতে তাহার দুটি—চারিটি ঠিকানা মেলে, বেশির ভাগই মিলাইতে পারা যায় না। অথচ নানা কাল ও নানা লোকের দ্বারা পরিবর্তন সত্ত্বেও পদগুলি এলোমেলো প্রলাপের মতো হইয়া যায় নাই। কারণ, একটা মূল সুর মাঝখানে থাকিয়া সমস্ত পরিবর্তনকে আপনার করিয়া লইবার জন্য সর্বদা সতর্ক হইয়া বসিয়া আছে। সেই সুরটুকুর জোরেই এই পদগুলিকে বিদ্যাপতির পদ বলিতেছি, আবার আগাগোড়া পরিবর্তনের জোরে এগুলিকে বাঙালির সাহিত্য বলিতে কুণ্ঠিত হইবার কারণ নাই।

চতুর্থ অধ্যায়

পদাবলীর সংকলয়িতা রবীন্দ্রনাথ

১২৯১ সালের ৮ই বৈশাখ তারিখে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ গভীর শোকসাগরে নিমগ্ন হন। এই শোক হইতে মুক্ত হইবার জন্যই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ পদাবলী-সাহিত্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া শ্রেষ্ঠ রত্নগুলি সংকলন করিতে প্রবৃত্ত হন। ১২৯২ সালের বৈশাখ মাসে তাঁহার বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সহযোগে তিনি পদরত্নাবলী প্রকাশ করেন। ভূমিকায় কেবলমাত্র শ্রীশচন্দ্রের স্বাক্ষর আছে। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে পদগুলি নির্বাচন করিবার ভার লইয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং ভূমিকায় বৈষ্ণব পদাবলীর ঐতিহাসিক পটভূমিকা ব্যাখ্যা করিবার দায়িত্ব লইয়াছিলেন শ্রীশচন্দ্র।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে যে সকল পদাবলী সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে পদকল্পতরু হইতেছে বৃহত্তম ও পদরত্নাবলী ক্ষুদ্রতম। পদকল্পতরুতে ৩১০১টি পদ আছে, আর পদরত্নাবলীতে মাত্র ১১০টি পদ সংকলিত হইয়াছে। এই ১১০টি পদের মধ্যে ৯৫টি পদ পদকল্পতরুতেও পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ পদকল্পতরু হইতে এগুলি লইয়াছিলেন কিনা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। সে সময়ে সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের সম্পাদনায় পদকল্পতরু বাহির হয় নাই। বটতলার ছাপা সংস্করণে অনেক ভুলত্রুটি ছিল। রবীন্দ্রনাথ পদকল্পতরু হইতে কিছু পদ লইলেও তিনি যে ছাপা বইয়ের উপরই নির্ভর করেন নাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় "বড়ই বিষম কালার প্রেম" ইত্যাদি পদরত্নাবলীর ৬৩ সংখ্যক পদ হইতে। ঐ পদটি পদামৃতসমুদ্রে ও পদকল্পতরুতে জ্ঞানদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলরামদাসের ভণিতায় উহা ধরিয়াছেন। উল্লিখিত প্রাচীন সংকলন গ্রন্থের পাঠের সহিত রবীন্দ্রনাথ-ধৃত পাঠের মাত্র ছয়টি চরণের মিল আছে। বাকী ছয় চরণ অনেকটা আলাদা। উভয় প্রকার পাঠ পর পর দিতেছি—

পদকল্পতরু

নিরবধি বুকে থুইয়া চাহে চোখে চোখে।
এ বড় বিষম শেল ফুটি আছে বুকে ॥
মনের সে দুখ মোর মনেতে রহিল।
ফুটিল শ্যামের শেল বাহির নহিল ॥
নিশ্চয় মরিব সখি তারে না দেখিয়া।
জ্ঞানদাস কহে শ্যাম মিলাব আনিয়া ॥

পদরত্নাবলীধৃত পাঠ

হাসিয়া পাঁজরকাটা কহিয়াছে কথা খানি।
সোঙরিতে চিতে উঠে আগুনের খনি॥
নিরবধি বুকে থুইয়া চাহিলে চক্ষে চক্ষে।
এবড় দারুণ শেল ফুটি রৈল বুকে॥
হিয়ায় করিয়া নয়নে ভরিয়া
কবে সে দেখিব মুখখানি।
হিয়ায় করিয়া নয়ান ভরিয়া
দারুণ শেল আগুনি॥

এই পদটি ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্য সম্পাদিত বলরামদাসের পদাবলীতে ধৃত হয় নাই। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এটি "কালার পিরিতি সই তোমারে যে বলি" ইত্যাদি (পৃঃ ২০২) পাঠান্তরসহ জ্ঞানদাসের পদাবলীতে ধরিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথধৃত পাঠ খুব সম্ভব প্রক্ষিপ্ত: কেননা পদটি পয়ারে লিখিত. শুধু ভণিতার অংশটি ত্রিপদীছন্দে রচিত। যাহা হউক ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে রবীন্দ্রনাথ মুদ্রিত পদকল্পতরুর উপর নির্ভর করিয়া পদনির্বাচন করেন নাই। তিনি হাতে লেখা পুঁথিও ব্যবহার করিয়াছিলেন।

পদরত্নাবলী সংকলনের সময়ে রবীন্দ্রনাথ ক্ষণদা গীতচিন্তামণির পুথি এবং পদামৃত সমুদ্রের ছাপা বই ব্যবহার করিয়াছিলেন। বহরমপুর হইতে রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয় ১২৮৫ সালে পদামৃত সমুদ্র প্রকাশ করেন, কিন্তু ক্ষণদা বিংশ-শতাব্দীর পূর্বে মুদ্রিত হয় নাই। পদরত্নাবলীর ৩৭ সংখ্যক পদটি কেবলমাত্র ক্ষণদায় আছে। অন্য কোন সংকলন গ্রন্থে নাই। ২৯ এবং ৩৩ সংখ্যক পদ দুইটি পদামৃত-সমুদ্র হইতে লওয়া। চণ্ডীদাসের রচিত ৪৮, ৫৫, ৫৯ সংখ্যক পদ তিনটি কোন প্রাচীন সংকলন গ্রন্থে ধৃত হয় নাই। ঐ তিনটি পদ রবীন্দ্রনাথ হয় কোন পুথি হইতে লইয়াছেন, নয়তো "প্রাচীন কাব্যসংগ্রহে" পাইয়াছেন। পদকল্পলতিকায় পদরত্নাবলীধৃত ৫, ৯, ৩১, ৩২, ৭৭, ৭৮, ৭৯ সংখ্যক পদ পাওয়া যায়— অন্য কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত পদকল্পলতিকা ব্যবহার করিয়াছিলেন। ঐ পদগুলি ছাড়া পদরত্নাবলীর ৬. ৭, ২০, ২১, ৪৮, ৫১, ৫৬, ৭২ এবং ১০১ সংখ্যক পদও পদকল্পলতিকায় আছে। কিন্তু এইসব গ্রন্থ ছাড়াও তিনি প্রাচীন পুথি নিশ্চয়ই সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কেননা পদরত্নাবলীতে রায় বসন্ত কৃত ৯৮ সংখ্যক পদটি এবং অজ্ঞাতনামা কবির ১০২ সংখ্যক পদটি আমরা কোন মুদ্রিত বা অমুদ্রিত গ্রন্থে দেখি নাই। রায় বসন্তের পদসংগ্রহের কোন পুথি তাঁহার হাতে পড়িয়াছিল কি?

পুথি ও ছাপা বই ছাড়া রবীন্দ্রনাথ লোকমুখেও কিছু পদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ৭৪ সংখ্যক পদ "আইস আইস বন্ধু, আধ আঁচরে আসি বৈস" ইত্যাদির পদটীকায় তিনি লিখিয়াছেন—"আমরা নবদ্বীপের কোন বৈষ্ণব গায়কের মুখে এই গানটির

নিম্নলিখিতরূপ অসম্পূর্ণ পাঠান্তর পাইয়াছি।" ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে কবিগুরু পদাবলী সংগ্রহের জন্য এতদূর উদ্যমশীল ছিলেন যে কোন গায়কের মুখে কোন পদ শুনিলে তাহার সহিত ছাপা বইয়ের পাঠ মিলাইয়া দেখিতেন।

পদরত্নাবলীই মহাজনপদাবলীর সর্বপ্রথম সংকলন যাহা বৈষ্ণবধর্মের সাধনভজনের অংগ হিসাবে লিখিত হয় নাই। বিশুদ্ধ সাহিত্যিক রস পরিবেশন করাই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য। অন্যান্য মুদ্রিত ও অমুদ্রিত সকল সংকলনই আরম্ভ করা হইয়াছে গৌরচন্দ্রের মহিমা বর্ণনা করিয়া ও কৃপা প্রার্থনা করিয়া। গৌরাংগলীলাকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ পদাবলীর আধ্যাত্মিক রহস্যের চাবিকাঠি বলিয়া মনে করেন। শ্রীগৌরাংগের মনে কখনও গোষ্ঠের ভাব, কখনও মানের ভাব, কখনও আক্ষেপ, কখনও বিরহবোধ জাগিত। আর তাহা দেখিয়া তাঁহার প্রিয় সহচর, কবি ও গায়ক বাসুদেব ঘোষ পদ রচনা করিতেন। কীর্তনের বিষয় অনুসারে বাসুঘোষের এক একটি পদ গাহিয়া পালা আরম্ভ করার রীতি ছিল। দীনবন্ধু দাস সংকীর্তনামৃতে লিখিয়াছেন—

বাসুঘোষ ঠাকুরের বিচিত্র বর্ণন।
শুনিতে যুড়ায় শ্রোতার কর্ণ মন॥
গোরাংগের জন্ম আদি যত যত লীলা।
বিস্তারি অশীতি পদে সকল বর্ণিলা॥
কীর্তনের আরম্ভে রসের অনুসারে।
গৌরচন্দ্র সেই পদ গাও সমাদরে॥
যত যত রাধাকৃষ্ণ--লীলা পদে পদে।
তত গৌরচন্দ্র পদ লাগে পরিচ্ছেদে॥

রবীন্দ্রনাথ কীর্তন গানের জন্য অথবা রাধাকৃষ্ণের লীলারস আস্বাদনের জন্য পদ-সংকলন করেন নাই বলিয়া গ্রন্থের প্রথমে গৌরচন্দ্রিকা দেন নাই। তিনি বাসুঘোষের একটি পদও স্বীয় সংকলনে স্থান দেন নাই। বাসুঘোষের পদ শ্রীগৌরাংগের ভক্তদের খুব প্রিয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন যে বাসুঘোষের পদে কাষ্ঠ এবং পাষাণও দ্রবীভূত হয়। কিন্তু যাঁহারা শ্রীগৌরাংগের চরণাশ্রিত নহেন, তাঁহারা বোধ হয় বাসুঘোষের তথ্যমূলক বর্ণনাকে সাহিত্যিক রচনা হিসাবে খুব উচ্চস্থান দিতে রাজী নহেন। রবীন্দ্রনাথ শ্রীচৈতন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে বাংলাদেশে যে প্রেমের প্লাবণ আসিয়াছিল তাহা তিনি বহুস্থানে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি গ্রন্থের প্রথমে গৌরচন্দ্রিকা না দিলেও, শেষের দিকে শ্রীগৌরাংগ সম্বন্ধে পাঁচটি পদ (৭৯ হইতে ৮৩) দিয়াছেন। তাহার মধ্যে একটির রচয়িতার নাম অজ্ঞাত; অন্য চারিটির কবি হইতেছেন যথাক্রমে নরহরি, অনন্তদাস, বলরাম দাস, ও লোচন। নরহরির পদটি (৭৯) বিশেষ প্রামাণিক বলিয়া মনে হয় না। পদটি কবিত্ব অংশেও প্রথমশ্রেণীর নহে। বোধ হয় পদটিকে রবীন্দ্রনাথ নরহরি সরকারের রচনা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন এবং ইহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব দেখিয়া নির্বাচন করিয়াছেন। বাসুঘোষের রচিত অনুরূপ ভাবের পদ থাকিতেও

রবীন্দ্রনাথ তাহা গ্রহণ করেন নাই। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে নরহরি সরকারের লেখা শ্রীচৈতন্যবিষয়ক অনেকগুলি কবিত্বপূর্ণ পদ পদকল্পতরুতে আছে; কিন্তু উল্লিখিত পদটি ছাড়া নরহরির রচনার অন্য কোন নিদর্শন পদরত্নাবলীতে নাই। অনন্ত ও বলরামের পদ দুইটিতে শ্রীচৈতন্যের প্রেমোন্মত্ত ভাবের বর্ণনা আছে। লোচনের ও অজ্ঞাতনামা কবির পদ দুইটিতে শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিয়া নদীয়ার নাগরীদের অনুরাগের চিত্র।

প্রাচীন পদসংকলনের মধ্যে অধিকাংশক্ষেত্রেই শ্রীরাধার পূর্বরাগ বা বয়ঃসন্ধি দিয়া গ্রন্থের আরম্ভ করা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা ও গোষ্ঠের পদ দিয়া পদরত্নাবলী সুরু করিয়াছেন। প্রথমেই তিনি যদুনন্দন দাসের রচিত পৌর্ণমাসীদেবীর নবজাত শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করার সুন্দর পদটি ধরিয়াছেন। তারপর শিশুকৃষ্ণের প্রতি—যশোদার বাৎসল্যভাবের চারিটি পদ (২-৫) দেওয়া হইয়াছে। অষ্টম ও ষোড়শ পদেও বাৎসল্যরসের বর্ণনা। শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা অবলম্বনে এগারটি পদ (৬, ৭, ৯, ১০-১৮) ইহার পর সংকলিত হইয়াছে। এইগুলির মধ্যে ৬, ৭, ৯, ১০ সংখ্যক পদে বাৎসল্য রসের প্রাধান্য; অন্য পদগুলিতে সখ্য রসের। ১১০টি পদের মধ্যে ১৭টিতে অর্থাৎ শতকরা ১৫ ভাগের চেয়ে বেশী—সখ্য ও বাৎসল্যরসের বর্ণনা দিয়া রবীন্দ্রনাথ নিজের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছেন। বাংলার বৈষ্ণবগণ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চ রসের উপাসনার কথা বলিলেও শ্রীরূপ, নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি মধুর রসের উপাসনা প্রণালী অনুসারে ভজন করিতেন বলিয়া সকল প্রাচীন সংকলন গ্রন্থেই প্রেমের পদের বাহুল্য। রবীন্দ্রনাথ বলরাম দাসের গোষ্ঠের পাঁচটি পদ উদ্ধৃত করিয়া সখ্যরসের অপরূপ চিত্র পাঠকদের সামনে ধরিয়াছেন। তিনি জহুরীর মতন যাদবেন্দ্র ও বিপ্রদাস ঘোষের বাৎসল্যরসের দুইটি পদও যোগ করিয়াছেন।

শ্রীরূপ গোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণিতে শৃঙ্গাররসের যেরূপ সূক্ষ্ম বিভাগ করিয়াছেন তাহার অনুসরণ করিয়াই পদামৃতসমুদ্র, সংকীর্তনামৃত, পদকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে পদ সন্নিবেশ করা হইয়াছে। বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ এই দুই প্রধান ভেদ শৃঙ্গাররসের। বিপ্রলম্ভের চারিটি ভাগ—পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য এবং প্রবাস। সম্ভোগও চারি প্রকার—পূর্বরাগে সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ, মানেতে সংকীর্ণ সম্ভোগ, প্রেমবৈচিত্ত্যে (দয়িত নিকটে থাকিলেও বিরহভয়ে যে আর্তি) সম্পন্ন সম্ভোগ এবং প্রবাসের পর সমৃদ্ধিমানসম্ভোগ। পূর্বরাগ হয় সাক্ষাৎ দর্শন হইতে অথবা চিত্রে দয়িতের রূপ দেখিয়া কিম্বা স্বপ্ন দেখিয়া। না দেখিয়া শুধু শুনিয়াও পূর্বরাগের উদয় হয়। সেই শোনা আবার পাঁচ রকমের হইতে পারে—দূতীর মুখে, সখীর মুখে, ভাটের মুখে, কোন গায়কের বর্ণনা হইতে অথবা বংশী-ধ্বনি শুনিয়া।

রবীন্দ্রনাথ আলঙ্কারিকের এই বাঁধা পথ ধরিয়া পদ নির্বাচন করিতে বসেন

নাই। যেরূপ অল্প কয়েকটি পদের মধ্যে তিনি পদাবলীসাহিত্যের রত্নগুলির সঙ্গে কাব্যরসপিপাসুদের পরিচয় করাইয়া দিতে চাহিয়াছেন তাতে এই আলঙ্কারিক রীতি অনুসরণ করাও চলে না। তিনি পূর্বরাগের প্রথমে বংশীবদনের একটি পদ (১৯) দিয়া দেখাইতেছেন যে কৃষ্ণ তাঁহার সখাদের সঙ্গে যমুনাপুলিনে খেলা করিতেছেন, রৌদ্রে তাঁহার মুখখানি ঘামিয়া উঠিয়াছে আর রাধা তাঁহার ঠানদিদিকে (বড়িমাইকে) বলিতেছেন যে যদি লোক লজ্জার ভয় না থাকিত তাহা হইলে আমার সাড়ীর অঞ্চল ধরিয়া কানাইয়ের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করিতাম। করুণা হইতে অনেক সময় প্রেমের উৎপত্তি হয় তাহা জানিয়াই রবীন্দ্রনাথ গোষ্ঠের পরই এই পদটি সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। [গোষ্ঠের পদে (১৮) শ্রীকৃষ্ণের সখারা দেখিলেন যে বোধ "প্রখর রবির তাপে শুখাইল মুখ"; তাই তাঁহারা তাড়াতাড়ি বলিতেছেন ঘোষ হইয়া

মলিন হইল কানাই মুখানি তোমার।
দেখিয়া বিদরে হিয়া আমা সভাকার॥

এই সহানুভূতি হইতেছে সখ্যরসের মূল। বলরামদাসের ঐ পদ উদ্ধৃত করিব পর পরই রবীন্দ্রনাথ বংশীবদনের পদ (১৯) তুলিয়া বোধ হয় দেখাইতে চাহিয়াছে যে কানাইয়ের মাথায় রোদ লাগিতেছে বলিয়া রাধার মনে যে দুঃখ জাগিয়াছে তাহ হইতে প্রেমের উৎপত্তি হইল। একই ঘটনা সখাদের মনে ও নায়িকার মনের উপর বিভিন্ন রকমের প্রভাব বিস্তার করে।]

রবীন্দ্রনাথ ঐ পদের পরই রাধার বয়ঃসন্ধির একটি পদ (২০) ধরিয়া বলিতে চাহেন যে রাধা যখন কৃষ্ণের জন্য ঐরূপ সহানুভূতি বোধ করিতেছেন তখন "বালা শৈশব তারুণ ভেট"। তাহার দেহে তখন শৈশব ও তারুণ্য উভয়ের যেন সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছে; তাই সে লজ্জাসরমের বালাই না রাখিয়া বড়িমাইকে মনের ভাব খুলিয়া বলিল। কিন্তু একটু তারুণ্য জাগিয়াছে বলিয়া লোকলজ্জার ভয়ে কৃষ্ণের মাথার উপর আঁচল বিছাইয়া ছায়া করিতে পারিতেছে না। রবীন্দ্রনাথ এমন কৌশলের সঙ্গে পদগুলি সাজাইয়াছেন যে পাঠকদেরও তিনি কবি করিয়া তুলিতেছেন। বয়ঃসন্ধির পদটির পরেই তিনি চন্ডীদাসের অনুরাগে যোগিনী রাধার বর্ণনাটি দিয়াছেন—ইহার মাঝখানে আর কোন চিত্রে দর্শন বা স্বপ্নে দর্শন অথবা দূতীমুখে বা ভাটমুখে শ্রবণ ইত্যাদি কিছুই নাই। রাধা যে কৃষ্ণের রূপ দেখিয়া মজিয়াছেন, তাহা কাহারও কাছে বলিতে পারেন না, অথচ না বলিলেও নয়—এই ভাবটি গোবিন্দদাসের 'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি' পদ (২২) উদ্ধৃত করিয়া রবীন্দ্রনাথ দেখাইলেন। ঐ একটি পদেই রাধার পূর্বরাগের সবখানি বলা হইয়া গেল। ঐ পদে রাধা বলিতেছেন—

না জানি কি ব্যাধি মরমে বাঁধল
না কহি লোকের লাজে।

২৩ এবং ২৪ পদে শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ দেখাইয়া রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানদাসের একটি পদ

(২৫) সন্নিবেশ করিয়া বলিতেছেন যে রাধা স্পষ্ট করিয়া কাহাকেও তাহার প্রেমের কথা বলিতে পারেন না, তাই তাহার "পরাণের সই" কে এক অপরূপ স্বপ্নের কথা বলিতেছেন যে শ্রাবণ মাসের ঘন মেঘ গরজনের মধ্যে রিমিঝিমি বৃষ্টি পড়িতেছে এমন সময়ে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যে কে যেন এক শ্যামল বর্ণের তরুণ—

মরমে পৈঠল সেহ হৃদয়ে লাগল দেহ
শ্রবণে ভরল সেই বাণী।"

সখী কিন্তু ইহা শুনিয়া রাধাকে বলিলেন—দেখ ভাই যাহার তাহার সঙ্গে যেন প্রেমে পড়িয়া জীবনটা নষ্ট করিও না। এই ভাব লইয়াই রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতির—

"এ ধনি কমলিনি শুন হিত বাণী
প্রেম করবি অব সুপুরুষ জানি॥"

অংটি উহার পরেই বসাইয়াছেন। রাধা যেন এ কথা গ্রাহ্য করিলেন না। ভালমন্দ এগার করিবার ক্ষমতা আর তাঁহার নাই—কেননা কৃষ্ণের

৬. "অরুণ অধর মৃদু মন্দ মন্দ হাসে।
৯' চঞ্চল নয়ন-কোণে জাতিকুল নাশে॥" (২৭)

বলরামদাসের এই পদ দিয়া তাহা বলিয়াও যেন রাধার সাধ মিটিল না, তিনি আবার গোবিন্দদাসের পদে (২৮) বলিতেছেন—

সই কিবা সেই নয়ান-চাহনি
আঁখির হিলোলে মোর পরাণ-পুতুলী দোলে
দিতে চাহি যৌবন নিছনি॥"

এমন পাগলিনীকে কে বাধা দিতে পারে? বাধা দিলেও তাহা মানিবার সাধ্য রাধার নাই, কেননা ফের বলরামদাসের পদে (২৯) তিনি বলিতেছেন যে তাঁহার মন আর তাঁহার নিজের আয়ত্তে নাই—কে যেন তাঁহাকে যাদু করিয়াছে—

কি খনে দেখিলুঁ তারে না জানি কি কৈল মোরে
আট প্রহর প্রাণ ঝুরে।

এমনটি হইবেই বা না কেন? কানাই যে প্রেম আকর্ষণ করিবার অদ্ভুত কৌশল জানেন। পরবর্তী পদে (৩০) জ্ঞানদাসের রাধা বলিতেছেন যে মাধব

"ছায়ার সহিতে ছায়া মিশাইতে
পথের নিকটে রয়।"

সঙ্কোচে লোকলজ্জায় অথবা রাধারই ভয়ে তিনি কাছে আসিয়া প্রেম নিবেদন করিতে পারেন না, তাই দূরে দূরে থাকেন—বেশী দূরে কিন্তু নহে—রাধা যখন পথে চলেন তখন তাঁহার দেহের ছায়ার উপর যাইয়া তাঁহার নিজের ছায়াটি পড়ে এমন দূরে।

বংশীদাসের রাধা (৩১) যেন রাধার মনের উপর এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিতেছেন—

মিশামিশি হইল রূপে ডুবিলাম রসের কূপে

এমন করিয়া গোপনে গোপনে দেখিয়া, ছায়ায় ছায়া মিশাইয়া রাধা আর স্থির থাকিতে পারিতেছেন না—তাই একবার প্রকাশ্যে তাঁহাকে দেখিবেন। তিনি শুনিয়াছেন কৃষ্ণ মথুরায় যাইবার পথে থাকেন। যদুনাথদাসের একটি পদে (৩২) দেখি রাধা সখীদিগকে বলিতেছেন—"অলখে লখিব কানুরে না দিব পরিচয়"। সখীরা যেন তাঁহাকে গোপন করিয়াই রাখেন,—কেননা

যদি বা নাগর দিঠে দিঠি পড়ে মোর।
রাখিতে নারিব তনু হইব বিভোর॥
তোমরা যতেক সখী মোরে রাখিহ গোপতে।
রাধা বলি কানু যেন না পারে লখিতে॥

অনন্ত দাসের পদে (৩৩) রাধা কৃষ্ণকে দেখিলেন বটে, কিন্তু দেখিয়া তাঁহার তৃপ্তি হইল না, কেননা বিধাতা তাঁহাকে "প্রতি অঙ্গে লাখ নয়ান" দেন নাই। শ্রীনিবাস আচার্যের ভাষায় শ্রীরাধা বলেন (৩৪ পদ)

যৌবন-বনের পাখী পিয়াসে মরয়ে গো
উহারি পরশ-রস মাগে।

ঐ ভাবই আবার বলরামদাসের ভাষায় ৩৫ সংখ্যক পদে প্রকটিত হইয়াছে—

হিয়ার ভিতরে লোটায়্যা লোটায়্যা
কাতরে পরাণ কান্দে॥

ইহার পর রাধা শ্রীকৃষ্ণের মুরলীধ্বনি শুনিতে পান। তাহাতে আর তাঁহার ঘরে থাকা সম্ভব হইল না এই ভাবটি কোন অজ্ঞাতনামা কবির পরবর্তী পদে (৩৬) দেখা যায়—

যখন তরুতলে বাঁশীটি বাজে।
পরাণ যেমন করে না কহি লাজে॥
নয়ান-কোণে তার আছে কি ধন।
যার লাগি জাতিকুল করিলুঁ পণ॥

রবীন্দ্রনাথের পদরত্নাবলীতে ১৯ হইতে ৩৬ পর্যন্ত ১৮টি পদ সন্নিবেশের কৌশল এমন যে রাধাকৃষ্ণের বিশেষ করিয়া রাধার পূর্বরাগের সম্পূর্ণ চিত্রটি ছায়াচিত্রের মতন আমাদের মানসনয়নের সামনে প্রতিভাত হয়। পূর্বেই বলিয়াছি প্রাচীন সংকলনকর্তাদের পদসন্নিবেশের আলংকারিক রীতি রবীন্দ্রনাথ মানেন নাই। পদগুলির আকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যাইবে যে এই পর্যায় বাঁধা রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়; তিনি কাহারও নিকট ইহার জন্য ঋণী নহেন। এই আঠারোটি পদের মধ্যে ১৪টি পদকল্পতরুতে আছে বটে, কিন্তু তাহার সন্নিবেশ প্রণালী শেষ

তিনটি পদ ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।* রবীন্দ্রনাথ সত্যই অপরূপ সুন্দর রত্নরাজীর হার গাঁথিয়াছেন। ছোট গল্পের মধ্যে অতুলনীয় রসসৃষ্টির কৌশলে কি তিনি রাধাকৃষ্ণের চিরন্তন কাহিনীর পদগুলি সাজাইবার পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়া আয়ত্ত করিতেছিলেন?

পদরত্নাবলীতে পদসন্নিবেশের রীতি মৌলিক ও রসের পরিপোষক বটে, কিন্তু দুই একটি স্থলে লীলার পৌর্বাপর্য রক্ষিত হয় নাই। ৫৪ সংখ্যক পদে দীন চণ্ডীদাস শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে রাসে গোপীদের অভিসার বর্ণনা করা হইয়াছে। তারপর অনেকগুলি পদের পর আবার ৯৪ ও ৯৫ সংখ্যক পদে রাসনৃত্যের বর্ণনা

বিপিনে ভরল কুসুম-গন্ধ

ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ পদ দেওয়া হইয়াছে। এই পদগুলির পূর্বে আবার ৪৬ সংখ্যক পদে জগন্নাথদাসের রাসের পর রাধাকৃষ্ণের আলসের বর্ণনা—

রাস-জাগরণে নিকুঞ্জভবনে
আলুয়্যা আলস-ভরে
শুতলি কিশোরী আপনা পাসরি
পরাণনাথের কোরে॥

রাধা সবকিছু এমনিই ভুলিয়াছেন যে

নিন্দ যায় ধনী ও চাঁদ-বদনী
শ্যাম-অঙ্গে দিয়া পা।

৫৪-র পর ১০১, ৯৫ এবং ৯৪ দিয়া তাহার পর রসালসের এই পদটি দিলে রাস-লীলার ভাব ও ঘটনার ক্রমবিকাশ বুঝিবার সুবিধা হইত।

অভিসারের পদ সন্নিবেশেও এইরূপ ক্রম-বিপর্যয় ঘটিয়াছে। ৫৬ সংখ্যক পদে গোবিন্দদাস সখীর মুখ দিয়া রাধাকে বলাইয়াছেন—

মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট॥

এইরূপ দুর্যোগের মধ্যে অভিসারে বাহির হইলে ভীষণ বিপদ ঘটিবে—

ইয়ে যব সুন্দরি তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখাব দেহ॥

ইহার উত্তরে ঐ গোবিন্দদাসেরই রাধা বলিতেছেন যে কুলমর্যাদারূপ কপাট যখন খুলিয়া ফেলিয়াছি তখন আর বাড়ীর দরজায় কাঠের কপাট কি বাধা সৃষ্টি করিবে?

কুল-মরিযাদ কপাট উদঘাটলুঁ
তাহে কি কাঠ কি বাধা। ইত্যাদি

* পদকল্পতরু ১৩৫০, ৮৩, ৩০, ১৫২, ২০৩, ২১০, ১৪৪, ১০৯, ১৪৬, ২৬৯, ৬৯১, ৭১০, ৭৯১, ৭৯২

যথাক্রমে পদরত্নাবলীর ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ৩০, ৩৪, ৩৫, ৩৬

এই পদটি খাপছাড়া ভাবে ৪৩ সংখ্যক পদরূপে না দিয়া ৫৬ সংখ্যার অব্যবহিত পরে দিলে সখীর আপত্তি ও রাধার উত্তর পরপর থাকিত।

রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপানুরাগের দুইটি মাত্র পদ ধরিয়াছেন (৪৯ এবং ৬৪)। দুইটিই রাধার নিজের প্রতি আক্ষেপ। রসশাস্ত্রের ব্যবস্থা অনুসারে বড় বড় পদ সংকলনে কৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ, মুরলীর প্রতি আক্ষেপ, সখীর প্রতি আক্ষেপ ও দূতীর প্রতি আক্ষেপ লইয়া বহু পদ ধৃত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই ধরণের আক্ষেপের কোন পদ ধরেন নাই।

অলঙ্কারশাস্ত্রে নায়িকার অষ্ট অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে—অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিত, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা, স্বাধীনভর্তৃকা অর্থাৎ ভর্তা যে নায়িকার অধীন হইয়াছে। পদরত্নাবলীতে বাসকসজ্জার মাত্র একটি পদ (৫৭) আছে। উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা (সংকেত করিয়া দয়িতের না আসায় ব্যথিতা নায়িকা), খণ্ডিতা ও কলহান্তরিতার পদও রবীন্দ্রনাথ ধরেন নাই। শ্রীকৃষ্ণের বহুবল্লভত্ব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র পছন্দ করিতে পারেন নাই। খণ্ডিতা সম্বন্ধে তিনি ১৩০২ সালে কবিসংগীত প্রবন্ধে লেখেন—"বৈষ্ণব কাব্যে প্রেমের নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে রাধার খণ্ডিতা অবস্থার বর্ণনা আছে। আধ্যাত্মিক অর্থে ইহার কোনো কোনো বিশেষ গৌরব থাকিতে পারে কিন্তু সাহিত্য হিসাবে শ্রীকৃষ্ণের এই কামুক ছলনার দ্বারা কৃষ্ণ রাধার প্রেমকাব্যের সৌন্দর্যও খণ্ডিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। রাধিকার এই অবমাননায় কাব্যশ্রী অবমানিত হইয়াছে।" দানলীলা ও নৌকাখণ্ডকে বোধ হয় তিনি যথেষ্ট শ্লীল বলিয়া মনে করিতেন না, তাই ঐ দুই লীলার কোন পদও পদরত্নাবলীতে স্থান পায় নাই।

পদরত্নাবলীতে অলঙ্কারের ভারে প্রপীড়িত কোন পদ ধরা হয় না। বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের ১১টি করিয়া পদ সংকলিত হইলেও উৎকট উপমা বা অনুপ্রাসযুক্ত পদ অথবা হেঁয়ালির পদ একটিও রবীন্দ্রনাথ ধরেন নাই। প্রাচীন সংকলন গ্রন্থসমূহে গোবিন্দদাসেরই প্রাধান্য; রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সব চেয়ে বেশী পদ লইয়াছেন বলরামদাস হইতে। এই কবির নামাঙ্কিত যে ১৭টি পদ পদরত্নাবলীতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ৪১, ৫৩ ও ৮১ সংখ্যক পদ ছাড়া আর সব কয়টিই শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক দ্বিজ বলরামদাসের রচনা। ব্যতিরেকের তিনটি পদে গোবিন্দদাস কবিরাজের রচনাশৈলীর প্রভাব দেখা যায়: সুতরাং ঐ কয়টি পদ 'কবিনৃপবংশজ' অর্থাৎ কবি-রাজ গোবিন্দ দাসের বংশোদ্ভূত (পদকল্পতরুতে বৈষ্ণবদাসের উক্তি) বলরামের লেখা হওয়া সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত ১৪টি পদ ধরিয়াছেন। তন্মধ্যে ৫৪ সংখ্যক পদটি দীন চণ্ডীদাসের পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে এবং ওটি যে তাঁহারই রচনা তাহা আধুনিক সকল গবেষকই মানিয়া লইয়াছেন। ২৪ সংখ্যক পদটি কোথায়ও জগন্নাথদাসের কোথাও বা লোচনের ভণিতায় পাওয়া যায়, সুতরাং ওটিও প্রাক্-চৈতন্য চণ্ডীদাসের রচনা নহে। বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের ন্যায় জ্ঞানদাসেরও ১১টি পদ রবীন্দ্রনাথ সংকলনে স্থান দিয়াছেন। রায় শেখর ও রায়

বসন্তের ছয় ছয়টি করিয়া, অনন্তের চারটি, নরোত্তম ও বংশীবদনের তিন তিনটি, লোচন, যদুনাথ ও প্রেমদাসের দুই দুইটি করিয়া পদ রবীন্দ্রনাথ ধরিয়াছেন। উদ্ধব, কবিবল্লভ, জগন্নাথদাস, নরহরি, নরসিংহ, বিপ্রদাস, বৃন্দাবনদাস, মাধবদাস, যদুনন্দন, যাদবেন্দ্র ও শ্রীনিবাসআচার্যের প্রত্যেকের একটি করিয়া পদ পদরত্নাবলীতে গৃহীত হইয়াছে। জনপ্রিয় বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে বসু রামানন্দ, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, বাসু ঘোষ, ঘনশ্যাম, হরিবল্লভ বা বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, রাধামোহন ঠাকুর, চন্দ্রশেখর ও শশিশেখরের কোন পদ রবীন্দ্রনাথ ধরেন নাই।

রবীন্দ্রনাথ "বাংলা কাব্যপরিচয়" নামক সংকলনগ্রন্থে বৈষ্ণব পদকর্তাদের মধ্যে বলরামদাস ও জ্ঞানদাসের দুইটি করিয়া এবং বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দ দাস যাদবেন্দ্র দাস, রসময় দাস, রায় শেখর, উদ্ধব দাস ও মাধব দাসের এক একটি মাত্র পদ গ্রহণ করিয়াছেন। রসময় দাসের কোন পদ পদরত্নাবলীতে লওয়া হয় নাই। বিদ্যাপতির "কি কহব রে সখি আনন্দ ওর" জ্ঞানদাসের "সাজ সাজ বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া," গোবিন্দ দাসের "গুরুজনে জাগল ভৈগেল বিহান" এবং উদ্ধব দাসের "একদিন মথুরা হইতে" ইত্যাদি পদও পদরত্নাবলীতে নাই। "বাংলা কাব্য পরিচয়ে" ধৃত ১২টি বৈষ্ণব পদের মধ্যে অন্য সাতটি পদরত্নাবলীতে আছে। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ বাংলা কাব্যের পরিচয় দিতে যাইয়া রায় বসন্তের, এবং অনন্ত, নরোত্তম, বংশীবদন, যদুনাথ, লোচন প্রভৃতি কবির একটি পদও ধরেন নাই।

রবীন্দ্রনাথ নানাস্থানে বারংবার বলিয়াছেন যে—"পদাবলী শুধু কেবল সাহিত্য নয় তার রসের বিশিষ্টতা বিশেষ ভাবের সীমানার দ্বারা বেষ্টিত। সেই সীমানার মধ্যে আমার মন স্বাভাবিক স্বাধীনতার সঙ্গে বিচরণ করতে পারে না।" (১৩৪৬ সালে লিখিত ভানুসিংহের পদাবলীর সূচনা)। বৈষ্ণব সাধনার সঙ্গে তাঁহার বিরোধ কোন্‌খানে তাহা তিনি ১২৯৯ সালে লিখিত "বৈষ্ণব কবিতা" (সোনার তরী) তে বলিয়াছেন—

শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান?
পূর্বরাগ, অনুরাগ, মান-অভিমান,
অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহমিলন,
বৃন্দাবন-গাথা,—এই প্রণয়-স্বপন
শ্রাবণের শর্বরীতে কালিন্দীর কূলে
চারিচক্ষে চেয়ে দেখা কদম্বের মূলে
সরমে সম্ভ্রমে—এ কি শুধু দেবতার?
এ সংগীত রসধারা নহে মিটাবার
দীন মর্তবাসী এই নরনারীদের
প্রতি রজনীর আর প্রতি দিবসের
তপ্ত প্রেম-তৃষা?

বৈষ্ণব পদাবলী পড়িয়া বা শুনাইয়া যুবক-যুবতী প্রেম করে, "ওই গানে যদি বা সে পায় নিজভাষা," রবীন্দ্রনাথের মতে তাহা স্বাভাবিক; কিন্তু এরূপ করিলে যে দস্যুতা করা হয় সে সম্বন্ধেও তিনি সচেতন—

বৈষ্ণব কবির গাঁথা প্রেম-উপহার
চলিয়াছে নিশিদিন কত ভারে ভার
বৈকুণ্ঠের পথে। মধ্যপথে নরনারী
অক্ষয় সে সুধারাশি করি কাড়াকাড়ি
লইতেছে আপনার প্রিয় গৃহ ভরে
যথাসাধ্য যে যাহার; যুগ যুগান্তরে
চিরদিন পৃথিবীতে যুবক যুবতী
নরনারী এমনি চঞ্চল মতিগতি।
দুই পক্ষ মিলে একেবারে আত্মহারা
অবোধ অজ্ঞান। সৌন্দর্যের দস্যু তারা
লুটেপুটে নিতে চায় সব।

এই অবোধ নরনারীর পক্ষ সমর্থন করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলেন যে বৈষ্ণবপদাবলীর অপরূপ মাধুর্যই তাহাদিগকে মর্ত্য জগতের ভালবাসার লোককে এই সাধনার ধন সমর্পণ করিতে প্রলুব্ধ করিয়াছে—

এই গীতি,
এতছন্দ, এতভাবে উচ্ছ্বসিত প্রীতি,
এত মধুরতা দ্বারের সম্মুখ দিয়া
বহে যায়—তাই তারা পড়েছে আসিয়া
সবে মিলি কলরবে সেই সুধাস্রোতে।

পঞ্চম অধ্যায়

পদ-উদ্ধৃতি-প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথ

ঊনবিংশ শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ লেখকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বপ্রথম বৈষ্ণব পদাবলী হইতে পদ উদ্ধৃত করেন। জগদ্বন্ধু ভদ্র বা সারদাচরণ মিত্রের বিদ্যাপতির পদাবলী প্রকাশের অনেক পূর্বে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে বা ১২৭৩ সালে বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলার "আত্মমন্দিরে" অধ্যায়ে বিদ্যাপতি ভণিতাযুক্ত "জনম অবধি হম রূপ নেহারণু" পদটি শীর্ষদেশে স্থাপন করেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র পদকল্পতরু পড়েন নাই; পড়িলে ঐ পদ কবিবল্লভ ভণিতায় পাইতেন। আমাদের এই অনুমানের সমর্থন কল্পে আরও বলা যায় যে কমলাকান্তের দপ্তরের দ্বাদশ সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র "একটি গীত" যে ভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে প্রথম কলিটিতে মিল পর্যন্ত নাই--

এসো এসো বঁধু এসো আধ আচরে বসো
নয়ন ভরিয়ে তোমায় দেখি।
অনেক দিবসে মনের মানসে
তোমা ধনে মিলাইল বিধি॥

পদকল্পতরুতে (১৯৭৮) পাঠ আছে--

আইস আইস বন্ধু আধ আঁচরে আসি বৈস
নয়ন ভরিয়া তোমা দেখি।
অনেক দিবসে মনের মানসে
সফল করিয়ে আঁখি॥

রবীন্দ্রনাথ পদকল্পতরুর বটতলার ছাপা বা কোন হাতে লেখা অশুদ্ধ পুথি হইতে ঐ পদটির পাঠ পদরত্নাবলীর ৭৪ সংখ্যক পদে দিয়াছেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্র-প্রদত্ত পাঠের সহিত পদকল্পতরুর পাঠের পার্থক্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাই পাদটীকায় লিখিয়াছেন "বঙ্কিমবাবুর কমলাকান্তের দপ্তরে এই গানের যে পাঠ আছে তাহা বোধ করি কোন পাঠকের অবিদিত নাই।"

পদাবলীসাহিত্যের উৎস হইতে আহরণ করিয়া বিবিধ প্রকারের রচনার মধ্যে পদাংশ সমূহ উদ্ধৃতিদ্বারা বক্তব্যকে সুপরিস্ফুট করিবার পথ প্রদর্শক রবীন্দ্রনাথ। আজকাল কোন কোন সাহিত্যিক নিজ নিজ উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর মুখে কখনও কখনও দুই চারিটি পদাংশ দিয়া থাকেন বটে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতন পদাবলী হইতে এত অজস্র উদ্ধৃতি দিতে কাহাকেও দেখি না। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সুদীর্ঘকালের লেখক-জীবনে ১২৯১ সাল হইতে ১৩৪৩ সাল পর্যন্ত গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, প্রবন্ধে ও কবিতায় বহুবার পদাবলীব উদ্ধৃতি প্রয়োগ করিয়াছেন। অধিকাংশ উদ্ধৃতির মূল

পদটি পদরত্নাবলীতে পাওয়া যায়। এই হেতু রবীন্দ্র-সাহিত্যের সম্যক্ উপলব্ধির জন্য পদরত্নাবলী অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করা প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথ পদাংশ তুলিয়া নিজের বক্তব্যকে কেমন জোরালো অথবা ভাবঘন করিয়াছেন তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত রচনার কালানুক্রম অনুসরণ করিয়া দিতেছি। ১২৯১ সালে প্রকাশিত "রাজপথের কথায়" রবীন্দ্রনাথ রাজপথের মুখে আক্ষেপ প্রকাশ করাইয়াছেন- "ছোটো ছোটো কোমল পা গুলি যখন আমার উপর দিয়া চলিয়া যায়, তখন আপনাকে বড়ো কঠিন বলিয়া মনে হয়; মনে হয় উহাদের পায়ে বাজিতেছে। কুসুমের দলের ন্যায় কোমল হইতে সাধ যায়। রাধিকা বলিয়াছেন—

যাঁহা যাঁহা অরুণ-চরণ চলি যাতা।
তাঁহা তাঁহা ধরণী হইয়ে মঝু গাতা॥ (পদরত্নাবলী ৮৪)

অরুণ-চরণগুলি এমন কঠিন ধরণীর উপর চলে কেন। কিন্তু তা যদি না চলিত, তবে বোধ করি কোথাও শ্যামল তৃণ জন্মিত না।" গোবিন্দ দাসের রাধিকা তাঁহার দয়িতের চরণের পরশ পাইবার জন্যও বটে, আবার কঠিন মাটির আঘাত হইতে কৃষ্ণকে বাঁচাইবার জন্যও বটে বল্লভের পায়েব তলায় নিজের কোমল দেহ বিছাইয়া দিতে চাহেন। আর রবীন্দ্রনাথের রাজপথ ছোট ছোট ছেলেমেয়েদিগকে আঘাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য কোমল হইতে চাহে। পদাবলীর ভাষা গ্রহণ করিলেও এখানে রবীন্দ্রনাথ ভাবচিত্রণে অপূর্ব মৌলিকতা দেখাইয়াছেন।

পদরত্নাবলী প্রকাশের প্রায় সমকালে রবীন্দ্রনাথ 'কড়ি ও কোমলের' 'দেহের মিলন' কবিতায় জ্ঞানদাসের

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে, গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥ (পদরত্নাবলী ৮৭)

ইত্যাদি পদটির দ্বিতীয় চবণটি পূর্বোভাগে স্থাপন করিয়া লিখিয়াছেন—

প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে।
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন॥
হৃদয়ে আচ্ছন্ন দেহ হৃদয়ের ভরে।
মুরছি পড়িতে চায তব দেহ পরে॥

রাধা বলেন যে তাঁহাব প্রতি অঙ্গ যেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অঙ্গের জন্য ক্রন্দন হ, আর তাঁহার হৃদয় কাঁদিতেছে প্রিয়তমের হৃদয়ের একটু স্পর্শ পাইবার জন্য

হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোব কান্দে।
পরাণ পিরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥

এখানে 'পিরিতি'ই মুখ্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতায় দেহেব মিলনই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। তাঁহারও পরাণ তৃষিত বটে কিন্তু সে তৃষ্ণা শুধু "তোমারে সর্বাঙ্গ দিয়ে করিতে দর্শন।" কিন্তু ২৪।২৫ বৎসরের যুবক রবীন্দ্রনাথকে একেবারে

দেহ-সর্বস্ব বলা চলে না, কেননা তিনি দেহ চান হৃদয়ের জন্যই—

হৃদয় লুকানো আছে দেহের সায়রে,
চিরদিন তীরে বসি করি গো ক্রন্দন।

এই ক্রন্দনের ভাবটি আরও বিশদ করিয়াছেন কবি ১২৯৮ সালে 'মেঘদূত প্রবন্ধে'—"এই চিরবিরহের কথা উল্লেখ করিয়া বৈষ্ণব কবি গাহিয়াছেন—'দুহুঁ কোলে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।' আমরা প্রত্যেক নির্জন গিরিশৃঙ্গে একাকী দণ্ডায়মান হইয়া উত্তরমুখে চাহিয়া আছি—মাঝখানে আকাশ এবং মেঘ এবং সুন্দরী পৃথিবী রেবা সিপ্রা অবন্তী উজ্জয়িনী, সুখ-সৌন্দর্য-ভোগ-ঐশ্বর্যের চিত্রলেখা; যাহাতে মনে করাইয়া দেয়, কাছে আসিতে দেয় না; আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করে নিবৃত্তি করে না। দুটি মানুষের মধ্যে এতটা দূর! কিন্তু এ-কথা মনে হয়, আমরা যেন কোনো এক কালে একত্র এক মানসলোকে ছিলাম, সেখান হইতে নির্বাসিত হইযাছি। তাই বৈষ্ণব কবি বলেন, তোমার 'হিয়ার ভিতর হইতে কে কৈল বাহির" (পদরত্নাবলী ৪২)। বলরাম দাস ঐ পদে শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন যে রাধা তাঁহার নিধি, কোটি কল্প যদি নিরবধি তিনি অনিমেষ নয়নে রাধাকে দেখেন তবুও তাঁহার নয়ন দুইটি তৃপ্ত হয় না। তিনি রাধাকে পাইয়াও সর্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকেন যে এই হারাইলাম বুঝি, এই হারাইলাম বুঝি; তাঁহাকে যত্ন করিয়া হৃদয়ের মধ্যে রাখিলেও যেন বিশ্বাস হয় না যে সত্যই তিনি থাকিবেন

হিয়ার ভিতরে থুইতে নহে পরতীত।
হারাও হারাও হেন সদা করে চীত॥

এমন যে হৃদয়ের ধন রাধা, তাহাকে কে হৃদয় হইতে বাহির করিয়া আনিল তাই বলরামদাসের প্রভু শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত স্থির হইতেছে না—

হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈলে বাহির।
তেঁঞি বলরামের পহুঁর চীত নহে থীর॥

এখানে বলরামদাস এমন কোন কথা বলেন নাই বা ইঙ্গিত করেন নাই যাহা হইতে বুঝা যায় যে এককালে রাধাকৃষ্ণের সঙ্গে যেন একই ছিলেন, পরে তাঁহার দুই পৃথক দেহ হইয়াছেন বলিয়া একে অন্যের বিরহে আকুল। নরনারীর অন্তরের চিরন্তন বিরহ-ভাবের যে ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ করিয়াছেন তাহা না আছে মেঘদূতে, না আছে বলরামদাসের পদে, উহা রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় প্রতিভার সৃষ্টি।

রবীন্দ্রনাথ 'জয়পরাজয়' গল্পে ১২৯৯ সালে লিখিয়াছেন যে মানুষের জীবনের "খানিকটা বিধাতা গড়েন, খানিকটা আপনি গড়ে, খানিকটা পাঁচজনে গড়িয়া দেয়; জীবনটা একটা পাঁচমিশালি রকমের জোড়াতাড়া—প্রকৃত এবং অপ্রকৃত, কাল্পনিক এবং বাস্তবিক। কেবল কবি যে-গানগুলি গাহিতেন তাহাই সত্য এবং সম্পূর্ণ। গানের বিষয় সেই রাধা এবং কৃষ্ণ —সেই চিরন্তন নর এবং চিরন্তন নারী, সেই অনাদি দুঃখ এবং অনন্ত সুখ।" এই শেখর নামক কবি রাজসভায় বংশী ধ্বনি লইয়া গান

গাহিলেন। সেই গানের যে ভাবটি রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন তাহা পদরত্নাবলীধৃত জ্ঞানদাসের ৭৮ সংখ্যক পদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইলেও উহার সুগভীর ব্যঞ্জনা কবিগুরুর মৌলিক দান। তিনি লিখিয়াছেন—"বৃন্দাবনে প্রথম বাঁশী বাজিয়াছে, তখনো গোপিনীরা জানে না কে বাজাইল, জানে না কোথায় বাজিতেছে। একবার মনে হইল দক্ষিণপবনে বাজিতেছে, একবার মনে হইল উত্তরে গিরিগোবর্ধনের শিখর হইতে ধ্বনি আসিতেছে; মনে হইল, অস্তাচলের প্রান্তে বসিয়া কে বিরহশোকে কাঁদিতেছে; মনে হইল যমুনার প্রত্যেক তরঙ্গ হইতে বাঁশি বাজিয়া উঠিল; মনে হইল, আকাশের প্রত্যেক তারা যেন সেই বাঁশির ছিদ্র: অবশেষে কুঞ্জে কুঞ্জে, পথে ঘাটে, ফুলে ফলে, জলে স্থলে, উচ্চে নীচে, অন্তরে বাহিরে বাঁশী সর্বত্র হইতে বাজিতে লাগিল; বাঁশী কী বলিতেছে তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না; কেবল দুই চক্ষু ভরিয়া অশ্রুজল জাগিয়া উঠিল এবং একটি অলোকসুন্দর শ্যামস্নিগ্ধ মরণের আকাঙ্ক্ষায় সমস্ত প্রাণ যেন উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল।"

এই গল্প লিখিবার প্রায় সমকালে ১২৯৯ সালে "সোনার তরী"র 'বর্ষাযাপন' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানদাসের "রজনী শাঙন ঘন" পদটির (পদরত্নাবলী ২৫) এক চরণ উদ্ধৃত করিয়া লেখেন—

স্তব্ধ রাত্রি দ্বিপ্রহরে ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি পড়ে
শুয়ে শুয়ে ঘুম অনিদ্রায়
'রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন'
সেই গান মনে পড়ে যায়।
'পালঙ্কে শয়নে রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে'
মন-সুখে নিদ্রায় মগন।
সেই ছবি জাগে মনে পুরাতন বৃন্দাবনে
রাধিকার নির্জন স্বপন॥

এই পদটি রবীন্দ্রনাথের খুব প্রিয় ছিল। তিনি ১৩২৭ সালে ছন্দ প্রবন্ধে যে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা পূর্বেই দেখাইয়াছি। ১৩৩২ সালের শেষবর্ষণ নাটকে নটরাজ এই পদাংশ আবৃত্তি করিয়াছেন। পুনরায় ১৩৪৩ সালে "শ্যামলী"র 'স্বপ্ন' নামক কবিতায় লিখিয়াছেন—

মনে পড়ছে ঐ পদটা—

'রজনী শাঙন ঘন, ঘন দেয়া গরজন
স্বপন দেখিনু হেন কালে!
সেদিন রাধিকার ছবির পিছনে
কবির চোখের কাছে
কোন্ একটি মেয়ে ছিল,
ভালোবাসার কুঁড়ি-ধরা তার মন।

মুখচোরা সেই মেয়ে,
চোখে কাজল পরা,
ঘাটের থেকে নীলশাড়ি
'নিঙাড়ি নিঙাড়ি' চলা।

নীলশাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি চলা অবশ্য চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত পদে (পদকল্পতরু ২১০) পাওয়া যায়—

চলে নীল শাড়ি নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি
পরাণ সহিত মোর।
সেই হইতে মোর হিয়া নহে থির
মনমথ-জ্বরে ভোর॥

পদটি লোচন ও যদুনাথের ভণিতাতেও পাওয়া যায়।

'জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু' পদটিও (পদরত্নাবলী ১১০) রবীন্দ্রনাথ বহুস্থানে বহুবার উদ্ধৃত করিয়াছেন। ১২৯৯ সালে লিখিত "গোড়ায় গলদে" চন্দ্রকান্ত তাঁহার বন্ধু নিমাইকে বলিতেছেন—"চাঁদের আলোয় শুয়ে পড়ে এমনও ভেবেছি—আহা, এই সময়ে প্রেয়সী যদি চুলটি বেঁধে, গাটি ধুয়ে একখানি বাসন্তী রঙের কাপড় পরে একগাছি বেলফুলের মালা হাতে করে নিয়ে এসে গলায় পরিয়ে দেয়, আর মুখের দিকে চেয়ে বলতে থাকে—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়ে জুড়ন না গেল॥"

দাম্পত্যজীবনের একান্ত ঘরোয়া পরিবেশের মধ্যে এই রূপ আকৃতি প্রয়োগ নূতন বলিয়া স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। ১৩০৪ সালে "পঞ্চভূতে" ব্যোম কচ-দেবযানীর এক উৎকট আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বাহির করিতে যাইয়া এই পদটি উদ্ধৃত করিয়াছে। সে বলিল যে জীব স্বর্গ হইতে এই সংসার আশ্রমে আসিয়াছে, আর দেহটি হইতেছে আশ্রমকন্যা। "জীব তাহার মূঢ় অবোধ নির্ভরপরায়ণা সঙ্গিণীটিকে কেমন করিয়া পাগল করিতেছে দেখো। দেহের প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে এমন একটি আকাঙ্ক্ষার সঞ্চার করিয়া দিতেছে দেহধর্মের দ্বারা যে আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি নাই। তাহার চক্ষে যে সৌন্দর্য আনিয়া দিতেছে দৃষ্টি-শক্তির দ্বারা তাহার সীমা পাওয়া যায় না—তাই সে বলিতেছে, 'জনম অবধি হম, রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল;'—তাহার কর্ণে যে সংগীত আনিয়া দিতেছে শ্রবণশক্তির দ্বারা তাহার আয়ত্ত হইতে পারে না, তাই সে ব্যাকুল হইয়া বলিতেছে, "সেই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলুঁ শ্রুতিপথে পরশ না গেল।" এটি অবশ্য সব কিছুর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিবার প্রবৃত্তিকে ব্যঙ্গ করিয়া লেখা। একদিকে কচ-দেবযানীর ন্যায় অতুলনীয় কাব্যকে অন্যদিকে 'জনম অবধি'র ন্যায় অসীম তৃপ্তিহীনতার পদকে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার

চাপে কেমন করিয়া পিষিয়া মারা যায় তাহাই রবীন্দ্রনাথ এখানে রহস্যচ্ছলে দেখাইয়াছেন।

কবি তাঁহার তেষট্টি বৎসর বয়সে (১৩৩১ সালে) 'তথ্য ও সত্য' প্রবন্ধে ("সাহিত্যের পথে" পুস্তকের অন্তর্গত) পুনরায় এই পদাংশটি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে একজন ভালো ডাক্তার নিতান্ত গদ্যময় প্রাণী, কিন্তু এই ডাক্তারকে "যে তার সমস্ত প্রাণ মন দিয়ে ভালো বেসেছে তার কাছে ডাক্তার রসবস্তু হয়ে প্রকাশ পায়। হবামাত্র ডাক্তারকে লক্ষ্য ক'রে তার প্রেমাসক্ত অনায়াসে বলতে পারে "জনম অবধি হাম" ইত্যাদি।" ঐ গ্রন্থেরই অন্তর্ভুক্ত "সাহিত্য তত্ত্ব" প্রবন্ধটি ১৩৪০ সালে কবির বাহাত্তর বছর বয়সে লেখা। উহাতে ঐ পদাংশ পুনরায় উদ্ধৃত করিবার পূর্বে কবিগুরু বলিয়াছেন যে "সাধারণত মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে আমরা পরিমাণ রক্ষা করেই চলি। কিন্তু, যাকে ভালোবাসি অর্থাৎ যার সঙ্গে আমার ব্যক্তিপুরুষের পরম সম্বন্ধ তার সম্বন্ধে পরিমাণ থাকে না। তার সম্বন্ধে অনায়াসেই বলতে পারি— 'জনম অবধি হম' ইত্যাদি। তথ্যের দিক থেকে এতবড়ো অদ্ভুত অত্যুক্তি আর কিছু হতে পারে না, কিন্তু ব্যক্তিপুরুষের অনুভূতির মধ্যে ক্ষণকালের সীমায় সংহত হতে পারে চিরকাল।" এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে একই পদ তাঁহার জীবনের ৪১ বছরের মধ্যে (১২৯৯ হইতে ১৩৪০) চার বার উদ্ধৃত করিলেও রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেকবার ইহা বিভিন্নরূপে প্রয়োগ করিয়াছেন এবং প্রত্যেকবারেই ইহার উপর নূতন আলোক সম্পাত করিয়াছেন।

১৩০৫ সালে 'অধ্যাপক' গল্পে মহীন্দ্রের কানে কিরণের অতি সাধারণ কথাবার্তাও কেমন রোমান্টিক সুরে বাজিত তাহা দেখাইবার জন্য রবীন্দ্রনাথ মহীন্দ্রের জবানিতে বলিয়াছেন—'কিরণ যদি সহজ সুরে বলিত মহীন্দ্রবাবু, কাল সকাল সকাল আসবেন তো? তাহার মধ্যে ছন্দে লয়ে বাজিয়া উঠিত'—

কী মোহিনী জানে, বন্ধু, কী মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥ (পদরত্নাবলী ৩৯)

আমি সহজ কথায় উত্তর করিতাম, 'কাল আটটার মধ্যে আসব।' তাহার মধ্যে কিরণ কি শুনিতে পাইত না—

পরাণ পুতলি তুমি হিয়ে-মণিহার।
সরবস ধন মোর সকল সংসার॥

এই উদ্ধৃতিটি পদকল্পতরু ধৃত (২৯৫১) রায় বসন্তের একটি পদ হইতে। পদটি ছোট্ট, কিন্তু ঐ দুইটি চরণই উহার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ—

ধনি তুয়া কিসের গঞ্জনা।
তুমি আমি একই পরাণ দুই-জনা॥
তোমার আমার গতি মুরতি এক ভাব।
এক স্বরূপ রতি এক অনুভাব॥

তুমি মোর ত্রিজগত—বিভব-বিহার।
পরাণ-পুতলী মোর হিয়ে মণিহার॥
সরবস ধন মোর সকল সংসার।
রায় বসন্ত—পহু—পিরিতের সার॥

রবীন্দ্রনাথ এখানে দুইটি পয়ারের এক একটি চরণ লইয়াছেন, কেননা অপর চরণটি তেমন কবিত্বপূর্ণ নহে। রায় বসন্ত পরাণ পুতলী শব্দটি বড় ভালবাসিতেন। পদরত্নাবলীধৃত ৯০ সংখ্যক পদটিতেও আছে—"পরাণ-পুতলি তুমি জীবনের সখী" আবার আর একটি পদে তিনি লিখিয়াছেন—"হিয়ার পুতলী কান্দে তোমার পিরিতে" (পদকল্পতরু ২৯৪৪)।

১৩০৮ সালে লিখিত 'কেকাধ্বনি' (বিচিত্র প্রবন্ধ) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতির

মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া। (পদরত্নাবলী ৬৬)

পদাংশটি উদ্ধৃত করিয়া উহার পটভূমিকারূপে যাহা লিখিয়াছেন তাহা ঐ সুপ্রসিদ্ধ পদটির সৌন্দর্যকেও যেন অতিক্রম করিয়া গিয়াছে- "এই ব্যাঙের ডাক নববর্ষার মত্তভাবের সঙ্গে নহে, ঘনবর্ষার নিবিড় ভাবের সঙ্গে বড়ো চমৎকার খাপ খায়। মেঘের মধ্যে আজ কোনো বর্ণ বৈচিত্র্য নাই, স্তরবিন্যাস নাই,—শচীর কোন প্রাচীন কিংকরী আকাশের প্রাঙ্গন মেঘ দিয়া সমান করিয়া লেপিয়া দিয়াছে, সমস্তই কৃষ্ণধূসরবর্ণ। নানা শস্যবিচিত্রা পৃথিবীর উপরে উজ্জ্বল আলোকের তুলিকা পড়ে নাই বলিয়া বৈচিত্র্য ফুটিয়া ওঠে নাই। ধানের কোমল মসৃণ সবুজ, পাটের গাঢ় বর্ণ এবং ইক্ষুর হরিদ্রাভা একটি বিশ্বব্যাপী-কালিমায় মিশিয়া আছে। বাতাস নাই। আসন্ন-বৃষ্টির আশঙ্কায় পঙ্কিল পথে লোক বাহির হয় নাই। মাঠে বহুদিন পূর্বে খেতের কাজ সমস্ত শেষ হইয়া গেছে। পুকুরে পাড়ির সমান জল। এইরূপে জ্যোতিহীন, গতিহীন, কর্মহীন, বৈচিত্র্যহীন, কালিমালিপ্ত একাকারের দিনে ব্যাঙের ডাক ঠিক সুরটি লাগাইয়া থাকে।" বিদ্যাপতির ঐ পদটিও রবীন্দ্রনাথের খুব প্রিয় ছিল। তিনি বহুবার উহার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়াছেন।—১৩১৪ সালে লিখিত 'সাহিত্যসৃষ্টি' প্রবন্ধে (সাহিত্য) তিনি বলিয়াছেন—"যাহাকে আমরা গীতি-বাক্য বলিয়া থাকি অর্থাৎ যাহা একটুখানির মধ্যে একটিমাত্র ভাবের বিকাশ—ওই যেমন বিদ্যাপতির

ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর

সে-ও আমাদের মনের বহুদিনের অব্যক্তভাবের একটি কোনো সুযোগ আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া ওঠা। ভরা বাদলে ভাদ্রমাসে শূন্য ঘরের বেদনা কত লোকেরই মনে কথা না কহিয়া কতদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়াছে—যেমনি ঠিক ছন্দে ঠিক কথাটি বাহির হইল, অমনি সকলেরই এই অনেকদিনের কথাটা মূর্তি ধরিয়া আঁট বাঁধিয়া বসিল।"

১৩১৭ সালে রবীন্দ্রনাথ "শান্তিনিকেতনের" একাদশখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত শ্রাবণসন্ধ্যা প্রবন্ধে পুনরায় ঐ পদের

তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া
বিদ্যাপতি কহে, কৈসে গোঙায়বি
হরি বিনে দিনরাতিয়া।

এই অংশ তুলিয়া বলিয়াছেন—"প্রহরের পর প্রহর ধরে এই বার্তাই সে জানাচ্ছে, 'ওরে তুই যে বিরহিনী—তুই বেঁচে আছিস কী করে, তোর দিনরাত্রি কেমন করে কাটছে।' সেই চিরদিনরাত্রির হরিকেই চাই, নইলে দিনরাত্রি অনাথ।" পুনরায় তিনি বলিতেছেন "আজ কেবলি মনে হচ্ছে এই-যে বর্ষা, এ তো এক সন্ধ্যার বর্ষা নয়, এ যেন আমার সমস্ত জীবনের অবিরল শ্রাবণধারা। যতদূর চেয়ে দেখি, আমার সমস্ত জীবনের উপরে সঙ্গিহীন বিরহসন্ধ্যার নিবিড় অন্ধকার—তারি দিগ্‌দিগন্তরকে ঘিরে অশ্রান্ত শ্রাবণের বর্ষণে প্রহরের পর প্রহর কেটে যাচ্ছে; আমার সমস্ত আকাশ ঝর্‌ ঝর্‌ করে বলছে, 'কৈসে গোঙায়বি হরি বিনে দিনরাতিয়া।' শ্রীরাধার বিরহ ব্যথাকে কবিগুরু এই ভাবে বিশ্বজনীন করিয়া তুলিয়াছেন।

১৩০৮ সালে রবীন্দ্রনাথ 'ব্যাধি ও প্রতিকার' প্রবন্ধে ('সমাজ') বৈষ্ণব কবিতার উদ্ধৃতি দিয়া নিজের বক্তব্যকে যেমন ব্যঞ্জনাপূর্ণ তেমনি জোরালো করিয়াছেন। তিনি ভারতে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সম্বন্ধে বলেন—"আমরাও সভ্যতার প্রথম ডাক শুনিয়া যখন নাচিয়াছিলাম তখন মনে করিয়াছিলাম, এই পাশ্চাত্ত্যমন্ত্র গ্রহণ করিলেই আর জেতাবিজেতার ভেদ থাকিবে না—কেবল মন্ত্রবলে গোরে-শ্যামে একাঙ্গ হইয়া যাইবে।... আমাদের যাহা কিছু ছিল ছাড়িতে প্রস্তুত হইলাম, কিন্তু ভেদ সমানই রহিয়া গেল। এখন মনে মনে ধিক্কার জন্মিতেছে; ভাবিতেছি, কিসের জন্য—

ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর,
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর!

বাঁশি বাজিয়াছিল মধুর, কিন্তু এখন মনে হইতেছে—

যে ঝাড়ের তরল বাঁশি তারি লাগি পাও,
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাও। (পদকল্পতরু ৮২৮)

এখন বিলাতী শিক্ষাটিকে ডালেমূলে উপড়াইবার ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু কথা এই যে কেবলমাত্র বাঁশির আওয়াজে যিনি কুলত্যাগ করেন, তাঁহাকে অনুতাপ করিতেই হইবে।" উভয় পদই চণ্ডীদাসের - ইহার একটিও পদরত্নাবলীতে নাই।

রবীন্দ্রনাথ ১৩০৮ সালে শব্দতত্ত্ব বুঝাইতে যাইয়া পদাবলী হইতে উদ্ধৃতি দিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে বাংলার রাগ শব্দের মানে ক্রোধ; রাগ শব্দের উত্তর ঈ প্রত্যয়ে 'রাগি' হয়। কিন্তু পদাবলীতে রুষ্ট নারীকে 'রাগিণী' বলা হয়

নাই। এই বলিয়া তিনি গোবিন্দদাসের রাধিকার বর্ণনার পদ তুলিয়াছেন—

নব রঙ্গিণী অখিল সোহাগিণী
পঞ্চম রাগিণী মোহিনী রে।

নীরস শব্দতত্ত্বকে সরস করিবার জন্য তিনি মন্তব্য করিয়াছেন—"গোবিন্দদাস মহাশয়ের বলিবার অভিপ্রায় এরূপ নহে যে, রাধিকার রাগ সর্বদা পঞ্চমেই চড়িয়া আছে।" ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, সংগীতের 'রাগিণী' কথাটা সংস্কৃত প্রত্যয়ের দ্বারা তৈরি। 'অনুরাগী' কথাটাও সেইরূপ।

১৩০৯ সালে রবীন্দ্রনাথ 'দর্পহরণ' গল্পে লিখিয়াছেন যে ভাবী বধূর নাম নায়কের

"কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ"। (পদকল্পতরু ১৪১)

চন্ডীদাসের এই সুপ্রসিদ্ধ পদটির প্রথম চরণ 'সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম' ১৩২৪ সালে ছন্দ প্রবন্ধেও যে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা পূর্বেই দেখাইয়াছি। এই পদটি পদরত্নাবলীতে ধৃত হয় নাই।

১৩১১ সালে রবীন্দ্রনাথ' 'আত্মশক্তি'র অন্তর্গত 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে পুনরায় 'ঘর কৈনু বাহির' পদাংশ তুলিয়াছেন। এখানে তিনি বলিতে চাহেন যে "বাহিরে অর্জন করিতে হইবে, ঘরে সঞ্চয় করিবার জন্যই। বাহিরে শক্তি খাটাইতে হইলেও হৃদয়কে আপনার ঘরে রাখিতে হইবে। শিক্ষা করিব বাহিরে। প্রয়োগ করিব ঘরে। কিন্তু আমরা আজকাল—

ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর,
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর।

এই জন্য কবিকথিত 'স্রোতের সেঁওলি'র মত ভাসিয়া চলিয়াছি।" নিছক প্রেমের কবিতাও যে সামাজিক সমস্যা সম্পর্কিত প্রবন্ধে ভাবপ্রকাশের এমন সহায়ক হইয়াছে সে কেবল রবীন্দ্রনাথের প্রয়োগ-নৈপুণ্যে।

১৩২১ সালে প্রকাশিত "বোষ্টমী" গল্পে গুরুঠাকুর কেমন সুন্দর ছিলেন তাহা বলিতে যাইয়া বোষ্টমী —"তাহার সেই দূরবিহারী চক্ষু দুটিকে বহু দূরে পাঠাইয়া দিল এবং গুণ্ গুণ্ করিয়া গাহিল—

অরুণ-কিরণ খানি তরুণ অমৃতে ছানি
কোন্ বিধি নিরমিল দেহা।"

বোষ্টমী চরিত্রটি যে বাস্তবের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা রবীন্দ্রনাথ ১৩৩৯ সালের শ্রাবণ মাসে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত 'পত্রধারা'য় স্বীকার করিয়াছেন। বাংলার আকাশে বাতাসে পদাবলীর গান ভাসিয়া বেড়ায়। তাই কোন বোষ্টমীর পক্ষে রূপবর্ণনার

এই পদটুকু গাওয়া অসম্ভব নহে। এইটুকু পদের মধ্যে সৌন্দর্যের যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহা অতুলনীয়।

১৩২১ সালে "চতুরঙ্গ" উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ লীলানন্দ স্বামীর দলে কিরূপ কীর্তন গান করা হইত তাহার একটু আভাষ দিয়াছেন শ্রীবিলাসের একটি কথায়—"অনেক নদী পর্বতে সমুদ্রতীরে দামিনীর পাশে পাশে ফিরিয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে খোল-করতালের ঝড়ে রসের তাজা বাতাসে আগুন লাগিয়াছে; 'তোমার চরণে আমার পরাণে লাগিল প্রেমের ফাঁসি' এই পদের শিখা নূতন নূতন আখরে স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিয়াছে।" (র ৭। ৪৯২) অত্যন্ত লঘু ও সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিতে কবিগুরু এই উপন্যাসে অনেক মনস্তাত্ত্বিক বিপ্লবের চিত্র আঁকিয়াছেন। এখানে তিনি ইঙ্গিত করিয়াছেন যে আত্মনিবেদনের এই পদটি নানা আখর দিয়া গান করিতে করিতে আশা করা গিয়াছিল যে দামিনী ও শ্রীবিলাসের মধ্যে যে মানসিক যবনিকা ঝুলানো ছিল তাহা ঐ পদের আখর রূপ অগ্নিস্ফুলিঙ্গে পুড়িয়া যাইবে, কিন্তু "তবু পর্দা পুড়িয়া যায় নাই।"

১৩২২ সালে প্রকাশিত "ঘরে বাইরে" উপন্যাসে নিখিলেশ "ভরা বাদর মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর" পদাংশটি তাহার ডায়রিতে তিনবার তুলিয়া নিজের মনের ভাব বুঝাইতে চাহিয়াছেন। প্রথমে তিনি আক্ষেপ করিলেন যে "আমার মন্দির যে শূন্য থাকবার জন্যেই তৈরি"। তারপর আবার ঐ পদ তুলিয়া বলিলেন যে তাঁহার তো বিরহ নহে, তাঁহার সহিত বিমলার যে মর্মান্তিক বিচ্ছেদ ঘটিতে চলিয়াছে।—"বিরহে যে-মন্দির শূন্য হয় সে-মন্দিরের শূন্যতার মধ্যেও বাঁশি বাজে—কিন্তু বিচ্ছেদে যে-মন্দির শূন্য হয় সে-মন্দির বড়ো নিস্তব্ধ, সেখানে কান্নার শব্দও বেসুরো শোনায়"। নিখিলেশ সারাদিন ঐ পদটুকু গুণ-গুণ করিয়াছেন। শেষে তিনি দার্শনিকের মতন নিজেকে ধিক্কার দিয়া বলিলেন—"শূন্য মন্দির! বলতে লজ্জা করে না? এতবড়ো মন্দির কিসে তোমার শূন্য হল? একটা মিথ্যাকে মিথ্যা বলে জেনেছি তাই বলে জীবনের সমস্ত সত্য আজ উজাড় হয়ে গেল!" একটি পদকে অবলম্বন করিয়া মনের ভিতর কতরকম ভাবের ঝড় উঠিতে পারে তাহা রবীন্দ্রনাথ এখানে দেখাইয়াছেন। পদটা অবশ্য উপলক্ষ্য মাত্র। "ঘরে বাইরে" উপন্যাসে আর দুইটি অর্বাচীন পদাংশ আছে। বিমলা সকালবেলা বৈঠকখানাঘরে যাইতেছিলেন। তাঁহার মেজো জা বলিলেন—"এত সকালে? গোষ্ঠলীলা বুঝি?" গোষ্ঠলীলাতেও অবশ্য সকালবেলা রাধাকৃষ্ণের মিলন ঘটে না, শুধু একটু চোখে চোখে দেখাদেখি হয়; পরে মধ্যাহ্নে রাধাকুণ্ডে মিলন হয়। যাহা হউক বিমলা ঐ প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া চলিয়া গেলেন।" মেজ জা গান ধরলেন,—

রাই আমাদের চলে যেতে ঢলে পড়ে।
অগাধ জলের মকব যেমন
ও তার চিটে চিনি জ্ঞান নেই।"

এ গান অবশ্য মহাজন পদাবলীর নহে; কৃষ্ণ-যাত্রার হইতে পারে। সন্দীপ যখন

বিমলাকে একেবারে যাদু করিয়া ফেলিয়াছেন তখন পঞ্চাশ হাজার টাকার জায়গায় পাঁচ হাজার, এমন কি তিন হাজার টাকা বিমলার কাছে চাহিলে বিমলা "একটা গানের মতো বললে, পাঁচ হাজার তোমাকে এনে দেব। যে-সুরে রাধিকা গান গেয়েছিল,

"বঁধুর লাগি কেশে আমি পরব এমন ফুল
স্বর্গে মর্ত্যে তিন ভুবনে নাইকো যাহার মূল।
বাঁশির ধ্বনি হাওয়ায় ভাসে
সবার কানে বাজবে না সে
দেখ্‌লো চেয়ে, যমুনার ওই ছাপিয়ে গেল কূল।"

এটি পদের আকারে লেখা বটে, কিন্তু পদাবলীর ভাষা এরূপ নহে। সম্ভবতঃ এটি রবীন্দ্রনাথের নিজেরই রচনা।

১৩৩১ সালে তথ্য ও সত্য প্রবন্ধে (সাহিত্যের পথে) রবীন্দ্রনাথ "শরদ চন্দ পবন মন্দ" ইত্যাদি (পদরত্নাবলী ১০১) গোবিন্দ দাসের সুপ্রসিদ্ধ পদ উদ্ধৃত করিয়া কাব্যে কিভাবে অখণ্ড সৌন্দর্যের সৃষ্টি করা যায় তাহার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। ঐ প্রবন্ধেই তিনি দেখাইয়াছেন যে কবিতা শব্দের অভিধাননির্দিষ্ট অর্থের তথ্য সীমা ছাড়াইয়া সত্যের অসীমতাকে প্রকাশ করে। এই কথার প্রমাণস্বরূপ তিনি জ্ঞানদাসের

রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল
যৌবনের বনে মন পথ হারাইল। (পদকল্পতরু ১২৩)

পদ তুলিয়াছেন। এই সুন্দর পদটিও পদরত্নাবলীতে স্থান পায় নাই। জ্ঞানদাসের আর একটি পদাংশও ঐ প্রবন্ধে উদ্ধৃত হইয়াছে—

এক দুই গণইতে অন্ত নাহি পাই।
রূপে গুণে রসে প্রেমে আরতি বাঢ়াই॥

ইহার সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন—"এক-দুইয়ের ক্ষেত্র হল বিজ্ঞানের ক্ষেত্র। কিন্তু, রসসত্যের ক্ষেত্রে যে-প্রাণের আরতি বাড়তে থাকে সে তো অঙ্কের হিসাবে বাড়ে না। সেখানে এক-দুইয়ের বালাই নেই, নামতার দৌরাত্ম্য নেই।"

কবি ১৩৪৬ সালের "আনন্দবাজার পত্রিকা"র শারদীয়া সংখ্যায় 'রবিবার' গল্পেও এক টুকরা পদ তুলিয়া বিভার সখীর মুখে বিভাকে টিট্‌কারি দিয়াছেন। বিভা পরীক্ষায় তাহার সহপাঠী অভীকের চেয়ে উঁচুস্থান পাওয়ায় সে অভীককে বলিল— "'তুমি দিনরাত কেবল ছবি এঁকে পরীক্ষায় পিছিয়ে পড়, আমার লজ্জা করে।' কথাটা দৈবাৎ পাশের বারান্দা থেকে কানে যেতেই বিভার এক সখী চোখ টিপে বলেছিল—

"মরি মরি, তোমারি গরবে গরবিণী আমি
রূপসী তোমারি রূপে"

এই একটুখানি পদ দিয়া বিভার ভালবাসার গভীরতা কত মধুর রূপে প্রকাশ করা হইয়াছে। "ঘরে বাইরে"র মেজ-জার বিমলার প্রতি টিট্‌কারির সহিত ইহা তুলনীয়।

পদাবলী সাহিত্যের ভাবধারার সঙ্গে দেশের আপামর সাধারণের নাড়ীর যোগ ছিল। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গল্প-উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার মনের অবস্থা বুঝাইবার জন্য মহাজনী পদের রত্নরাজী অসাধারণ নৈপুণ্যের সহিত উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার প্রবর্তিত রীতি এখন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জিয়াইয়া রাখিয়াছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রাক্-গীতাঞ্জলিযুগের কাব্যে পদাবলীর প্রভাব

রবীন্দ্রনাথের নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভার দ্যুতি যাহার উপর পড়িয়াছে তাহাই উজ্জ্বলতর ও সুন্দরতর হইয়া ফুটিয়াছে। কি মহাভারতের কাহিনী, কি বৌদ্ধ উপাখ্যান, কি কালিদাসের কাব্য নাটক, কি বৈষ্ণব পদাবলী যাহা কিছু তাঁহার পরশ পাইয়াছে তাহাই সোনা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বও এমনি প্রখর যে তাঁহাকে ব্রাহ্ম, বৈষ্ণব বা অন্য কোন সম্প্রদায়ের গণ্ডীর মধ্যে বাঁধিয়া রাখা অসম্ভব। এই দুইটি কথা মনে রাখিয়া আমরা তাঁহার গান ও কবিতার উপর বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব বিচার করিব। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা তাঁহার মানসিক ক্রমবিকাশের ইতিহাসকে তিন পর্যায়ে বিভক্ত করিয়া দেখিব। কবি তাঁহার চৌদ্দ বৎসর বয়স হইতে পদাবলী পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। তিনি যে প্রথমে পদাবলীর অনুকরণে পদ লিখিবার চেষ্টা করেন ও বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, বসন্তরায় প্রভৃতির পদাবলীর সৌন্দর্য বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হন তাহা পূর্বেই দেখাইয়াছি। ১২৮৭ সাল হইতে ১৩১২ সাল পর্যন্ত এই পঁচিশ বৎসরের কাব্যরচনার মধ্যে পদাবলীর প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই যুগেই কিন্তু পদাবলীর প্রভাব হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া একটি নিজস্ব ভাবধারা সৃষ্টি করিবার প্রয়াস তাঁহার কবিতায় দেখিতে পাওয়া যায়। ১৩১৩ হইতে ১৩২১ পর্যন্ত সময়ে তিনি পদাবলীর ভাবমাধুর্যকে স্বকীয় অননুকরণীয় ভঙ্গীতে "গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি"তে প্রকাশ করেন। কাল হিসাবে সংক্ষিপ্ত হইলেও এই নয় বৎসর তাঁহার আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সুবর্ণময় যুগ। এই যুগের রচনায় পদাবলীর প্রভাব আর চোখের সামনে ধরা দেয় না, কিন্তু পিছন হইতে অনুপ্রেরণা জোগায়। "বলাকা" রচনার কাল হইতে ১৩৪৭ সাল পর্যন্ত এই ছাব্বিশ বৎসর কাল রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণবীয় ভাবধারা ও সাধনপ্রণালী তটস্থ সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন এবং পদাবলীর ছন্দ, ভাব ও বিষয় যতটা সম্ভব বর্জন করিয়া চলিয়াছেন।

১২৮৭ সালের "ভারতী"তে রবীন্দ্রনাথের "ভগ্নহৃদয়" কাব্যের প্রথম ছয় সর্গ প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথমেই পদাবলীর উপজীব্য পরকীয়া প্রেমের মর্মকথা চপলার মুখ দিয়া বলানো হইয়াছে—"বাধা না পাইলে সখি সুখেতে কি সুখ আছে? সামাজিক বাধা, মিলনের অনিশ্চয়তা, সব ভাসাইয়া প্রেমকেই আঁকড়াইয়া ধরা, ইহাতেই পরকীয়া প্রেম অধ্যাত্মসাধনার ভাব জোগাইয়াছে। উনিশ বছর বয়সেই কবি ইহা বুঝিয়াছিলেন। গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন (পদকল্পতরু, ৬১৩) যে রাধা দুপুরে বালুর উপর দিয়া স্নান করিতে যাইবেন বলিয়া কৃষ্ণ তপ্ত পথের উপর জল ঢালেন, আর যে পথ দিয়া রাধা চলিয়া যান, "পদ-চিহ্ন তলে লুঠয়ে তাই"। রায় শেখরের একটি পদে (পদকল্পতরু, ৬৭৯) আছে যে রাধা যদি আগের ঘাটে স্নান

করেন, কৃষ্ণ পিছের ঘাটে যান যাহাতে রাধার অঙ্গের জল তাঁহার গায়ে লাগে; বসনে বসনের ছোঁয়া পাইবে বলিয়া রাধার রজকের নিকট কৃষ্ণ কাপড় কাচিতে দেন আর—

ছায়ায় ছায়ায় লাগিব লাগিয়া
ফিরয়ে কতেক পাকে।
আমার অঙ্গের বাতাস যে দিগে
সে মুখে সে দিন থাকে॥

গোবিন্দদাসের অন্য একটি পদে (পদকল্পতরু ৬৯২) আছে রাধার "প্রতি পদ-চিহ্ন চুম্বয়ে কান।" ইহার ভাব লইয়া "ভগ্নহৃদয়ে"র (ষড়্‌বিংশ সর্গ) নলিনী বলিতেছে

মোর রাঙ্গা চরণের ধূলি হইবার
হৃদয়ের একমাত্র সাধ ছিল যার,
ধূলিতে যে পদচিহ্ন করিত চুম্বন
মুখ ফিরাইয়া আজ গেল সেই জন।

১২৮৭ সালে বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের বর্ষার পদের অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ "বাল্মিকী প্রতিভা"য় গান লেখেন—

'রিম্‌ ঝিম্‌ ঘন ঘন রে বরষে'।

১২৮৮ সালে "বৌঠাকুরাণীর হাটে" রবীন্দ্রনাথ বসন্ত রায়ের মুখে একটি খণ্ডিতার পদ দিয়াছেন। খণ্ডিতাকে পরবর্তীকালে ধিক্কার দিলেও তিনি কুড়ি বছর বয়সে পদাবলীর মোহে এমন আবিষ্ট যে এই বিষয়েও তাঁহার পদ রচনা করিতে বাধে নাই—

বঁধুয়া অসময়ে কেন হে প্রকাশ?
সকলি যে স্বপ্ন বলে হতেছে বিশ্বাস।
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে ছিলে, সেথায় তো আদর মিলে?
এরি মধ্যে মিটিল কি প্রণয়েরি আশ।

রবীন্দ্রনাথের খণ্ডিতা রাধা চণ্ডীদাস ও গোপাল দাসের রাধার মত সুতীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণে দয়িতকে ক্ষতবিক্ষত করেন নাই; গোবিন্দদাসের রাধার মত বিদগ্ধ বাক্‌পটুতা দেখান নাই; তিনি চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—"এখনো এ রাধিকার ফুরায় নি তো অশ্রুপাত।" সমগ্র পদাবলী-সাহিত্যের কোথাও রাধা বা তাঁহার কোন সখী চন্দ্রাবলীর প্রতি কোন প্রকার সহানুভূতি দেখান নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতির সীমা এতই ব্যাপক যে তাঁহার রাধাও বলে "চন্দ্রাবলীর কুসুমসাজ এখনি কি শুকাল আজ?"

১২৯১ সালে যখন রবীন্দ্রনাথ পদরত্নাবলীর জন্য পদনির্বাচন করিতেছিলেন ও 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' লিখিতেছিলেন তখন ঐ নাটকে কয়েকটি স্বরচিত পদ সন্নিবেশ করেন। তিনি কৃষকদের মুখে

"হেদে গো নন্দরাণী
আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও।" ইত্যাদি

গোষ্ঠের গানটি দিয়াছেন। পদরত্নাবলীর ষষ্ঠ পদটির উত্তরে যেন এটি লেখা। সখ্যরসের ছবি আঁকিতে যাইয়াও রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির সৌন্দর্যের কথা ভুলিতে পারেন নাই—

রোদের বেলায় গাছের তলায়
নাচব মোরা সবাই মিলে।
বাজবে নূপুর রুনুঝুনু
বাজবে বাঁশি মধুর বোলে,
বনফুলে গাঁথব মালা
পরিয়ে দিব শ্যামের গলে।

কৃষকদের মনে যেমন গোষ্ঠের গানই সহজে আসে, গ্রামের স্ত্রীলোকদের পক্ষে তেমনি রাধার মানের পদ গাহিয়া নিজেদের হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করা স্বাভাবিক। তাহারা বলিতেছে—

বলি কথা কোস না লো রাই শ্যামের বড়াই বড়ো বেড়েছে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রাধা দুর্জয় মান করিতে জানেন না। তাই ঐ নিষেধের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সখীরা জানাইতেছেন যে কৃষ্ণ মধুর হাসিয়া ও বাঁশী বাজাইয়া গোপীদের হৃদয় হরণ করিয়াছেন। প্রকৃতির শোভা দেখিলে রবীন্দ্রনাথের রাধা আর মান করিয়া থাকিতে পারেন না। দয়িত কাছে না থাকিলে কি ঐ শোভা মন ভরিয়া উপভোগ করা যায় ?

বনে এমন ফুল ফুটেছে
মান করে থাকা আজ কি সাজে!

"প্রকৃতির প্রতিশোধে" বৌ-ঝি, চাষা-পথিক সবাই রাধাকৃষ্ণের গান গাহিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করে। একদল পথিক গাহিতেছে

মরি লো মরি,
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে!

সুতরাং তাহাদের আর ঘরে থাকা হইল না; তাহারা যমুনার তীরে ধীরসমীরে যাইবার পথ খুঁজিতে লাগিল।

১২৯৩ সালে প্রকাশিত 'কড়ি ও কোমলেও' ঐ বাঁশিরই ধ্বনি শুনিয়া পরাণ আকুল হইবার কথা আছে—

ওগো কে যায় বাঁশরি বাজায়ে
আমার ঘরে কেহ' নাই যে।
তারে মনে পড়ে যারে চাই যে॥

বৃন্দাবনের গোপীরা বাঁশীর ডাক শুনিয়া ঘরদুয়ার, আত্মীয়স্বজন সব ছাড়িয়া ছুটিয়াছিলেন। এখানে বাড়ীতে কেহ নাই বলিয়াই যেন বিশেষ করিয়া তাহাকে মনে পড়ে, যাহাকে প্রাণ একান্তই চায়; এমন সময়ে সে বাঁশি শুনিতে পায়; কিন্তু কে বাঁশি বাজাইতেছে তাহা ঠিক জানা যায় না বলিয়া অভিসারে যাওয়া হইল না সে

সারা বিভাবরী কার পূজা করি
যৌবন-ডালা সাজায়ে
বাঁশি-স্বরে হায় প্রাণ নিয়ে যায়
আমি কেন থাকি হায় রে!

বাঁশি চিরদিন এক তরফের কথাই শুনাইয়াছে; রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব ভঙ্গিতে বলিলেন—

আমি আমার কথা তারে জানাব কী করে
প্রাণ কাঁদে মোর তাই যে।

"কড়ি ও কোমলে"র 'মথুরায়' কবিতাটি বৈষ্ণব কবিদের মাথুরবিরহের পদের ভঙ্গীতে লেখা। কিন্তু ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে এখানে কৃষ্ণ তাঁহার হৃদয়ের বিরহ-জ্বালা প্রকাশ করিতেছেন, রাধা নহে। এই কবিতাতেও জ্যোৎস্না রজনীতে "মথুরায় উপবন কুসুমে সাজিল ওই", দেখিয়া শ্যামের যেন রাধার ও বৃন্দাবনের পরিবেশের কথা মনে পড়িতেছে। তিনি বাঁশি বাজাইতে চাহেন, কিন্তু মথুরার আবেষ্টনীতে বাঁশি বাজিতেছে না—

বাঁশরি বাজাতে চাহি বাঁশরি বাজিল কই ?

বাঁশরি বাজিল না বলিয়াই বেশী করিয়া তাঁহার মনে পড়িতেছে—

কোথা সে বিধুর বালা, মলিন মালতীমালা,
হৃদয়ে বিরহ-জ্বালা, এ নিশি পোহায় হায়।

১২৯৪ সালেই কবি মানব-হৃদয়ের চিরন্তন বিরহবোধ সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছেন। এই বিরহবোধের অতৃপ্তি দৈহিক সম্ভোগে দূর হয় না। "মানসী"র 'হৃদয়ের ধন' কবিতাতে তিনি লিখিলেন—

কাছে গেলে রূপ কোথা করে পলায়ন
দেহ শুধু হাতে আসে, শ্রান্ত করে হিয়া।
প্রভাতে মলিনমুখে ফিরে যাই গেহে,
হৃদয়ের ধন কভু ধরা যায় দেহে ?

চার বৎসর পরে 'মেঘদূত' প্রবন্ধে লিখিতে যাইয়া রবীন্দ্রনাথ 'দুহুঁ কোলে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া' পদাংশ তুলিয়া এই চিরবিরহেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

১২৯৫ সালে 'মায়ার খেলায়' কবি এমন অনেকগুলি গান লিখিলেন যাহার ভাব পদাবলীর সঙ্গে অনেকটা মেলে। কৃষ্ণ যখন রাধার মান ভাঙ্গাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াও সফল হইলেন না, তখন অগত্যা তিনি চলিয়া গেলেন। রাধার মনে পরে অনুশোচনা জাগিল। তিনি কানুর সহিত মিলন ঘটাইবার জন্য সখীকে অনুরোধ করিলেন। তখন গোবিন্দদাসের সখী বলিলেন—এখন কাতর নয়নে আমার পানে চাহিলে কি হইবে? (অব কাতর দিঠে মঝু মুখ চাই)

সুন্দরি তোহে সমুঝায়ব কোই।
অব রহু নিরজনে বন মাহা রোই॥

এই ভাবটি লইয়া মায়ার "খেলা"র

বিদায় করেছ যারে নয়ন জলে
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে।

গানটি লেখা। নারী সংকেতস্থানে যাইয়া বাসকসজ্জায় দয়িতের প্রতীক্ষা করে; 'সচলিত পত্রে পতিত পতত্রে' মনে করে এই বুঝি সে আসিল। রবীন্দ্রনাথ ইহার অপরদিক্‌টা বর্ণনা করিয়াছেন। অমর পুরুষ হইলেও তাহার মনে হয়

"কে আসিছে" বলে চমকিয়ে চাই
কাননে ডাকিলে পাখি।

চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—"সুখের লাগিয়া যে করে পিরিতি, দুখ যায় তার ঠাঞি" মায়াকুমারীদের গানে এই পদের অভিনব ব্যাখ্যা পাই—

এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না
শুধু সুখ চলে যায়, এমনি মায়ার ছলনা।

১২৯৫ সালের ২১শে বৈশাখে লেখা 'মানসী'র অন্তর্গত 'একাল ও সেকাল' কবিতায় দেখি এক মেঘে-ঢাকা দ্বিপ্রহরে কবির মনে জাগিতেছে পাগলিনী রাধিকার দিবা-অভিসারের কথা। গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন—

গগনহি নিমগন দিনমণি কাঁতি।
লখই না পারিয়ে কিয়ে দিন রাতি॥
ঐছন জলদ কয়ল আন্ধিয়ার।
নিয়ড়হি কোই লখই নাহি পার॥
চলু গজ-গামিনি হরি-অভিসার।
গমন নিরংকুশ আরতি বিথার॥

সূর্যের দীপ্তি আকাশেই নিমগ্ন হইয়াছে, রাত্রি কি দিন বুঝা যাইতেছে না, মেঘে এমন আঁধার করিয়াছে; কাছের লোককেই দেখা যাইতেছে না। এমন সময়ে হৃদয়ের আর্তিবশে রাধা বিনা বাধায় হরির অভিসারে চলিলেন। এই পদটিই রবীন্দ্রনাথের মনে রাধার দিবা-অভিসারের কথা জাগাইয়া দিয়াছিল। সেই অভিসারের দিনটি একটি ঐতিহাসিক দিন মাত্র নহে—একবার আসিয়াই চিরতরে চলিয়া যায় নাই। যেমন বৃন্দাবনদাস বলিয়াছেন—

অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়॥

তেমনি রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন সেই বৃন্দাবনের লীলা নিত্যকালে বিধৃত রহিয়াছে—এখনো উহা ঘটিতেছে—কোন কোন ভাগ্যবান্ উহা দেখিতে পাইতেছেন।

আজো আছে বৃন্দাবন মানবের মনে।
শরতের পূর্ণিমায়
শ্রাবণের বরিষায়
উঠে বিরহের গাথা বনে উপবনে।

এখনো সে বাঁশি বাজে যমুনার তীরে।
এখনো প্রেমের খেলা,
সারা দিন, সারা বেলা
এখনো কাঁদিছে রাধা হৃদয়-কুটিরে।

১২৯৬ সালে "রাজা ও রাণী" নাটকে ইলার সখীরা পদাবলীর ভাষায় গাহিয়াছে—

ঐ বুঝি বাঁশি বাজে
বনমাঝে, কি মনমাঝে?

বৃন্দাবনে যখন বাঁশি বাজিয়াছিল, তখন অবশ্য কোন গোপীরই মনে এ প্রশ্ন জাগে নাই, কেহই ভাবে নাই যে এ বাঁশি বুঝি তাহার মনের মধ্যেই বাজিতেছে! আমাদেরই মনে নানারূপ ভাবনা ও সন্দেহ জাগে, যাই কি না যাই এই দ্বিধায় পড়ি। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

যাব কি যাব না মিছে এ ভাবনা মিছে মরি লোক লাজে।
কে জানে কোথা সে বিরহ-হুতাশে ফিরে অভিসার সাজে।

বাঁশির ডাকে সাড়া না দিলেই নয়, কেননা যে বাঁশি বাজাইতেছে সে যে বিরহে ব্যাকুল হইয়া কোথায় যেন অভিসারের বেশে সাজিয়া অপেক্ষা করিতেছে। সুতরাং লোকলজ্জার ভয়ে পিছপাও হইলে চলিবে না।

শ্রীচৈতন্য লিখিয়াছেন যে—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টুমাম্
অদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা।
যথাতথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

ইহার ভাবার্থ লইয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছেন—

আমি কৃষ্ণপদ-দাসী তিঁহ রসসুখরাশি
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাথ।
কিবা না দেন দরশন জারে আমার তনুমন
তবু তেঁহ মোর প্রাণনাথ।
সখি হে, শুন মোর মনের নিশ্চয়।
কিবা অনুরাগ করে, কিবা দুঃখ দিয়া মারে
মোর প্রাণেশ কৃষ্ণ, অন্য নয়॥

'রাজা ও রাণীর ইলাও বলিয়াছেন—

ভুলে যদি
সুখী হয় সেই ভালো—ভালোবেসে যদি
সুখী হয় সেও ভালো।

রবীন্দ্রনাথ তাহার মুখে যে গানটি দিয়াছেন তাহাতেও এই ভাবটি ফুটিয়াছে।

আমি সারা নিশি তোমা লাগিয়া
রব বিরহ-শয়নে জাগিয়া.
তুমি নিমেষের তরে প্রভাতে
এসে মুখপানে চেয়ে হাসিয়ে।
তুমি চিরদিন মধু-পবনে
চির-বিকশিত বন-ভবনে
যেয়ো মনোমত পথ ধরিয়া
তুমি নিজ সুখস্রোতে ভাসিয়ে॥

ইলা সারারাত্রি জাগিয়া প্রিয়তমের আগমনের প্রতীক্ষা করিবেন; আর তাঁহার দয়িত যদি সারারাত্রি অন্যত্র অতিবাহিত করিয়া প্রভাতে এক নিমেষের জন্য আসেন তাহা হইলেই তিনি সুখী হইবেন। এটিও খণ্ডিতা নায়িকার ভাব লইয়া লেখা, তবে খণ্ডিতা এখানে গোবিন্দদাস কথিত "রোষে ত্রিণয়না চণ্ডী" হন নাই।

এই যুগের কয়েকটি গান পুরোপুরি মহাজন-পদাবলীর ছাঁচে ঢালা। পদাবলী-সাহিত্যে চোখে দেখার আগে বংশীধ্বনি শুনিয়া, অথবা লোকের মুখে গুণ শুনিয়া রাধার মনে ভালবাসা জাগার কথা আছে। শ্রীরূপ গোস্বামীর বিদগ্ধমাধবের অনুসরণ করিয়া রচিত যদুনন্দন দাসের একটি পদে আছে—

রাই কহে কেবা হেন মুরলী বাজায় যেন
বিষামৃতে একত্র করিয়া।
জল নহে হিমে জনু কাঁপাইছে সব তনু
প্রতি-তনু শীতল করিয়া॥ (পদকল্পতরু ২৪২)

এই ভাবটিই রবীন্দ্রনাথের সুপ্রসিদ্ধ গানে পাই—

এখনো তারে চোখে দেখিনি
শুধু বাঁশী শুনেছি,
মন প্রাণ যাহা ছিল দিয়ে ফেলেছি।
শুনেছি মুরতি কালো
তারে না দেখাই ভালো
সখি বল, আমি জল আনিতে যমুনায় যাব কি!

এখানেও সাক্ষাৎ দর্শনের পূর্বে শ্রীরূপের আলঙ্কারিক রীতি অনুসারে স্বপ্নে দর্শনের ফলে অনুরাগ জন্মিয়াছে—

শুধু স্বপনে এসেছিল সে
নয়ন কোণে হেসেছিল সে।

আর একটি গানে মুগ্ধা, অনভিজ্ঞা নায়িকা বলিতেছেন—

সখি ভালবাসা কারে কয়?
সে কি কেবলি যাতনাময়?

তাহে কেবলি চোখের জল?
তাহে কেবলি দুখের শ্বাস?
লোকে তবে করে কি সুখের তরে
এমন দুখের আশ?

এই প্রশ্নের উত্তর রবীন্দ্রনাথ নিজেই "চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি" প্রবন্ধে দিয়াছেন—

"চণ্ডীদাস শতবার করিয়া বলিতেছেন, যার যত জ্বালা তার ততই পিরীতি।" "সদা জ্বালা যার, তবে সে তাহার মিলয়ে পিরীতিধন," "অধিক জ্বালা যার তার অধিক পিরীতি।" ইত্যাদি। কিন্তু সেই চণ্ডীদাস আবার কহিয়াছেন,

সই পিরীতি না জানে যারা
এ তিন ভুবনে জনমে জনমে
কি সুখ জানয়ে তারা?

শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে আবার গোকুলে ফিরিয়া আসিবেন শুনিয়া গোপীদের সমৃদ্ধিমান সম্ভোগের একটি গানও রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

আজ আস্‌বে শ্যাম গোকুলে ফিরে।
আবার বাজবে বাঁশী যমুনাতীরে।

কৃষ্ণ ফিরিয়া আসিবেন, আবার বাঁশী বাজাইয়া যমুনাতীরে তাহাদের ডাকিবেন, এই কথা ভাবিয়া গোপীরা এমনই বিহ্বল হইয়াছেন যে তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন না যে

বাঁচব কি মরব সুখে?
কি ভাবে বলব?
কথা কি রবে মুখে?
শুধু তার মুখপানে চেয়ে চেয়ে দাঁড়ায়ে
ভাস্‌ব নয়ন নীরে॥

গোপীদের এমন ব্যাকুলতার কথা কোন প্রাচীন পদাবলীতে নাই। অর্ধস্ফুট দুই একটি কথার মধ্যে কি অসীম ভাবব্যঞ্জনা।

১৩০১ সাল হইতে রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিতে জীবনদেবতার আবির্ভাব। ইহার পর আর প্রত্যক্ষভাবে বৃন্দাবনের পটভূমিকায় গান বা কবিতা রবীন্দ্রনাথ বড়ো একটা লেখেন নাই। ১৩০২ সালে লিখিত 'আবেদন' কবিতার ভাবের সঙ্গে নরোত্তমদাস বর্ণিত মঞ্জরীভাবের সেবা অভিলাষের কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। নরোত্তমদাস শ্রীরাধাকে বলিতেছেন—

প্রাণেশ্বরি কবে মোর হবে কৃপা দিঠি।
আজ্ঞায় আনিব কবে চম্পক-কুসুমবর
শুনব বচন আধ মিঠি। (পদকল্পতরু ৩০৬৮)

এখানে অবশ্য প্রাণেশ্বরী শব্দের অর্থ প্রিয়া নহে, কিন্তু প্রাণের ঈশ্বরী। তাঁহার

অন্য একটি পদে (পদকল্পতরু ৩০৬৬) পাওয়া যায়—

নবরঙ্গ জাদ আনি বান্ধিব বিচিত্র বেণী
তাহে ফুল মালতী গাঁথিয়া।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ভৃত্য রাণীকে আবেদন জানাইতেছে যে সেবা ছাড়া আর অন্য কোন পুরস্কার সে চাহে না—

প্রত্যহ প্রভাতে
ফুলের কঙ্কণ গড়ি কমলের পাতে
আনিব যখন, পদ্মের কলিকাসম।
ক্ষুদ্র তব মুষ্টিখানি করে ধরি মম
আপনি পরায়ে দিব, এই পুরস্কার।
অশোকের কিশলয়ে গাঁথি দিব হার,
প্রতি সন্ধ্যাবেলা, অশোকের রক্তকান্তে
চিত্রি পদতল, চরণ-অঙ্গুলিপ্রান্তে
লেশমাত্র রেণু চুম্বিয়া মুছিয়া লব
এই পুরস্কার।

১৩০৪ সালে লিখিত 'স্পর্ধা' (কল্পনা) কবিতার সঙ্গে শ্রীরাধার রসোদ্গারের পদাবলীর কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। নায়িকা মিথ্যা কোপ দেখাইয়া নায়ককে "যাও," "সরো," 'আহা কী কর' প্রভৃতি বলিলেও নায়ক সরিল না—

শ্রুতিমূলে মুখ আনিল সে মিছিমিছি
নয়ন বাঁকায়ে কহিনু তাহারে, ছি ছি'
সখী ওলো সখী, কহিনু শপথ ক'রে
তবু সে গেল না সরে।

নায়ক শেষ পর্যন্ত নিজের মালাটি নায়িকার গলায় পরাইয়া দিল এবং নিজে নায়িকার মালাটি গলায় পরিল। এমন যে নায়ক সে কেন ফিরিয়া আসিল না, তাই নায়িকা আঁখিনীরে ভাসিয়া ভাসিয়া চিন্তা করিতেছে। ইহার প্রথমাংশের সঙ্গে জ্ঞানদাসের

যব কানু আওল মন্দির মাঝে।
আঁচরে বদন ঝাঁপায়লু লাজে॥
করে কর বারি ফুয়ল চির মোর।
পিয়া বড় ঢিঠ কর রাখল আগোর॥ (পদকল্পতরু ৭০০)

এই পদটি তুলনীয়। শেষাংশের সহিত গোবিন্দদাসের "এই ত মাধবীতলে আমার লাগিয়া পিয়া" ইত্যাদি পদের (পদকল্পতরু ১৬৭৩)—

আমারে লইয়া কোরে অনিমিখে মুখ হেরে
যামিনী জাগিয়া পোহায়
সে হেন গুণের পিয়া কোনখানে কার সনে
কৈছনে দিবস গোঙায়॥

তুলনা করা যায়।

১৩০৪ সালেরই লেখা "কল্পনা"র 'লজ্জিতা' কবিতাটিকে কুঞ্জভঙ্গের পদ বলা যাইতে পারে।

যামিনী না যেতে জাগালে না কেন
বেলা হল মরি লাজে।
শরমে জড়িত চরণে কেমনে
চলিব পথের মাঝে॥

এই কবিতায় নায়িকা বলিতেছেন—

আমি এ আকুল কবরী আবরি
কেমনে যাইব কাজে।

বসু রামানন্দের নিম্নলিখিত পদের ছায়া লইয়া এটি রচিত মনে হয়।

প্রাণনাথ কি আজু হইল।
কেমনে যাইব ঘরে নিশি পোহাইল॥
মৃগমদচন্দন বেশ গেল দূর।
নয়ানের কাজর গেল সিঁথার সিন্দূর॥ (পদকল্পতরু ৬৫৯)

১৩০৭ সালে প্রকাশিত "ক্ষণিকা"র 'জন্মান্তর' কবিতায় দেখি কবি নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব সাধকের মতন প্রার্থনা করিতেছেন যেন পরজন্মে তিনি ব্রজের রাখাল বালক হইতে পারেন। ব্রজের সরল সুন্দর জীবন, অকৃত্রিম সখ্য ও মাধুর্যময় পরিবেশ কবিকে মুগ্ধ করে।

আমি নাই বা গেলাম বিলাত,
নাই বা পেলাম রাজার খিলাত,
যদি পরজন্মে পাই রে হতে
ব্রজের রাখাল বালক।
তবে নিবিয়ে দেব নিজের ঘরে
সুসভ্যতার আলোক।

ব্রজের কোন্ কোন্ ভাব, কোন্ কোন্ ছবি তাঁহার কাম্য তাহার উদাহরণ স্বরূপ কবি তিনটি দৃশ্যের কথা বলিয়াছেন—(১) ব্রজের রাখালেরা বংশীবটের তলায় ধেনু চরায়, গুঞ্জাফুলের মালা গাঁথিয়া পরস্পরের গলায় দেয়, শ্যামের বাঁশী শোনে এবং যমুনার শীতল কালো জলে অবগাহন করে। (২) সকালে পরস্পরকে জাগাইয়া দেয়, আর ব্রজবধূরা দুধ দোহায় (৩) বর্ষার দিনে গোপাঙ্গনারা কৃষ্ণের নৌকায় চড়িয়া ভয়ে কাঁপিতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ পদরত্নাবলীতে নৌকাখণ্ডের কোন পদ তুলেন নাই; সেটি যে কেবল গ্রন্থের আকার পরিমিত রাখিবার জন্য, নৌকাবিলাস লীলার প্রতি অনাদরবশে নহে, তাহা ঐ কবিতার নিম্নলিখিত অংশ পড়িলে বুঝা যায়—

ওরে শাওন মেঘের ছায়া পড়ে
কালো তমাল মূলে,
ওরে এপার ওপার আঁধার হল
কালিন্দীর কূলে।
ঘাটে গোপাঙ্গনা ডরে
কাঁপে খেয়া তরীর পরে
হেরো কুঞ্জবনে নাচে ময়ূর
কলাপখানি তুলে।
ওরে শাওন মেঘের ছায়া পড়ে
কালো তমাল মূলে।

১৩০১ সালে লিখিত 'চিত্রার' অন্তর্গত 'অন্তর্যামী' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ জীবন- "কৌতুকময়ী", "দেবী", "প্রিয়ে", "মায়াবিনী" প্রভৃতি আখ্যায় সম্বোধন ।। আবার তাঁহাকে "রূপময়" এবং "নির্দয়"ও বলিয়াছেন—

যদি কৌতুক রাখ চিরদিন
ওগো কৌতুকময়ী,
যদি অন্তরে লুকায়ে বসিয়া
হবে অন্তরজয়ী,
তবে তাই হক! দেবী অহরহ
জনমে জনমে রহ তবে রহ
নিত্য মিলনে নিত্য বিরহ
জীবনে জাগাও প্রিয়ে।
নব নব রূপে ওগো রূপময়
লুণ্ঠিয়া লহ আমার হৃদয়
কাঁদাও আমারে, ওগো নির্দয়
চঞ্চল প্রেম দিয়ে।

১৩০২ সালের ফাল্গুণ মাসে রবীন্দ্রনাথ 'জীবনদেবতা' নামে যে কবিতা লেখেন তাহাতে জীবনদেবতাকে "অন্তরতম" "জীবননাথ" "প্রাণেশ" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। কবি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

শিথিল হয়েছে বাহুবন্ধন,
মদিরা বিহীন মম চুম্বন,
জীবনকুঞ্জে অভিসার-নিশা
আজি কি হয়েছে ভোর?

কবিতার শেষভাগে তিনি প্রার্থনা জানাইতেছেন—

নূতন করিয়া লহ আরবার
চির-পুরাতন মোরে।

নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায়
নবীন জীবন ডোরে।

ইহা লিখিবার তিন সপ্তাহ পরে রবীন্দ্রনাথ 'সিন্ধুপারে' কবিতায় পুনরায় জীবনদেবতাকে নারীরূপে অংকন করিয়াছেন। "পউষ প্রখর" রাত্রিকালে এই নারী আসিয়া কবিকে এক নূতন দেশে লইয়া গেলেন; সেখানে কবির সংগে তাঁহার বিবাহ হইল; কবি কিন্তু এপর্যন্ত তাঁহার মুখ দেখেন নাই। নারী যখন তাঁহার অবগুন্ঠন সরাইয়া তাঁহাকে মুখ দেখাইলেন তখন--

চকিত নয়ানে হেরি মুখপানে পড়িনু চরণতলে
"এখানেও তুমি জীবনদেবতা! কহিনু নয়নজলে।
সেই মধুমুখ, সেই মৃদুহাসি, সেই সুধাভরা আঁখি।
চিরদিন মোরে হাসাল কাঁদাল, চিরদিন দিল ফাঁকি॥

কবির জীবনদেবতা নররূপেই হউক আর নারীরূপেই হউক আবির্ভূত হইয়া কবির সংগে মধুর প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন করিতেছেন। প্রথম প্রথম তাঁহাকে প্রিয়া-রূপে উপলব্ধি করিলেও, রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত বৈষ্ণব সাধকের ন্যায় নিজেকেই তাঁহার প্রেম-পাত্রীরূপে দেখিয়াছেন। চৈতন্যোত্তর পদাবলীতে পদকর্তারা শ্রীরাধার সখীর অনুগতা মঞ্জরীরূপে নিজেকে অংকন করিয়াছেন।

জীবনদেবতাবাদ লইয়া বড় বড় সাহিত্যিক ও দার্শনিকেরা অনেক কিছু লিখিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য যেমন সার্বভৌমকে বলিয়াছিলেন বেদান্তসূত্র বুঝা সহজ কিন্তু শংকর ভাষ্য বুঝা যায় না, আমরাও তেমনি বলি কবির নিজের কথা বরং কিছু বুঝি, কিন্তু তাঁহার ভাষ্যকারদের ব্যাখ্যা বুঝিতে প্রাণান্ত হয়। কবি জীবনদেবতার সবচেয়ে সরল ও সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন ১৩১১ সালে প্রকাশিত "বংগভাষার লেখক" গ্রন্থে আত্মজীবনীতে।* রবীন্দ্রনাথ

এ কি কৌতুক নিত্য নূতন
ওগো কৌতুকময়ি!

ইত্যাদি 'অন্তর্যামী" কবিতার প্রথম অংশ উদ্ধৃত করিয়া লিখেন--

* বংগবাসীর সহকারী সম্পাদক হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ১৩১১ সালের ভাদ্র মাসে বংগবাসী কার্যালয় হইতে এই গ্রন্থগুলি সংকলন ও সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। সে সময়ে রবীন্দ্রনাথের বয়স ৪৩ বৎসর ৪ মাস। গীতাঞ্জলি তখনও লেখা হয় নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বনফুল হইতে আরম্ভ করিয়া উৎসর্গ পর্যন্ত ২২ খানি কাব্য, ১৫ খানি নাটক, ৭ খানি উপন্যাস, ও বহুসংখ্যক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও বংগবাসীর প্রাচীনপন্থী সাহিত্যিকেরা রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ বসু, রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতির জীবনী প্রথমে সন্নিবিষ্ট করিয়া কালনার এক ভিক্ষুক গায়ক কাণা চন্ডীর জীবনী দেন, এবং তাহার অব্যবহিত পরে রবীন্দ্রনাথের জীবনী দেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথের পরে হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরীর জীবনী আছে।

"এই যে কবি, যিনি আমার সমস্ত ভালমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি "জীবনদেবতা" নাম দিয়াছি। তিনি যে কেবল আমার এই ইহজীবনের সমস্ত খণ্ডতাকে ঐক্যদান করিয়া, বিশ্বের সহিত তাহার সামঞ্জস্যস্থাপন করিতেছেন, আমি তাহা মনে করি না—আমি জানি, অনাদিকাল হইতে বিচিত্র বিস্মৃত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে আমার এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন; সেই বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অস্তিত্বধারার বৃহৎস্মৃতি তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমার অগোচরে আমার মধ্যে রহিয়াছে। সেইজন্য এই জগতের তরুলতা পশু-পক্ষীর সংগে এমন একটা পুরাতন ঐক্য অনুভব করিতে পারি—সেইজন্য এত-বড় রহস্যময় প্রকাণ্ড জগৎকে অনাত্মীয় ও ভীষণ বলিয়া মনে হয় না।" যিনি চর ও অচর সকল বস্তুর মধ্যে বিরাজমান, যিনি ব্যক্তির জীবনকে খণ্ডতার ভিতর দিয়া পূর্ণতার অভিমুখে লইয়া যাইতেছেন, তাঁহাকে রবীন্দ্রনাথ কবি বলিয়াছেন; আর নিজে তিনি শুধু সেই কবির হাতের যন্ত্র মাত্র। ইঁহাকে কেহ রসস্বরূপ বলেন, কেহ প্রিয় বলিয়া সম্বোধন করেন, কেহ শান্তরূপিণী বলেন, কেহ জননী বলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে প্রথমে প্রিয়া বলিয়া সম্বোধন করিয়া নিজের মৌলিকতা দেখাইলেও পরে তাঁহাকে প্রিয়তমই বলিয়াছেন। ঐ আত্মজীবনীতেই রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"জগতের সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া, প্রিয়জনের মাধুর্যের মধ্য দিয়া ভগবানই আমাদিগকে টানিতেছেন—আর কাহারো টানিবার ক্ষমতা নাই। পৃথিবীর প্রেমের মধ্য দিয়াই সেই ভূমানন্দের পরিচয় পাওয়া, জগতের এই রূপের মধ্যেই সেই অরূপকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা, ইহাকে ত আমি মুক্তির সাধনা বলি। জগতের মধ্যে আমি মুগ্ধ, সেই মোহেই আমার মুক্তিরসের আস্বাদন। "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।"

জীবনদেবতার এই ধারণা ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার ইতিহাসে অনন্যসাধারণ। প্রচলিত দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, ভেদাভেদবাদ প্রভৃতি অধ্যাত্মগীর মতবাদের কোন গণ্ডীর মধ্যে ইহাকে ফেলা যায় না। সহজিয়া বৈষ্ণবদের মতন কবি ১৩০৬ সালে "ক্ষণিকা"র 'প্রতিজ্ঞা' কবিতায় বলিয়াছেন--

আমি ত্যাজিব না ঘর হব না বাহির
উদাসীন সন্ন্যাসী,
যদি ঘরের বাহিরে না হাসে কেহই
ভুবন-ভুলানো হাসি।
যদি না উড়ে নীলাঞ্চল
মধুর বাতাসে বিচঞ্চল,
যদি না বাজে কাঁকন মল
রিনিকঝিনি
আমি হব না তাপস, হব না, যদি না
পাই গো তপস্বিনী।

কিন্তু ইহাকেই রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম অনুভূতির চরম কথা বলিয়া কখনই গ্রহণ করা যায় না। ১৩০৮ সালে "নৈবেদ্য"র বহুস্থানে তিনি বলিয়াছেন—

যদি কোনদিন তোমার আসনে
আর কাহারেও বসাই যতনে,
চির-দিবসের হে রাজা আমার
ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু। (৫)

যিনি জীবনদেবতার চরণে নিজেকে সমর্পণ করিয়াছেন, যিনি সেই প্রিয়তমকেই চাহেন, আর কিছু চাহেন না, তাঁহার পক্ষে দীর্ঘকাল অন্য কিছু লইয়া ভুলিয়া থাকা সম্ভব নহে। ভুল-ত্রুটি, পতন-বিচ্যুতি ঘটা বিচিত্র নহে, কিন্তু ভুলকে ভুল বলিয়া বুঝিয়া ভগবানের প্রিয়নাম জপ করিতে করিতে কবি প্রার্থনা করেন—

ডাকি তব নাম শুষ্ক কণ্ঠে
আশা করি প্রাণপণে
নিবিড় প্রেমের সরস বরষা
যদি নেমে আসে মনে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নাম-জপের সংগে বৈষ্ণবের নাম জপের তফাৎ আছে। বৈষ্ণব শ্রীচৈতন্যের আদর্শ সামনে রাখিয়া যখন নাম জপ করেন তখন তাঁহার নয়ন দিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়, কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়, দেহের প্রতি রোমকূপে শিহরণ জাগে, উপাস্যদেবতার কথা ছাড়া আর কিছুই তাঁহার মনের কোণে স্থান পায় না। রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা বলেন যে তুমি 'আপনার সব দ্বার খোলা' রাখিয়াছিলে বলিয়া বিশ্ব তাহার সব কিছু ভালোমন্দ, গীতগন্ধ লইয়া তোমার মনে পড়িয়াছিল—

সেই সাথে তোর মুক্ত বাতায়নে আমি
অজ্ঞাতে অসংখ্য বার এসেছিনু নামি।
দ্বার রুধি জপিতিস যদি মোর নাম
কোন পথ দিয়ে তোর চিত্তে পশিতাম।" (নৈবেদ্য ৩২)

ইন্দ্রিয়ের সমস্তদ্বার খোলা রাখিলে কখনও কখনও তাঁহার দেখা পাওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু চিত্তে তাঁহার স্থায়ী আসন পড়ে না। কিন্তু নিজের জোরে, সাধনার বলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না, তিনি যাহাকে কৃপা করিয়া বরণ করিয়া লন সেই তাঁহাকে পায়। রবীন্দ্রনাথকে তিনি বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, তাই তিনি গাহিয়াছেন,—

হৃদয় যাহার শতখানে ছিল
শত স্বার্থের সাধনে,
তাহারে কেমনে কুড়ায়ে আনিলে,
বাঁধিলে ভক্তি বাঁধনে। (পূর্ণকাম, কল্পনা)

১৩০৮ সালে 'নৈবেদ্য' কাব্যে রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত বৈষ্ণব সাধনার সংগে তাঁহার পার্থক্য কোথায় তাহা সর্বপ্রথমে দেখান। তিনি শান্তরসের উপাসক, সেইজন্য

কীর্তনগানের মাতামাতিকে তিনি ভগবৎসাধনার শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই।—

যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে,
মুহূর্তে বিহ্বল হয় নৃত্যগীতগানে
ভাবোন্মাদ-মত্ততায়, সেই জ্ঞানহারা
উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছল-ফেন ভক্তি-মদ-ধারা
নাহি চাহি নাথ। (নৈবেদ্য ৪৫)

অন্য একটি কবিতাতেও (নৈবেদ্য ৫২) তিনি 'ভাবাবেশ ভরে রসপানে হতজ্ঞান' ভক্তদের প্রতি অনুকম্পা দেখাইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সাধনায় সুকঠোর চিত্তসংযমের ব্যবস্থা আছে। শ্রীচৈতন্য তাঁহার ভক্তদিগকে প্রত্যহ অন্ততঃ লক্ষ নাম জপ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। লক্ষ নাম জপের সময়ে চিত্তের অখণ্ড একাগ্রতা প্রয়োজন। সাধক জপের সময় উপলব্ধি করেন যে নাম ও নামী এক। ব্রজের বৈষ্ণবগণ যে ভাবে সাধনা করেন তাহা রবীন্দ্রনাথ দেখেন নাই। তিনি কুষ্টিয়া অঞ্চলের বাউলদের ও রাঢ়ে সংযোগী বৈষ্ণবদের সংসর্গে যতটা আসিয়াছিলেন, শ্রীরূপ গোস্বামীর ভজনপ্রণালী অনুসরণকারী বৈষ্ণবদের সংস্পর্শে ততটা আসেন নাই।

সপ্তম অধ্যায়

গীতাঞ্জলি-গীতালিতে পদাবলীর অপ্রত্যক্ষ প্রভাব

গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালির যুগে (১৩১৩—১৩২১) রবীন্দ্রনাথের এক অভিনব প্রকাশ দেখিতে পাই। এই যুগের রচনার সহিত যেমন তাঁহার আগেকার তেমনি তাঁহার পরবর্তী রচনার কতকগুলি মূলগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত এই সময়ের ভাষা, সহজ, সরল, অনাড়ম্বর, অলঙ্কারবিহীন প্রাণের ভাষা। কবির অন্তরের অন্তস্থল হইতে উৎসারিত হইয়া ইহা শ্রোতার হৃদয়কে গভীরভাবে নাড়া দেয়। এই ভাষার সহিত তুলনা করা যায় শুধু নরহরি সরকার, গোবিন্দ আচার্য, গোবিন্দ ঘোষ, দ্বিজ বলরাম দাস, বংশীবদন প্রভৃতি শ্রীগৌরাঙ্গের সহচরদের ভাষা। গোবিন্দদাস কবিরাজের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়াও নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় কৃত্রিম আলংকারিক ভাষা ছাড়িয়া সরল প্রাণস্পর্শী ভাষাতেই তাঁহার প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা লিখিয়াছেন। এই দুইখানি গ্রন্থে যেমন দৈন্য প্রকাশ করা হইয়াছে, অকপট অন্তরে ভগবৎকৃপা লাভের জন্য প্রার্থনা জানানো হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলিতেও সেইরূপ ভাবের প্রকাশ দেখা যায়। প্রাক্-গীতাঞ্জলি যুগে অথবা গীতালির পরের যুগে রবীন্দ্র সাহিত্যে এরূপ নম্রতার ভাব পাওয়া যায় না। এই নম্রতা কি ধরণের ভাব তাহা রবীন্দ্রনাথ ১৩১৭ সালে "রসের-ধর্ম" নামক "শান্তিনিকেতনে"র (১১) ভাষণে বলিয়াছেন—"ধর্মসাধনার যেখানে উৎকর্ষ সেখানে গতির বাধাহীনতা, ভাবের বৈচিত্র্য, এবং অক্ষুণ্ণ মাধুর্যের নিত্য বিকাশ। নম্রতা নইলে এই জিনিসটাকে পাওয়া যায় না। কিন্তু নম্রতা মানে শিক্ষিত বিনয় নয়। অর্থাৎ কঠিন লোহাকে পুড়িয়ে পিটিয়ে তাকে ইস্পাতরূপে যে খরধার নমণীয়তা দেওয়া যায় এ সে জিনিস নয়। সরস সজীব তরু শাখার যে নম্রতা—যে নম্রতার মধ্যে ফুল ফুটে ওঠে, দক্ষিণের বাতাস নৃত্যের আন্দোলন বিস্তার করে, শ্রাবণের ধারা সংগীতে মুখরিত হয় এবং সূর্যের কিরণ ঝংকৃত সেতারের সুরগুলির মতো উৎক্ষিপ্ত হতে থাকে; চারিদিকের বিশ্বের নানা ছন্দ যে নম্রতার মধ্যে আপনার স্পন্দনকে বিচিত্র করে তোলে,' যে নম্রতা সহজভাবে সকলের সঙ্গে আপনার যোগ স্বীকার করে, সায় দেয়, সাড়া দেয়, আঘাতকে সংগীতে পরিণত করে এবং স্বাতন্ত্র্যকে সৌন্দর্যের দ্বারা সকলের আপন করে তোলে। এক কথায় বলতে গেলে এই নম্রতাটি রসের নম্রতা—শিক্ষার নম্রতা নয়। এই নম্রতা শুষ্ক সংযমের বোঝায় নত নয়, সরস প্রাচুর্যের দ্বারাই নত; প্রেমভক্তিতে আনন্দে পরিপূর্ণতায় নত।"

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় নরোত্তমঠাকুর মহাশয় নিজের দৈন্য জানাইয়া বলিয়াছেন—

যাবত জনম মোর অপরাধে হৈল ভোর
নিষ্কপটে না ভজিনু তোমা।
তথাপি তুমি সে গতি না ছাড়িহ প্রাণপতি
আমা সম নাহিক অধমা ॥
পতিত-পাবন নাম ঘোষণা তোমার শ্যাম
উপেখিলে নাহি মোর গতি
যদি হই অপরাধী তথাপিহ তুমি গতি
সত্য সত্য যেন সতীপতি॥
তুমি ত পরম দেবা নাহি মোরে উপেখিবা
শুন শুন প্রাণের ঈশ্বর।
যদি করি অপরাধ তথাপিও তুমি নাথ
সেবা দিয়া কর অনুচর ॥

এই ভাব ও ভাষাই যেন আমরা রবীন্দ্রনাথের "গীতিমাল্যে" (সংযোজন ৬) শুনিতে পাই—

আমি অধম অবিশ্বাসী
এ পাপমুখে সাজে না যে
তোমায় আমি ভালোবাসি।
গুণের অভিমানে মেতে
আর চাহি না আদর পেতে
কঠিন ধুলায় বসে এবার
চরণ সেবার অভিলাষী ॥

নরোত্তমঠাকুর মহাশয় যেমন পরমপ্রেমিকভক্ত হইয়াও নিজেকে পতিত অধম বলিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথও তেমনি ভগবৎপ্রেমের উপলব্ধির পথে দাঁড়াইয়া যেন বোধ করিয়াছেন তাঁহার জীবনে অশেষ গ্লানি, অনেক মলিনতা আছে। তাই তিনি করুণভাবে প্রার্থনা জানাইতেছেন—

দয়া দিয়ে হবে গো মোর
জীবন ধুতে।
নইলে কি আর পারব তোমার
চরণ ছুঁতে।
তোমায় দিতে পূজার ডালি
বেরিয়ে পড়ে সকল কালি,
পরাণ আমার পারি নে তাই
পায়ে থুতে। (গীতাঞ্জলি ৭৫)

গীতাঞ্জলিযুগের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে রবীন্দ্রনাথ বৃন্দাবনের পরিবেশের কোন ইঙ্গিত এই কাব্যত্রয়ে দেন নাই। রাধা-কৃষ্ণের নাম দূরে থাকুক, কোথাও

যমুনা, কদম্বতলা প্রভৃতি বৃন্দাবনলীলার উদ্দীপক কোন শব্দও তিনি ব্যবহার করেন নাই। বৈষ্ণব পদাবলীর সাধনার মর্মকথা তাঁহার মনের মধ্যে এমন ভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে বাহিরের কোন প্রতীক্ দিয়া আর তাহা প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হয় না। এ যুগের রচনায় বৈষ্ণব পদাবলীর প্রত্যক্ষ প্রভাব না থাকিলেও, অপ্রত্যক্ষ প্রভাবের নিদর্শন পাওয়া যায় ভগবানকে লইয়া অনুরাগ, অভিসার, মিলন-বিরহের কবিতাগুলিতে। আর তাহার চেয়েও বেশী প্রভাব দেখা যায় নামের মাধুর্য ঘোষণায় ও ব্রজের ভাব প্রাপ্তির লালসায়।

কবি ১৩২০ সালের ভাদ্রমাসে লণ্ডনে বসিয়া নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবের মতন গাহিয়াছেন—

তোমারি নাম বলব নানা ছলে।
বলব একা বসে, আপন
মনের ছায়া তলে।
বলব বিনা ভাষায়
বলব বিনা আশায়
বলব মুখের হাসি দিয়ে
বলব চোখের জলে।
বিনা-প্রয়োজনের ডাকে
ডাকব তোমার নাম,
সেই ডাকে মোর শুধু শুধুই
পুরবে মনস্কাম। (গীতিমাল্য, ৩২)

এই যে প্রভুর, প্রিয়তমের নাম করা, এর ভিতর কোন বিপদ হইতে রক্ষা করিবার বা কোন কামনা বাসনা পূর্ণ করাইবার জন্য প্রার্থনা নাই--এ শুধু ভালবাসিয়া ডাকা; কোন প্রয়োজনের তাগিদে ডাকা নহে। সেই প্রিয়তমের নামটি কানে শুনিতে ভাল লাগিয়াছে বলিয়া ডাকা। নাম করিতে করিতে কখনও বা মিলনের নিবিড় অনুভূতিতে মুখে হাসি ফুটিয়া উঠে; কখনও বা বিরহের সুতীব্র দুঃখে চোখদুটি জলে ভরিয়া যায়। এই নাম যে কেবল স্ফুট শব্দ করিয়াই করিতে হয় তাহা নহে—'বিনা ভাষায়', নীরবে মানস জপও করা যায়। শ্রীচৈতন্য বলিয়াছেন নাম করিতে করিতে যেন আনন্দের সমুদ্রে জোয়ার উঠে—'আনন্দাম্বুধিবর্ধনং', তাহার পদে পদে যেন পূর্ণ অমৃতের আস্বাদন। নাম করিতে করিতে নয়ন হইতে অশ্রুধারা বহিয়া যাইবে, বদনে আর বাক্যস্ফূর্তি হইবে না, কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইবে আর সমস্ত দেহ পুলকে রোমাঞ্চিত হইবে—

নয়নং গলদশ্রুধারয়া
বদনং গদগদরুদ্ধয়া গিরা,
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা
তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি।

এই ভাবেই অনুপ্রাণিত হইয়া শ্রীচৈতন্যোত্তর যুগের কবি দ্বিজ চণ্ডীদাস গাহিয়াছেন—

না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে। (পদকল্পতরু ১৪১)

লণ্ডন হইতে ফিরিয়া আসিয়া ১৩২০ সালের ২রা কার্তিক শান্তিনিকেতনে বসিয়া পুনরায় এই নামের মাধুর্যের কথা রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন (গীতিমাল্য ৪৪)। কবির যেন সকল কথা শুধু এক নামের ভিতর দিয়াই প্রকাশ পাইতে চায়, আর কিছুই বলিবার নাই—

আমার মুখের কথা তোমার
নাম দিয়ে দাও ধুয়ে।

গয়া হইতে অপূর্ব ভাবসম্পদ লইয়া যখন বিশ্বম্ভর মিশ্র নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিয়া ছাত্রদিগকে পড়াইতে গেলেন, তখন তিনি সকল প্রশ্নের উত্তরে কেবল কৃষ্ণ-নামই বলিতে লাগিলেন। ইহাই বোধ হয় নাম দিয়া মুখের কথা ধোয়াইয়া দিবার উদাহরণ। কবি প্রার্থনা করিয়াছেন যে তাঁহার দেহটিই যেন বীণা হইয়া আনন্দে প্রভুর নামের ঝঙ্কার তুলিতে থাকুক। যে সব বৈষ্ণব প্রত্যহ দুই তিন লক্ষ নাম করেন, তাঁহাদের দেখিয়াছি ঘুমের ঘোরেও জিহ্বা ও ওষ্ঠে নাম স্ফুরিত হয়। ঐরূপ অবস্থায়ই কি কবি চাহিয়াছেন এই বলিয়া—

ঘুমের 'পরে জেগে থাকুক
নামের তারা তব।

নাম করিতে করিতে হৃদয় নির্মল হয়, চিত্তরূপ দর্পণ মার্জিত হয় এবং সকল আকাঙ্খার মূল বিনষ্ট হয়, তাই রবীন্দ্রনাথ প্রার্থনা করিয়াছেন—

সব আকাঙ্খা আশায় তোমার
নামটি জ্বলুক শিখা।

গীতায় আছে যে ওঁ অক্ষররূপ ব্রহ্মকে উচ্চারণ করিতে করিতে ও ভগবানকে স্মরণ করিতে করিতে যে প্রাণত্যাগ করে সে পরমাগতি প্রাপ্ত হয়। সজ্ঞানে নাম করিতে করিতে দেহত্যাগ করা নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব মাত্রেরই সর্বশ্রেষ্ঠ অভিলাষ। রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন—

জীবনপদ্মে সংগোপনে
রবে নামের মধু,
তোমায় দিব মরণক্ষণে
তোমারি নাম বঁধু।

গীতাঞ্জলি-গীতালি যুগের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে এ যুগের কোন কবিতায় আর জীবনদেবতাকে প্রণয়িণীরূপে সম্বোধন নাই। সোনার তরীর 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় এবং 'চিত্রা'র 'কৌতুকময়ী' এবং 'সিন্ধুপারে' কবিতায় ঐরূপ সম্বোধন আছে।

উহাতে অভিনবত্ব আছে বটে, কিন্তু নারীর পক্ষে আত্মসমর্পণ যেমন পরিপূর্ণ হয়, ভালবাসাই তাহার জীবনের যেমন সত্ত্বা, পুরুষের পক্ষে তাহা নহে বলিয়া ভগবৎ-সাধনার ক্ষেত্রে একদিকে বৈষ্ণবেরা অন্যদিকে সুফিরা সাধকের নারীভাবই প্রশস্ত বলিয়াছেন। তাই গীতাঞ্জলিতে রবীন্দ্রনাথ ভগবানকে, নাথ, প্রভু,(১) প্রিয়(২) বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। এই সম্বোধন শুধু কথার কথা নহে। ইহার মধ্যে তাঁহার ভাব-বিবর্তনের ইতিহাস লুকাইয়া আছে। তিনি গোপীভাবে বিভাবিত হইয়া বলিতেছেন—

আমার নয়ন-ভুলানো এলে।
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে।

এ দেখা শুধু নয়ন মেলিয়া দেখা নয়, অন্তর দিয়া দেখা। বৃন্দাবনের শিখিপুচ্ছ ও গুঞ্জামালা না থাকিলেও রবীন্দ্রনাথের প্রিয়তম শরৎপ্রকৃতির অধীশ্বর রূপে নূতন শিশিরে ভেজা তৃণদল এবং রাশি রাশি শিউলি ফুলের উপরে অরুণ-রাঙা চরণ ফেলিয়া আসিলেন। বৃন্দাবনের রাখাল কানাইয়ের মতনই তাঁহার চরণে নূপুর। সেই নূপুর রুণু ঝুণু বাজাইয়া যেন তিনি আসিতেছেন তাহা সাধক-কবি উপলব্ধি করিতেছেন।

কোথায় সোনার নূপুর বাজে,
বুঝি আমার হিয়ার মাঝে,
সকল ভাবে, সকল কাজে,
পাষাণ-গালা সুধা ঢেলে
নয়ন-ভুলানো এলে।

তাঁহাকে ভুলিয়া আমরা হৃদয়কে পাষাণ করিয়া ফেলিয়াছিলাম; সেই পাষাণকে নিমেষের মধ্যে গলাইতে পারে এমন সুধা বর্ষণ করিতে করিতে তাঁহার আবির্ভাব ঘটে।

যেমন শরতের প্রত্যুষে তাঁহাকে হৃদয়ের মাঝে পাওয়া যায়, তেমনি আবার বর্ষার ঘনঘটার মধ্যে তাঁহাকে পাইবার জন্য সমস্ত হৃদয় উন্মুখ হইয়া উঠে। বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের বর্ষা-অভিসারের পদে দেখি রাধিকাই তাঁহার প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য শত কষ্ট সহ্য করিয়া এমন কি জীবনকে তুচ্ছ করিয়া অভিসারে বাহির হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের অনুভূতিতে পাই যে বর্ষণ-মুখর অন্ধকার রাত্রিতে তিনি তাঁহার প্রিয়তমের জন্য দরজা খুলিয়া প্রতীক্ষা করিয়া আছেন, আর তাঁহাকে বিনতি জানাইতেছেন—

(১) প্রভু ও নাথ সম্বোধন গীতাঞ্জলির ২৪, ২৮, ৩০, ৪৩, ৫৮, ৬৬, ৭৩, ৭৯, ৮৬, ৯২, ১০১, ১৩৮, ১৪৪ এবং ১৪৮ সংখ্যক কবিতায় আছে।

(২) প্রিয় সম্বোধন গীতাঞ্জলির ১৭, ২০, ২১, ২৩, ৫২, ৫৫, ৫৭, ৯৪ এবং ১২১ সংখ্যক কবিতায় দেখা যায়।

হে একা সখা, হে প্রিয়তম,
রয়েছে খোলা এ ঘর মম
সম্মুখ দিয়ে স্বপনসম
যেয়ো না মোরে হেলায় ঠেলে। (গীতাঞ্জলি ১৮)

কৃষ্ণকর্ণামৃতে যে অর্থে ভুবনৈকবন্ধো বলিয়া কৃষ্ণকে ডাকা হইয়াছে সেই অর্থে রবীন্দ্রনাথ 'একা সখা' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহার অর্থ তুমিই একমাত্র সখা, তোমা ছাড়া আর কোন বন্ধু নাই।

ভারতবর্ষের একান্নবর্তী-যৌথ পরিবারে যেমনভাবে বাড়ীর অন্দরমহলে স্ত্রীলোক-দের রাখা হইত, তাহাতে নায়কের পক্ষে নায়িকার গৃহে অভিসার করা সম্ভব হইত না। তাই বৈষ্ণব পদাবলীতে প্রায়শঃ দেখি নায়িকাই অভিসারে বাহির হইয়াছেন কোন সংকেতস্থানের উদ্দেশ্যে, যেখানে নায়ক তাঁহার প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছেন। মধ্যযুগের ইউরোপীয় কাব্যের নায়িকারা দুর্গের দোতালায় একা একঘরে শুইতেন, সেইজন্য নায়ক অভিসারে আসিয়া সেই ঘরের নীচে দাঁড়াইয়া বাজনা বাজাইয়া নায়িকাকে সংকেত করিতেন। রবীন্দ্রনাথ এই রীতির অনুসরণ করিয়া নায়ককে দিয়াই অভিসার করাইয়াছেন। গোবিন্দদাসের কৃষ্ণ এক গর্জনমুখর বর্ষার রাত্রিতে সংকেত কুঞ্জে বসিয়া ভাবিতেছেন এমন রাত্রিতে রাধা যদি অভিসারে বাহির হন তবে তিনি কত কষ্টই না পাইবেন—আজ তিনি না বাহির হইলেই ভাল।

অম্বর ভরি নব নীরদ ঝাঁপ।
কত শত কোটি শবদে জিউ কাঁপ॥
তহিঁ দিঠি জারত বিজুরিক জালা।
ইথে জনি ছোড়বি মন্দির বালা॥
ঐছন কুঞ্জে একলি বনমালি।
অন্তর জর জর পন্থ নেহারি॥ (পদকল্পতরু ৯৯১)

নায়কের পরিবর্তে নায়িকা অনুরূপ দুর্যোগের রাত্রিতে তাঁহার পরাণসখা বন্ধুর জন্য দুয়ার খুলিয়া বসিয়া আছেন আর ভাবিতেছেন বন্ধুর আমার আসিতে কত কষ্টই না হইতেছে—এই ভাবটিকে রূপ দিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ—

আজ ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণ সখা বন্ধু হে আমার।
আকাশ কাঁদে হুতাশ সম
নাই যে ঘুম নয়নে মম;
দুয়ার খুলি, হে প্রিয়তম
চাই যে বারে বার।
পরাণসখা বন্ধু হে আমার।
বাহিরে কিছু দেখিতে নাহি পাই
তোমার পথ কোথায় ভাবি তাই।

সুদূরে কোন নদীর পারে
গহন কোন বনের ধারে
গভীর কোন অন্ধকারে
হতেছ তুমি পার।
পরাণ সখা বন্ধু হে আমার। (গীতাঞ্জলি ২০)

কবিতাটির মধ্যে স্পষ্ট করিয়া বলা না হইলেও ব্যঞ্জনা রহিয়াছে যে এই গভীর অন্ধকারে ঝড়ের মধ্যে নদী পার হইয়া অভিসারে আসিতে তোমার যে কষ্ট হইতেছে তাহা আমার বুকে আসিয়া বাজিতেছে। গীতিমাল্যে (৯১) কবি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন—

তুমি পার হয়ে এসেছ মরু
নাই যে সেথায় ছায়া তরু
পথের দুঃখ দিলেম তোমায়
এমন ভাগ্যহত।

রবীন্দ্রনাথ এই কবিতা লিখিবার ৩২ বছর আগে চণ্ডীদাসের—

এঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বাটে,
আঙিনার কোণে তিতিছে বঁধুয়া
দেখিয়া পরাণ ফাটে।

তুলিয়া বলিয়াছিলেন—"শ্যামকে ভিজিতে দেখিয়া রাধার দুঃখ, ও শ্যামকে ভিজিতে দেখিয়াই রাধার সুখ, উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব হইতেছে।" এই কবিতাতেও রবীন্দ্রনাথের মনে দুঃখের সঙ্গে সঙ্গে কি গর্ব জাগিতেছে না এই ভাবিয়া যে তাঁহার পরাণসখা বন্ধু তাঁহারই জন্য কত কষ্ট স্বীকার করিতেছেন? সেই গর্বের সুরেই তিনি বলিতেছেন—

আমার মিলন লাগি তুমি
আসছ কবে থেকে।
তোমার চন্দ্র সূর্য তোমায়
রাখবে কোথায় ঢেকে। (গীতাঞ্জলি ৩৪)

বৈষ্ণবের শ্রীকৃষ্ণও গোলকবিহার পরিত্যাগ করিয়া মধুর প্রেমের আস্বাদনের জন্য ব্রজভূমে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

গীতাঞ্জলিতে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলীর সুপরিচিত পরিবেশকে সযত্নে পরিহার করিবার চেষ্টা করিয়াও যে সেই শতস্মৃতিবিজড়িত বৃন্দাবন ও যমুনা-পুলিনকে এড়াইয়া যাইতে পারেন নাই, তাহার আর একটি নিদর্শন মেলে তাঁহার ১৩১৬ সালের ভাদ্র মাসে লেখা "আর নাই রে বেলা নামল ছায়া" ইত্যাদি কবিতাতে (গীতাঞ্জলি ২৬)। সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্বে যেন কবি ঘাটে কলসখানি ভরিয়া লইবার আহ্বান শুনিলেন। ঘাটের সেই বিজনপথে তখন লোকের চলাচল বন্ধ,

কিন্তু "প্রেম নদীতে উঠেছে ঢেউ উতল হাওয়া"। এমন অবস্থায় ঘাটে গেলে আর কি তিনি ফিরিয়া আসিতে পারিবেন?

জানি না আর ফিরব কিনা,
কার সাথে আজ হবে চিনা,
ঘাটে সেই অজানা বাজায় বীণা
তরণীতে।

জ্ঞানদাসের রাধা তো এমনি ঘটনাচক্রে তাঁহার নিজস্ব ব্যক্তিত্বকে খোয়াইয়া আসিয়া বলিয়াছিলেন—

কেনে গেলাম জল ভরিবারে।
যাইতে যমুনার ঘাটে সেখানে ভুলিলু বাটে
তিমিরে গরাসিল মোরে।

শ্যামরূপের তিমির যেন রাধাকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। আর মুরারি গুপ্তের রাধা অনুরূপ অবস্থায় পড়িয়া সখীকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে তিনি যেন রাধার আশাভরসা ছাড়িয়া দিয়া ঘরে ফিরিয়া যান—

সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও
জিয়ন্তে মরিয়া যে আপনা খাইয়াছে
তাহে তুমি কি আর বুঝাও (পদকল্পতরু ৭৫১)

রবীন্দ্রনাথের অজানা বন্ধু বাঁশী বাজান না, বীণা বাজান, কিন্তু ফল দুইয়েরই সমান, তাই তিনি মুরারি গুপ্তের রাধার মতন জোর দিয়া না বলিলেও তাঁহার মনে হয় আর তাঁহার ঘরে ফেরা হয়তো সম্ভব হইবে না—"জানি না ফিরব কি না।"

রবীন্দ্রনাথ শ্যামের নাম উল্লেখ না করিলেও নবজলধর-শ্যামকে এড়াইয়া যাইতে পারেন নাই।

এস হে এস সজলঘন
বাদল বরিষণে
বিপুল তব শ্যামল স্নেহে
এস হে এ জীবনে।

প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রিয়তমকে দর্শন করিয়াছেন।

এই যে তোমার প্রেম ওগো হৃদয় হরণ'
এই যে পাতার আলো নাচে সোনার বরণ!
এই যে মধুর আলসভরে মেঘ ভেসে যায় আকাশ পরে
এই যে বাতাস দেহে করে অমৃত ক্ষরণ
এই ত তোমার প্রেম ওগো হৃদয়হরণ।

বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে ঠিক এই ধরণের অনুভূতি নাই, তবে শ্রীচৈতন্যের কৃপাপ্রাপ্ত রঘুনাথ ভাগবতাচার্য শ্রীমদ্ভাগবতের (১১।২।৪১) ভাব লইয়া লিখিয়াছেন—

আকাশ, পবন, বহ্নি, মহী, জ্যোতি, জল।
নদ-নদী, তরুগণ, পর্বত সাগর॥
সকল কৃষ্ণের তনু জানিব গেয়ানে।
প্রণাম করিব সব বিনয়-বিধানে॥ *

চৈতন্য চরিতামৃতেও (২।৮) আছে--মহাভাগবত দেখে স্থাবরজঙ্গম। তাঁহা তাঁহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরণ॥

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মূল তত্ত্ব হইতেছে এই যে ভগবান মানুষের প্রেম চান—শুধু পূজায় তিনি তৃপ্ত হন না। এইজন্য ব্রজের সখ্য, বাৎসল্য ও কান্তাপ্রেমের ভাবের প্রতি তাঁহার এত আকর্ষণ। রবীন্দ্রনাথের আক্ষেপ এই যে ভগবানকে আমরা পূজা করি, প্রণাম করি, কিন্তু ব্রজের সখাদের মতন আপন বলিয়া বুকে জড়াইয়া ধরি না। তথাপি ভগবান আমাদের প্রেম গ্রহণ করিবার জন্য ছোট হয়ে সসীম হইয়া আমাদের মধ্যে আসেন।

দেবতা জেনে দূরে রই দাঁড়ায়ে
আপন জেনে আদর করি নে।
পিতা বলে প্রণাম করি পায়ে
বন্ধু বলে দু-হাত ধরি নে।
আপনি তুমি অতি সহজ প্রেমে
আমার হয়ে এলে যেথায় নেমে
সেথায় সুখে বুকের মধ্যে ধরে
সঙ্গী বলে তোমায় বরি নে। (গীতাঞ্জলি ৯২)

ইহার সঙ্গে তুলনা করুন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উক্তি—

আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥

* রবীন্দ্রনাথ "রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে" পড়িয়া থাকাকে (গীতাঞ্জলি ১১৯) এবং মূর্তিকেই পূজা করিতে যাইয়া জনগণকে অবহেলা করাকে ধিক্কার দিয়াছেন। ভাগবত অবলম্বনে (১১।২।৪৫—৪৭) রঘুনাথ ভাগবতাচার্যও লিখিয়াছেন—

সর্বভূতে আত্মভাব, এক নারায়ণ।
সব ভগবানে বৈসে দেখয়ে যে-জন॥
ভাগবতোত্তম এই জানিহ নিশ্চয়।
ভকত-মধ্যম তবে করিব নির্ণয়॥
ঈশ্বরে করয়ে প্রেম, ভকতে মিত্রতা।
দীন-হীন-জনে কৃপা, বিপক্ষে ত্যাগিতা॥
এই সে জানিহ রাজা! ভকত-মধ্যম।
প্রাকৃত ভক্তের শুন, কহিয়ে লক্ষণ
প্রতিমাতে পূজে কৃষ্ণ শ্রদ্ধভক্তি করি
ভক্তজন না পূজে ঈশ্বরবুদ্ধি করি॥
প্রাকৃত-ভকত তাথে জানিব বিদিতে॥

সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন বড় লোক তুমি আমি সম॥
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎসন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন॥ (১।৪)

গীতিমাল্যে রবীন্দ্রনাথ বৃন্দাবন বা গোপ বালকদের নাম উল্লেখ না করিলেও ব্রজের সখ্য প্রেমের কথাই নিম্নলিখিত কবিতায় বলিয়াছেন—

ওদের সাথে মেলাও, যারা
চরায় তোমার ধেনু।
তোমার নামে বাজায় যারা বেণু। (গীতিমাল্য ৮৭)

গভীর আকুতি লইয়া রবীন্দ্রনাথ প্রার্থনা করিয়াছেন -

ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা
প্রভু, তোমার পানে, তোমার পানে, তোমার পানে।

এই যে প্রেমের সাধনা, ইহার শেষ নাই, ইহা নিত্য, এখানে প্রাপ্তির মধ্যে তৃপ্তি নাই। এই সাধনার নিত্যনূতন ব্যথা, আর অসীম ব্যাকুলতা। এই কথাটি রবীন্দ্রনাথের ১৩২১ সালের ভাদ্র মাসে লিখিত কবিতাতে পাই।

সেই ত আমি চাই
সাধনা যে শেষ হবে মোর
সে ভাবনা তো নাই।
ফলের তরে নয় তো খোঁজা
কে বইবে সে বিষম বোঝা,
যেই ফলে ফল ধুলায় ফেলে
আবার ফুল ফুটাই। (গীতালি ৩৭)

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সাধনায় কোন ফলাকাঙ্খা নাই। স্বর্গ এবং মুক্তি দুইকেই ভক্ত তুচ্ছ করেন। শ্রীচৈতন্য শুধু জন্মে জন্মে অহৈতুকি ভক্তিই চাহিয়াছেন। ফলের আকাঙ্খা নাই, মুক্তি বাঞ্ছা নাই, তাই জন্মে জন্মে তোমার প্রতি শুদ্ধভক্তি হউক এই প্রার্থনাই বৈষ্ণব সাধকের। শ্রীকৃষ্ণের প্রেম একবার আস্বাদন করিলে তাহা পুরাতন হইয়া যাইবে এ ভয় নাই।

আমাব মাধুর্য নিত্য নব নব হয়।
স্ব স্ব প্রেম অনুরূপ ভক্তে আস্বাদয় (চৈতন্যচরিতামৃত ১।৪)

গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালির যুগের কবির দৈন্যবোধ, আত্মসমর্পণ ও প্রেমের আর্তি অনেক সমালোচককে বিস্মিত করিয়াছে। রসজ্ঞ পণ্ডিত ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় লিখিয়াছিলেন—"যে কবিকে আমরা শুনিয়াছি গভীর জ্ঞানলব্ধ কথা গম্ভীর উদাত্ত ধ্বনিতে শুনাইতে, যাঁহাকে দেখিয়াছি উর্বশীর সৌন্দর্য নয়ন ও মন ভরিয়া উপভোগ করিতে, বসুন্ধরার সুবিস্তৃত বক্ষে আপনাকে বিস্তারিত করিতে, বিজয়িনীর দৃপ্ত বিজয়-মহিমা প্রাণ ভরিয়া আঁখি ভরিয়া দেখিতে, কালবৈশাখির ঝড়ের উন্মত্ত-

তায় নাচিতে, সেই বিচিত্র বলিষ্ঠ সৌন্দর্যপিপাসু কবিচিত্তের আজ একি হইল। একি বিরাট অন্তহীন গভীর প্রেম ও আবেগ কবিচিত্তকে আকর্ষণ করিল, যাহার ফলে সমস্ত দেহমন বালিকা বধূর মতন কাঁপিয়া শিহরিয়া উঠিতে লাগিল, সমস্ত বল অন্তর্হিত হইয়া গেল, নিজেকে একান্ত দীন কাঙাল বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কোথায় গেল বুদ্ধির যত দীপ্তি, ভাষার যত শক্তি ও উচ্ছ্বাস, কল্পনার সবল উদ্দীপনা" (রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা, তৃতীয় সং, পৃঃ ২৪১)। যাহা সত্য সহজ ও সরল, তাহা বুদ্ধির দ্বারাও পাওয়া যায় না, কল্পনার দ্বারাও ধরা যায় না, উচ্ছ্বাসের সাহায্যেও প্রকাশ করিতে হয় না। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ যখন সেই পরম সত্যের উপলব্ধি করিয়াছেন, প্রেম-স্বরূপের মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছেন, তখন তাঁহাকে কৃপার চোখে দেখিবার কোন সঙ্গত কারণ পাই না।

এই উপলব্ধির পিছনে অনেক দুঃখ, অনেক সাধনা লুকাইয়া আছে। ১৩১৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে কবির প্রিয়পুত্র শমীন্দ্রনাথ মুঙ্গেরে বেড়াইতে যাইয়া কলেরায় মারা যান। ইহার এক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার জামাতা সত্যেন্দ্রনাথ ও আবাল্যসুহৃদ এবং পদরত্নাবলী সম্পাদনার সহযোগী শ্রীশচন্দ্র মজুমদার অকালে প্রাণত্যাগ করেন। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় রবীন্দ্রজীবনীতে লিখিয়াছেন--"এই সময়ে কবির মনে শোকাঘাতজনিত নানা অধ্যাত্ম সমস্যা মনে জাগিতেছে। মনের এই অবস্থায় শান্তিনিকেতনের মন্দিরতোরণে প্রত্যুষান্ধকারে কবি ধ্যানে বসিতেন।" প্রত্যুষান্ধকার বলিলে কম বলা হয়। ১৩১৮ সালের ৫ই ভাদ্র তারিখের একখানি পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"মা, আজ ভোর তিনটের সময় উঠে আমি বাইরে বসেছিলুম। তখন আকাশের এক প্রান্তে খণ্ড একটি চাঁদের রেখা, তারই অনতি-দূরে একটি উজ্জ্বল তারা জ্বল্ জ্বল্ করছিল। পূর্বদিকে কালো জটা পাকানো মেঘ জমে ছিল। অন্ধকারের তলে তলে আলোর একটি লাবণ্য ফুটে ফুটে বিস্তীর্ণ হয়ে পড়তে লাগল। আমার স্থির দৃষ্টির উপরে রাত্রি প্রভাত হয়ে গেল" (বিশ্ব-ভারতী, ১৩৬২, তৃতীয় সংখ্যা)। এই স্থির দৃষ্টি যে ধ্যানের দৃষ্টি সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। গভীর ধ্যানের উপলব্ধি সমূহই গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালিতে কাব্যরূপ লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা লইয়া যাঁহারা এ পর্যন্ত আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা কবির এই নিভৃত ব্রাহ্মমুহূর্তের সাধনাকে সম্যক্ গুরুত্ব দেন নাই। কোন্ ব্যক্তি ভোগী আর কোন্ ব্যক্তি যোগী তাহা সহজে চিনিবার একটি উপায় হইতেছে কে কখন নিদ্রা হইতে জাগে আর উঠিয়া কি করে তাহা দেখিয়া। রবীন্দ্রনাথ যোগী, তাপস। তাঁহার পিতা তাঁহাকে ভোর চারটার সময় উঠাইয়া দিতেন, সেই অভ্যাস তাঁহার সারাজীবন ছিল। গীতাঞ্জলিতে তিনি যে ভাবের আবেগে কবিতা লিখিয়াছেন তাহাকে বৈষ্ণবীয় ভাষায় বলে নব-অনুরাগ। তাঁহাকে এই সময়ে দেখিয়া জার্মান দার্শনিক কাইসারলিন্ড তাঁহার Travel Diaryতে লেখেন—"Never, perhaps have I seen so much spiritualised substance of soul condensed into one man."

গীতাঞ্জলি রচনার প্রায় সমকালেই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে "শ্রাবণ সন্ধ্যা" নামে একটি ভাষণ দেন। তাহাতে বিদ্যাপতির "ভরা বাদর মাহ ভাদর" ইত্যাদি পদের (পদরত্নাবলী ৬৬) শেষ চার চরণ উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে এখানে সমস্যা এ নয় যে "কেমন করে তোর দিনরাত্রি কাটবে" কিন্তু এই যে "কেমন করে কাটবে **হরিবিনে** দিন রাতিয়া"—সেইজন্যে 'হরিবিনে' কথাটাকে ঘিরে ঘিরে এত অবিরল অজস্র বর্ষণ। চিরদিনরাত্রি যাকে নিয়ে কেটে যাবে, এমন একটি চিরজীবনের ধন কেউ আছে—তাকে না পেয়েছি নাই পেয়েছি, তবু সে আছে, সে আছে- বিরহের সমস্ত বক্ষ ভরে দিয়ে সে আছে—সেই **হরিবিনে** কৈসে গোঙায়বি দিনরাতিয়া। এই জীবনব্যাপী বিরহের যেখানে আরম্ভ সেখানে যিনি, যেখানে অবসান সেখানে যিনি, এবং তারি মাঝখানে গভীর ভাবে প্রচ্ছন্ন থেকে যিনি করুণ সুরের বাঁশি বাজাচ্ছেন, সেই **হরিবিনে** কৈসে গোঙায়বি দিনরাতিয়া।" ভগবৎ অনুভূতির এমন আন্তরিকতাপূর্ণ প্রকাশ বৈষ্ণবজনের কণ্ঠহার হইবার যোগ্য।

তথাপি গীতাঞ্জলি-গীতালির কবিকে বৈষ্ণব বলা চলে না। বৈষ্ণব ভক্তি জ্ঞান ও কর্মের দ্বারা অনাবৃত। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর 'অন্যাভিলাষিতা শূন্যং' শ্লোকের ভাব লইয়া নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় প্রেমভক্তি চন্দ্রিকায় লিখিয়াছেন—

অন্য অভিলাষ ছাড়ি জ্ঞানকর্ম পরিহরি
কায় মনে করিব ভজন।

আর রবীন্দ্রনাথ ১৩১৫ সালে "শান্তিনিকেতনে" বলেন—"প্রেমের সাধনায় বিকারের আশংকা আছে। প্রেমের একটা দিক্ আছে যেটা প্রধানত রসেরই দিক্—সেইটের প্রলোভনে জড়িয়ে পড়লে কেবলমাত্র সেইখানেই ঠেকে যেতে হয়—তখন কেবল রস-সম্ভোগকেই আমরা সাধনার চরমসিদ্ধি বলে জ্ঞান করি। তখন এই নেশায় আমাদের পেয়ে বসে। এই নেশাকেই দিনরাত্রি জাগিয়ে তুলে আমরা কর্মের কঠোরতা, জ্ঞানের বিশুদ্ধতাকে ভুলে থাকতে চাই—কর্মকে বিস্মৃত হই, জ্ঞানকে অমান্য করি"। কিন্তু দুই কূল বজায় রাখিয়া প্রেম করা চলে না। প্রেমের আবেগে যে জ্ঞান ও কর্ম ভাসিয়া যায় তাহা রবীন্দ্রনাথ নিজেও স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন যে যাহাকে ভগবান 'অসীম প্রেমের ভার' বহিবার শক্তি দেন—

না রাখ তার ঘরের আড়াল
না রাখ তার ধন
পথে এনে নিঃশেষে তায়
কর অকিঞ্চন।
না থাকে তার মান অপমান
লজ্জা শরম ভয়
একলা তুমি সমস্ত তার
বিশ্বভুবনময়।

বৈষ্ণব পদাবলীতে যে বিরহ-মিলনের অনুভূতি তাহা স্থায়ী, গভীর ও সুনিবিড়;

তাহা রবীন্দ্রনাথের ক্ষণে ক্ষণে দেখা পাওয়া, বা

আড়াল থেকে ক্ষণে ক্ষণে
আভাসে দাও দেখা (গীতাঞ্জলি ৬৬)

নহে। পদাবলীর কবিরা সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিবার জন্য ভজন সাধন করেন। তাঁহারা দেখা না পাইয়া শুধু পথ চাহিয়া থাকাকেই কাম্য করিয়া তুলেন নাই। রবীন্দ্রনাথ বলেন—

প্রভু, তোমা লাগি আঁখি জাগে
দেখা নাই পাই, পথ চাই
সেও মনে ভাল লাগে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সাধ্য-সাধনের নিক্তিতে রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে ওজন করিলে হয়তো তাহা অনেক পরিমাণে হাল্কা বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু আধুনিক মানুষের কঠোর জীবনসংগ্রামের মধ্যে গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি এমন এক স্বর্গীয় সুধা পরিবেশন করে যাহা পান করিলে বলিবার শক্তি পাওয়া যায়—

মিটল দুঃখ, টুটল বন্ধ,
আমার মাঝে, হে আনন্দ,
তোমার প্রকাশ দেখে, মোহ
ঘুচল এ নয়নে॥ (গীতালি ১০৪)

অষ্টম অধ্যায়

পদাবলীর বিলীয়মান প্রভাব (১৩২১—১৩৪৮)

শাস্ত্রে আছে পঞ্চাশের ঊর্ধ্বে বনে যাইবে। পদাবলী-সাহিত্য-রসিক রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানদাসের পদে পড়িয়াছিলেন "যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল"; শ্রীনিবাস আচার্যের পদেও পাইয়াছিলেন "যৌবন বনের পাখী মরয়ে তিয়াসে।" তাই কি তিনি তিপান্ন বছর বয়সে যৌবনের বনেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন? ১৩২১ সালে তিনি তিপান্ন বছরে পড়েন।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টির ইতিহাসে ১৩২১ সালের মতন বিচিত্র রচনাসম্ভারে পরিপূর্ণ অন্য কোন বৎসর বোধ হয় নাই। এই বৎসরে একদিকে গীতিমাল্য ও গীতালির গানে ভক্তি ও প্রেম যেন মূর্তি গ্রহণ করিতেছে, অন্যদিকে 'সবুজের অভিযানে' ও 'স্ত্রীর পত্রে' বিদ্রোহের বাণী ঘোষিত হইতেছে। আবার ঐ সময়েই বের্গসঁর গতিশীল বিবর্তনবাদের ভাব লইয়া কবি বলাকার কবিতা লিখিতেছেন ও ফাল্গুনী নাটক রচনা করিতেছেন। চতুরঙ্গের ন্যায় রসঘন ব্যঞ্জনাময় উপন্যাসও ঐ বৎসরের সৃষ্টি। ১৩২১ সালে রবীন্দ্রনাথ যেন এক ভাবলোক হইতে অন্য ভাবলোকে জন্ম গ্রহণ করেন। এন্ড্রুজ সাহেবকে লিখিত পত্রাবলী হইতে কবির গর্ভবাস যন্ত্রণার পরিচয়ও বোধ হয় পাওয়া যায়। কবি তিপ্পান্ন বৎসর বয়সে মানসিক কায়াকল্প করিয়া নবীন হইলেন। তাঁহার জীবনের শেষ সাতাশ বৎসরের রচনায় পদাবলীর প্রভাব নাই বলিলেই চলে। শুধু দুই একটি কথার টুক্‌রায় যেন কবির পূর্ব জীবনের সংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায়।

'ফাল্গুনী'র 'তোমায় নতুন করেই পাব বলে হারাই ক্ষণেক্ষণ' গানটি রাস হইতে সহসা কৃষ্ণের অন্তর্ধান, গোপীদের অনুসন্ধান ও পূর্ণতর মিলনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ১৩৩০ সালে রচিত 'তপোভঙ্গ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ কৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছেন—

"কালের রাখাল তুমি,
সন্ধ্যায় তোমার শিঙ্গা বাজে।"

বাঁশির কথা রবীন্দ্রনাথের কাব্য-নাটক ও গল্পে ছড়াইয়া আছে। ১৩৩১ সালে রচিত রক্তকরবীতে দেখি নন্দিনী গাহিতেছে—

ভালোবাসি ভালোবাসি
এই সুরে কাছে দূরে জল-স্থলে বাজায় বাঁশি।

এ যেন জয়দেবের 'নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং' করিয়া কৃষ্ণের বাঁশি বাজান। ১৩৩৮ সালে শাপমোচন গীতি-নাট্যের আর একটি গানে বৈষ্ণব পদাবলীর সুর একটু যেন পাওয়া যায়—

জাগরণে যায় বিভাবরী
আঁখি হতে ঘুম নিল হরি।
যার লাগি ফিরি একাএকা
আঁখি পিপাসিত নাহি দেখা
তারি বাঁশি ওগো তারি বাঁশি
তারি বাঁশি বাজে হিয়া ভরি।

১৩৪২ সালে 'বীথিকা'য় সন্নিবিষ্ট 'বাদল রাত্রি' কবিতায় বিদ্যাপতির বর্ষাবিরহের পদের (পদরত্নাবলী ৬৬) সুর অনেকটা সুস্পষ্ট—

কী বেদনা মোর জান সে কি তুমি, জান
ওগো মিতা মোর, অনেক দূরের মিতা,
আজ এ নিবিড় তিমিরযামিনী
বিদ্যুৎ-সচকিতা।
বাদল বাতাস ব্যেপে
হৃদয় উঠিছে কেঁপে
ওগো, সে কি তুমি জান।
উৎসুক এই দুখজাগরণ
একি হবে হায় বৃথা!

"শান্তিনিকেতনে"র ভাষণে কবি বারংবার বলিয়াছেন—"এই কথাটি মনে রাখতে হবে, ভক্তিরসের প্রেমরসের মধ্যে যে দিকটি সম্ভোগের দিক্, কেবল সেইটিকেই একান্ত করে তুললে দুর্বলতা এবং বিকার ঘটে। ওর মধ্যে একটি শক্তির দিক্ আছে, যেটি না থাকলে রসের দ্বারা মনুষ্যত্ব দুর্গতি প্রাপ্ত হয় (শান্তিনিকেতন ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৯৩)। ১৩২১ সালে লিখিত "চতুরঙ্গে" এই তত্ত্বটিই বিশদ ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শচীশ লীলানন্দস্বামীর চেলা হইয়া কীর্তনের আনন্দে মাতিয়া বন্ধু শ্রীবিলাসকে বলিল—"জ্যাঠামশায় যখন বাঁচিয়া ছিলেন তখন তিনি আমাকে জীবনের কাজের ক্ষেত্রে মুক্তি দিয়াছিলেন, ছোটো ছেলে যেমন মুক্তি পায় খেলার আঙিনায়; জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পরে তিনি আমাকে মুক্তি দিয়াছেন রসের সমুদ্রে, ছোটো ছেলে যেমন মুক্তি পায় মায়ের কোলে।" শচীশ তাহার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের বলে শ্রীবিলাসকেও রসের সমুদ্রে ডুবাইলেন। পদাবলীর কীর্তন গানের ভিতর দিয়া যে রসের রাজ্যের সৃষ্টি হইল, তাহার বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"সেখানে বিশ্বব্যাপিনী নারীর সঙ্গে চিত্তব্যাপী পুরুষের প্রেমের লীলা চলিতেছিল; গ্রামের গোরু-চরা মাঠ, খেয়াঘাটের বটচ্ছায়া, অবকাশের আবেশে ভরা মধ্যাহ্ন এবং ঝিল্লিরবে আকম্পিত সন্ধ্যাবেলাকার নিস্তব্ধতা তাহারই সুরে পরিপূর্ণ হইয়াছিল।" এই রসলোকে বাস করিয়া শচীশ বাস্তবের সহিত যেন সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হইল। সে চারিপাশের ঘটনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন, সেই জন্য দামিনীর মনের মধ্যে কি বিপ্লব সে অজানিতে ঘটাইলে সে-সম্বন্ধে কোন ধারণাই তাহার জন্মিল না। শ্রীবিলাস বলেন—

"শচীশ যে মুল্লুকে বাস করে সেখানে ঘটনা বলিয়া কোনো উপসর্গই নাই, সেখানে হ্লাদিনী ও সন্ধিনী ও যোগমায়া যাহা ঘটাইতেছে সে একটা নিত্যলীলা সুতরাং তাহা ঐতিহাসিক নহে—সেখানকার চিরযমুনাতীরের চিরধীরসমীরের বাঁশি যাহারা শুনিতেছে তারা যে আশপাশের অনিত্য ব্যাপারগুলো কিছু দেখে বা জানে কিছু শোনে হঠাৎ তাহা মনে হয় না।" এখানে বলা প্রয়োজন যে বৈষ্ণবদর্শনের মতে ব্রহ্মের স্বরূপশক্তি বা চিচ্ছক্তির তিনটি বৃত্তির নাম সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী। ইহারা যথাক্রমে সৎ, চিৎ ও আনন্দের সহিত সংশ্লিষ্ট। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে (১।৪)

সচ্চিদানন্দপূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সংবিৎ যারে 'জ্ঞান' করি মানি॥

ঈশ্বর সৎস্বরূপ হইয়াও যে শক্তি দ্বারা স্বয়ং সত্তাধারণ করেন এবং অন্যান্য সকলকে ধারণ করেন, সেই সর্বদেশে, সর্বকালে, সর্বদ্রব্যে ব্যাপ্ত শক্তিকে সন্ধিনী শক্তি বলা হয়। হ্লাদিনী বা আনন্দ-দায়িণী শক্তি তাহাই যাহার দ্বারা ভগবান্ স্বয়ং আনন্দ-স্বরূপ হইয়াও নিজে আনন্দ আস্বাদন করেন ... এই হ্লাদিনী শক্তি। যোগমায়াও স্বরূপশক্তির বৃত্তি। ইনি অঘটন ঘটাইয়া ... লীলার সহায়তা করেন।

লীলানন্দ স্বামীর কীর্তনদলের নবীন নামে একজন ... তাহার শ্যালিকার প্রতি আসক্ত হইলে, নবীনের স্ত্রী নিজে উদ্যোগী হইয়া ... বিবাহ ঘটাইয়া বিষপানে আত্মহত্যা করিল। ইহা দেখিয়া দামিনী বলিল "তোমরা দিনরাত রস রস করিতেছ, ও ছাড়া আর কথা নাই। রস যে কী সে তো আজ দেখিলে। তার না আছে ধর্ম, না আছে কর্ম, না আছে ভাই, না আছে ... না আছে ... তার দয়া নাই, বিশ্বাস নাই, লজ্জা নাই শরম নাই। এই নির্লজ্জ নিষ্ঠুর সর্বনেশে রসের রসাতল হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার কী উপায় তোমরা করিয়াছ?" রসের যদি এই সত্যরূপ হয়, তাহা হইলে তাহার হাত হইতে কে রক্ষা পাইবে? দামিনী যখন শচীশকে ব্যাকুল ভাবে ঐ রসের রাক্ষসীর হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য অনুরোধ করিল তখন সে কি প্রকারান্তরে ঐ সর্বনাশী রসের গর্তে শুধু নিজেকে নহে শচীশকেও ফেলিবার চেষ্টা করিল না? দামিনী শচীশকে বলিল "আগুন দিয়ে আগুন নেবানো যায় না। তোমার গুরু যে পথে সবাইকে চালাইতেছেন সে পথে ধৈর্য নাই, বীর্য নাই, শান্তি নাই। ঐ যে মেয়েটা মরিল রসের পথে রসের রাক্ষসীই তো তার বুকের রক্ত লইয়া তাহাকে মারিল। কী তার কুৎসিত চেহারা সে তো দেখিলে? প্রভু, জোড়হাত করিয়া বলি ঐ রাক্ষসীর কাছে আমাকে বলি দিয়ো না। আমাকে বাঁচাও। যদি কেউ আমাকে বাঁচাইতে পারে তো সে তুমি।" শচীশ দামিনীকে বাঁচাইতে যাইয়া নিজের আধ্যাত্মিক মরণ বরণ করিতে রাজী হইল না। দামিনী শচীশের সাধনার বিঘ্ন ঘটাইবে না বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া নিজেকে

প্রলোভনের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য শ্রীবিলাসকে বিবাহ করিল। এখানে পদাবলী-সাহিত্যের পরকীয়া প্রেমের যেন ডিগ্‌বাজি খাওয়ান হইল। রাধা বিবাহিতা বটে কিন্তু তাঁহার স্বামীর সঙ্গে তাঁহার কোন দৈহিক বা মানসিক সম্বন্ধ নাই; গোবিন্দদাসের মতে তিনি গৃহপতি মাত্র, প্রাণপতি নহেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শেষ সাতাশ বৎসরে লিখিত অনেকগুলি গল্পে ও উপন্যাসে দেখাইয়াছেন যে নারী প্রাণ দিয়া একজনকে ভালবাসে কিন্তু বিবাহ করে অন্যকে। রাধাকে অল্প বয়সে আত্মীয়স্বজনে বিবাহ দিয়াছিল, বিবাহ ব্যাপারে তাঁহার কোন মতামত ছিল না। আর চতুরঙ্গের দামিনী, শেষের কবিতার লাবণ্য, বাঁশরীর সুষমা প্রভৃতি একজনের সঙ্গে প্রেম করিয়া অন্যকে বিবাহ করে। এ যেন পরকীয়া প্রেমের প্যারডি!

রবীন্দ্রনাথ সত্যসত্যই এ যুগে বৈষ্ণব পদাবলী লইয়া প্যারডি লিখিয়াছেন। ১৩৪০ সালে (৩০।১০।৪০) তিনি মশকমঙ্গলগীতিকায় (প্রহাসিনী) শ্রীচৈতন্যের রচিত বৈষ্ণবীয় সাধনার শ্রেষ্ঠ উপদেশকে অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা—
জানিতাম দীনতার এই শেষ দশা,
আমি স্বপ্নে দেখিলাম হয়ে গেছি মশা!
কী হল যে দশা—
মধ্যরাত্রে স্বপ্নে আমি
হয়ে গেছি মশা।
দীন হতে দীন আমি
ক্ষীণ হতে ক্ষীণ
একমাত্র নাম জপ করেছি ভরসা।
হিংস্র নীতি নাহি আর,
অতি শান্ত নির্বিকার,
ভক্তের নাসাগ্র-'পরে স্তব্ধ হয়ে বসা—
কী হল যে দশা!
মধুর মাশবী বেণু নীরব সহসা।
পাখা করি নাড়াচাড়া,
ভোঁ ভোঁ শব্দে নাই সাড়া—
শুধু 'রাম রাম' ধ্বনি ডানা হতে খসা
হেন হীন দশা।

কোন্ মনোবিকলনের ফলে কবি মশাত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন এই স্বপ্ন দেখিলেন জানি না। মশা ভক্তের নাকের পর চুপ করিয়া বসিয়াছিল, কেননা ভক্তের সঙ্গের ফলে তাহার মনে অহিংস ভাব জাগিয়াছিল, এমন কি ভাবের দশা লাগিয়াছিল। সে না কামড়াইলেও ভক্ত মহাশয় বোধ হয় নাকের উপর থাবা মারিয়া মশার ডানা খসাইয়া দিলেন এবং হয়তো হাতে রক্ত লাগায় ঘৃণাভরে রাম! রাম' বলিলেন। যিনি তরুর

মতন সহিষ্ণু হইবার আদর্শের বুলি মুখে আওড়ান, তিনি একটা মশা অহিংসভাবে তাঁহার কাছে আশ্রয় লইলেও তাহাকে না মারিয়া থাকিতে পারেন না! এই কথাটাই বোধ হয় কবি হাসিঠাট্টার মধ্য দিয়া বলিতে চাহেন। ইহাকে বিদ্রূপ করা বলিব না। প্রতিপক্ষকে আঘাতে জর্জরিত করা এ লেখার উদ্দেশ্য নহে।

রবীন্দ্রনাথ জনপ্রিয় শুকশারীর দ্বন্দ্বগীতির ধাঁচে ফেলিয়া ১৩৩৪ সালে যে অপূর্ব কবিতাটি লিখিয়াছেন, তাহার ভাষা, ভাব ও কাব্যরস অতুলনীয়। কবিতাটির রস বুঝিতে হইলে প্রথমে গোবিন্দ অধিকারীর শুকশারীর দ্বন্দ্বের সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন।

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ মদনমোহন।
শারী বলে, আমার রাধা বামে যতক্ষণ--
নইলে শুধুই মদন॥
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল।
শারী বলে, আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল -
নইলে পারবে কেন॥
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের মাথায় ময়ূর পাখা।
শারী বলে, আমার রাধার নামটি তাতে লেখা -
ঐ যে যায় গো দেখা॥
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের চূড়া বামে হেলে,
শারী বলে, আমার রাধাব চরণ পাবে বলে---
চূড়া তাইতে হেলে॥
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ যশোদা-জীবন।
শারী বলে, আমার রাধা জীবনের জীবন—
নইলে শূন্য জীবন॥
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ জগৎ চিন্তামণি।
শারী বলে, আমার রাধা প্রেম-প্রদায়িনী--
সে তোমার কৃষ্ণ জানে॥
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের বাঁশী করে গান।
শারী বলে সত্য বটে, বলে রাধার নাম—
নইলে মিছে সে গান॥
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ জগতের কালো।
শারী বলে, আমার রাধার রূপে জগৎ আলো—
নইলে আঁধার কালো॥

ঠিক এই ধরণের কথোপকথন রবীন্দ্রনাথের 'শুকসারী' কবিতাতেও পাওয়া যায়।

শুক বলে, গিরিরাজের জগতে প্রাধান্য,

সারী বলে, মেঘমালা, সেই বা কী সামান্য,
গিরির মাথায় থাকে।
শুক বলে, গিরিরাজের দৃঢ় অচল শিলা,
সারী বলে, মেঘমালার আদিঅন্তই লীলা,
বাঁধবে কেবা তাকে?
শুক বলে, নদীর জলে গিরি ঢালেন প্রাণ
সারী বলে, তার পিছনে মেঘমালার দান—
তাই তো নদী আছে।
শুক বলে, গিরিশ থাকেন গিরিতে দিনরাত্র
সারী বলে, অন্নপূর্ণা ভরেন ভিক্ষাপাত্র
সে তো মেঘের কাছে।
শুক বলে, হিমাদ্রি যে ভারত করে ধন্য
সারী বলে, মেঘমালা বিশ্বেরে দেয় স্তন্য
বাঁচে সকল জন।
শুক বলে, সমাধিতে স্তব্ধ গিরির দৃষ্টি
সারী বলে, মেঘমালার নিত্য নূতন সৃষ্টি
তাই সে চিরন্তন।

রবীন্দ্রনাথ শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর পাহাড়ের ছবি আঁকা একখানি পত্রের উত্তরে পাহাড় অপেক্ষা মেঘমালা শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করিয়া এই কবিতা লেখেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় শুকসারীর দ্বন্দ্বের প্যারডি লিখিয়া নিছক হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আর রবীন্দ্রনাথ এই ভাবসমৃদ্ধ Sublime কবিতা লিখিলেন।

ইংরাজী প্রবাদে বলে যে সপ্রশংস ভাবের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি হইতেছে অনুকরণ। বৈষ্ণব পদাবলীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথ ভানুসিংহের পদাবলীতে উহার অনুকরণ করিবার চেষ্টা করেন। তারপর পদাবলীর অনুসরণে তিনি বহু কবিতা রচনা করেন; পদাবলীর সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করিয়া কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন, তাঁহার কাব্য, নাটক, গল্প-উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর মুখে পদাবলীর একটু একটু টুকরা বসাইয়া তাহাদের মনের ছবি অপূর্ব নৈপুণ্যের সঙ্গে ফুটাইয়া তুলেন, এবং পরে পদাবলীর অন্তর্নিহিত কান্তভাবের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া গীতাঞ্জলিযুগে বহু গীতি-কবিতা সৃষ্টি করেন।

মহাজনগণের পদাবলীর বাব্যাংশ রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করিয়াছিল কিন্তু তাঁহাদের ভজনপ্রণালীকে তিনি নিজস্ব করিয়া লইতে পারেন নাই। ১৩৪০ সালে প্রকাশিত "মানুষের ধর্ম" নামক বক্তৃতামালায় বেদ, উপনিষদ, গীতা হইতে আরম্ভ করিয়া রজ্জব ও বাউলের গানের কথা আছে, কিন্তু কোথাও প্রত্যক্ষভাবে বৈষ্ণবধর্মের কথা নাই। কিন্তু উহাতে আছে—"মানুষের বিচিত্র"

সম্বন্ধের মধ্যে একটি আনন্দের রস আছে। সকলের মধ্যে এই যে আনন্দের রস, তাকে নিয়ে মহারসের প্রকাশ। রসো বৈ সঃ।" রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন ধরিয়া এই রসস্বরূপে ভগবানেরই উপাসনা করিয়াছেন। সেই রসস্বরূপের বিচিত্র প্রকাশকে তিনি লীলা বলিয়াও অনুভব করিয়াছেন "মানব নাট্য মঞ্চের মাঝখানে যে লীলা, তার অংশের অংশ আমি। সব জড়িয়ে দেখলুম সকলকে। এই যে দেখা একে ছোট বলব না, এও সত্য। জীবনদেবতার সঙ্গে জীবনকে পৃথক করে দেখলেই দুঃখ, মিলিয়ে দেখলেই মুক্তি।" রবীন্দ্ররচনাবলী (২১।৩০১ পৃঃ) তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী উপনিষদ ও বৈষ্ণবধর্মের সামঞ্জস্যমূলক সংহতির ফল, তাই উহা মৌলিক।

পরিশিষ্ট

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার

সম্পাদিত

পদরত্নাবলী

(বৈশাখ ১২৯২ সালে কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত)

সঙ্কেত ব্যাখ্যা

অ- অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী, পদসংখ্যা দেওয়া হইল।

কী -কীর্তনানন্দ, পৃষ্ঠা সংখ্যা দেওয়া হইল।

গী- গীতচন্দ্রোদয়, পৃষ্ঠা সংখ্যা দেওয়া হইল।

গৌ—গৌরপদতরঙ্গিণী ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা সংখ্যা।

তরু—পদকল্পতরু, পদ সংখ্যা, সাহিত্যপরিষৎ সং।

নচ ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত "চণ্ডীদাস পদাবলী"।

প—পদকল্পলতিকা।

প্রা প্রাচীন কবির গ্রন্থাবলী (বসুমতী সং ১৩০৪ সাল)।

ভ—ভক্তিরত্নাকর, বহরমপুর সং, পৃষ্ঠা সংখ্যা।

রস—রসমঞ্জরী, সাহিত্যপরিষৎ সং।

স—পদামৃতসমুদ্র ১ম সং, পৃষ্ঠা সংখ্যা।

সং- সংকীর্তনামৃত, পদ সংখ্যা।

ক্ষ—ক্ষণদা গীতচিন্তামণি।

পদকর্তাদের সূচী ও পদসংখ্যা

অজ্ঞাত—৩, ৪, ৯, ১২, ১৩, ৩৬, ৮২=৭

অনন্তদাস—৩৩, ৪৭, ৫৭, ৮০=৪

উদ্ধবদাস—১০৩

কবিবল্লভ—১১০

জ্ঞানদাস—২৫, ৩০, ৩৮, ৬৩, ৬৪, ৭৫, ৭৮, ৮৫, ৮৭, ১০৫, ১০৮ ১১

গোবিন্দদাস—২২, ২৮, ৪৩, ৫২, ৫৬, ৬৫, ৮৪, ৮৬, ৯২, ১০১, ১০৬ ১১

চণ্ডীদাস—২১, ২৩, ২৪, ৩৯, ৪০, ৪৪, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫৪, ৫৫, ৫৯, ৭০,
১০৯=১৪

জগন্নাথদাস—৪৬

নরহরি—৭৯

নরসিংহদাস—৫

নরোত্তম—৬৭, ৬৮, ৯৪=৩

প্রেমদাস—১৭, ৫৮=২

বলরামদাস—৭, ৮, ১৪, ১৫, ১৬, ১৮, ২৭, ২৯, ৩৫, ৪১, ৪২, ৪৫, ৫৩, ৮১;
৯৫, ১০০, ১০৭—১৭

বংশীদাস—২, ৩১, (বংশীবদন ১৯) ৩

বিদ্যাপতি—২০, ২৬, ৬০, ৬১, ৬৬, ৭১, ৭২ ৭৩, ৭৬ ৮৮, ৮৯ ১১

বিপ্রদাস ঘোষ—৬

বৃন্দাবন দাস—৭৭

মাধব দাস—১১

যদুনন্দন দাস—১

যদুনাথ দাস—৩২, ৩৭ ২

যাদবেন্দ্র—১০

রায়বসন্ত—৯০, ৯১, ৯৩, ৯৭, ৯৮, ৯৯=৬

রায় শেখর—৫১, ৬২, ৬৯, ৯৬, ১০২, ১০৪ ৬

লোচন—৭৪, ৮৩=২

শ্রীনিবাস আচার্য—৩৪

পদসূচী		পদসংখ্যা
অঙ্গে অঙ্গে মণি মুকুতা—বলরাম	...	৩৫
অমৃত মথিয়া কেনা ননি—লোচন	...	৮৩
অরুণ অধর উরে—অজ্ঞাত	...	৩
অহে নাথ কিছুই না জানি—রায় বসন্ত	...	৯০
আইস আইস বন্ধু—অজ্ঞাত	...	৭৪

(১) সিন্ধুড়া

দেবী ভগবতী পৌর্ণমাসী খ্যাতি
প্রভাতে সিনান করি।
কানুর দরশে চলিলা হরষে
আইলা নন্দের বাড়ী॥
শিরে শুভ্র কেশ তপসির ১ বেশ
অরুণ বসন পরি।
বেদময় কথা ঘন হালে মাথা
করেত ২ লগুড় ধরি॥
দেখি নন্দরাণী ধাইয়া অমনি
পড়িয়া ৩ চরণ-তলে।
তারে কোলে লৈয়া শির পরশিয়া
আশিস-বচন বোলে ৪॥
সতী-শিরোমণি অখিল-জননী
পরাণ-বাঞ্ছিনি মোর।
পতি পুত্র সহ ধেনু বৎস সব
কুশলে থাকুক তোর॥
রাণী তারে লৈয়া ত্বরিতে আসিয়া
দেখায় পুত্রের মুখ।
গায়ে হাত দিয়া উঠায় ধরিয়া
স্নেহে দরদর বুক॥
নয়নের নীরে স্তন-খির-ধারে ৫
ভিগয়ে শয়ন ৬ বাস।
ধনিষ্ঠার পাশে দেখি মনে হাসে
এ যদুনন্দন দাস॥

তরু, ২৫৩৮

পাঠান্তর:—

রবীন্দ্রনাথ ধৃত পাঠ—

(১) তপস্বীর বেশ (২) করেতে (৩) পড়িলা (৪) বলে (৫) ক্ষীর (৬) বসন (এই পাঠ অনেক ভাল, শয়ন বাস এখানে নিরর্থক)

টীকা—

পৌর্ণমাসী—ইনি শ্রীকৃষ্ণের অধ্যাপক সান্দীপনির মাতা; যোগমায়া ভগবতীর

তত্ত্ব। রাধাকৃষ্ণের মিলনের বিঘ্নসমূহ দূর করাই ইহাঁর কার্য।

ঘন ছালে মাথা—বারবার মাথা নাড়াইতে থাকেন।

ধনিষ্ঠা—শ্রীরাধার সখী; ইতি ললিতা সখীর যূথের অন্তর্গত। কবি **যদুনন্দন দাস** নিজেকে এই ধনিষ্ঠার অনুগত মঞ্জরীরূপে চিত্রিত করিয়াছেন।

(২) মায়ুর

ধাতু প্রবাল-দল নব গুঞ্জাফল
ব্রজ-বালক সঙ্গে সাজে।
কুটিল কুন্তল বেঢ়ি মণি মুকুতা ঝুরি
কটিতটে ঘুংগুর বাজে॥
নাচত মোহন বাল গোপাল।
বরজ-বধূ মেলি দেওই ১ করতালি
বোলই ভালিরে ভাল ॥
নন্দ সুনন্দ ২ যশোমতি রোহিণি
আনন্দে সুত-মুখ চায়।
অরুণ দৃগঞ্চল কাজরে রঞ্জিত
হাসি হাসি দশন দেখায়॥
বংশী ৩ কহই সব ব্রজ-রমণীগণ
আনন্দ-সায়রে ৪ ভাস।
হেরইতে পরশিতে লালন ৫ করইতে
স্তন-খিরে ৬ ভীগল বাস॥

তরু ১১৫৪

রবীন্দ্রনাথ ধৃত পাঠ—

(১) দেই (২) সুন্দর (৩) বংশি (৪) সাগরে (৫) নালন (৬) ক্ষীরে

(৩) সুহই

অরুণ অধর উরে নবনী লাগিয়াছে রে
মরি মরি বাছনি কানাই।
হেরি যশোমতী ১ প্রেমেতে পূরিত আঁখি
আয় কোলে বলিহারি যাই॥
করে মোছে অধর মিঠাই।২
আয় মোর বাছনি কানাই॥

তরু ১১৬৩

রবীন্দ্রনাথ ধৃত পাঠ—

(১) যশোমতি (২) মোছাই

(৪) ধানশী

কত ভংগী জান গোপাল নাচিতে নাচিতে।
অরুণ-কিরণ দেখি১ চরণ তুলিতে॥
বাঘ২-নখ মণিহার হিয়ার মাঝে দোলে।
চরণে নূপুর কিবা রুনু ঝুনু বোলে॥
গোপাল নাচিছে তুড়ি দিয়া।
কোথা গেলা নন্দরায় আনন্দ বহিয়া যায়
দেখসিয়া নয়ান৩ ভরিয়া॥
চিত্র বিচিত্র নাট চরণে চাঁদের হাট
চলে৪ যেন খঞ্জনিয়া পাখী।
সাধ করিয়া মায় নূপুর দিয়াছে পায়
পা খানি তুলিয়া নাচ দেখি॥

তরু ১১৬৮

পদরসসারে 'চরণে নূপুর কিবা রুনু ঝুনু বোলে'র পর আছে—
হেন কালে নন্দরায় আইল বাথান হৈতে।
কেমন নাচিলি বাপ নাচ আমার সাক্ষাতে॥
গোঠে মাঠে যাইতে তোরে সঙ্গে করি নিব।
মিঠ ননী দুগ্ধের সর নিতি খাইতে দিব॥
কেমনে নাচিলি বাছা নাচ আর বার।
তবে সে গঠিয়া দিব গজমতি হার॥

পদটির শেষে নিম্নলিখিত ভণিতা পদরসসারে আছে—
যাদু পদ-চিহ্ন তায় পৃথক্ পড়িয়া যায়
ধবজ-বজ্রাঙ্কুশ তাহে সাজে।
যাদবেন্দ্র দাসে কয় নাটুয়া গোবিন্দ রায়
প্রেমভরে অধিক বিরাজে॥

রবীন্দ্রনাথ ধৃত পাঠ—
(১) দিছে (২) ব্যাঘ্র (৩) নয়ন (৪) চলয়ে খঞ্জনিয়া পাখী

(৫) ভাটীয়ারি

মরি বাছা ছাড়রে নন্দন।
কলসী উলাইয়া তোমারে লইব এখন॥
মরি তোমার বালাই লইয়া আগে আগে চল ধাইয়া
ঘাঘর নূপুর কেমন বাজে শুনি।

রাঙ্গা লাঠি দিব হাতে খেলাইও শ্রীদামের সাথে
ঘরে গেলে দিব ক্ষীর ননী॥
মুই রইনু তোমা লইয়া গৃহকর্ম গেল বইয়া
মোর১ হবে কেমন উপায়।
কলসী লাগিল কাঁখে ছাড়রে অভাগী মাকে
হের মেঘ ধবলী পিয়ায়॥২
মায়ের করুণা ভায় শুনিয়া ছাড়িল বাস
আগে আগে চলে ব্রজরায়।
কিঙ্কিণী কাছনি ধ্বনি অতি সুমধুর শুনি
রাণী বোলে সোনার বাছা যায়॥
ভুবন মোহিয়া উরে আঙ্গুলের নখবরে
সোনায় বান্ধিয়া খোপা তায়।
ধাইয়া যাইতে পিঠে অধিক আনন্দ উঠে
নরসিংহ দাসে গুণ গায়॥

পদকল্পলতিকা পৃঃ ৯

(১) পদকল্পলতিকাতে 'মোরে' পাঠ আছে, কিন্তু পদরত্নাবলীতে 'তোরে' ছাপা হইয়াছে। (২) হের দেখ ধবলী পিয়ায়—পদকল্পলতিকা।
হের মেঘ ধবলী পিয়ায়—পদরত্নাবলী
পাদটীকায় ইহার অর্থ লেখা হইয়াছে—"ঐ দেখ মেঘবর্ণ গাভী পানিয়া যাইতেছে।" খুব সম্ভব এখানে ধবলী গাভীর নাম এবং মেঘ বৎসের নাম; ঐ দেখ ধবলী গাভী তাহার বৎস মেঘকে দুধ খাওয়াইতেছে।

(৬) ধানশী

আগে মা আজি আমি চরাব বাছুর।
পরাইয়া দেহ ধড়া মন্ত্র পড়ি বান্ধ চূড়া
চরণেতে পরাহ নূপুর॥
অলকা তিলক ভালে বন-মালা দেহ গলে
শিঙ্গা বেত্র বেণু১ দেহ হাতে।
শ্রীদাম সুদাম দাম সুবলাদি বলরাম২
সভাই দাঁড়াইয়া৩ রাজপথে।
বিশাল৪ অর্জুন গোন কিঙ্কিনী অংশুমান
সাজিয়া সভাই গোঠে যায়।
গোপালের কথা৫ শুনি সজল-নয়নে রাণী
অচেতনে ধরণী৬ লোটায়॥

[চঞ্চল ৭ বাছুরি সনে কেমনে ধাইবা বনে
কোমল দুখানি রাঙ্গা পায়।।]
বিপ্রদাস ঘোষে বলে এ বয়সে গোঠে ৮ গেলে
প্রাণ কি ধরিতে পারব মায়॥

সং ৮০ তরু ১১৭৫

পাঠান্তর সং

(১) নড়ি

(২) বসুদাম

(৩) ডাডাঞা

(৪) বন্ধনীর মধ্যের অংশ সংকীর্ত্তনামৃতে নাই রবীন্দ্রনাথে আছে

(৫) বাণী

(৬) অবনি রবীন্দ্রনাথ ধরণী লুটায়

(৭) বন্ধনীর ভিতরকার অংশ সংকীর্ত্তনামৃতে নাই রবীন্দ্রনাথে আছে কিন্তু ধাইবা স্থলে ধাইবি পাঠ আছে।

(৮) বনে

টীকা—শ্রীরূপ গোস্বামীর মতে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীদাম সুদাম স্তোককৃষ্ণ সুবল অংশুমান, বসুদাম কিঙ্কিনী অর্জুন দেবদত্ত সুনন্দ বরূথপ নন্দক বিশাল প্রভৃতি অন্তরঙ্গ সখা। জ্ঞানদাস ইঁহাদের প্রত্যেককে লইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পদ লিখিয়াছেন।

(৭) ভাটিয়ারি

গোঠে আমি যাব মা গো গোঠে আমি যাব।
শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে বাছুরি চরাব॥
চূড়া বাঁধি দে গো মা মুরলী দে মোর হাতে।
আমার লাগিয়া শ্রীদাম দাঁড়াইয়া ১ রাজপথে॥
পীতধড়া দে গো মা গলায় দেহ মালা।
মনে পড়ি গেল মোর কদম্বের তলা॥
শুনিয়া গোপালের কথা মাতা যশোমতী।
সাজায় বিবিধ বেশে ২ মনের আরতি॥
অঙ্গে বিভূষিত কৈল রতন ৩ ভূষণ।
কটিতে কিঙ্কিনী ধটী পীত বসন॥
কিবা সাজাইল রূপ ত্রিভুবন জিনি।
পুষ্প গুঞ্জা শিখি পুচ্ছ চূড়ার টালনি॥
চরণে নূপুর দিলা ৪ তিলক কপালে।
চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ রত্ন-হার গলে॥

বলরাম দাসে কয় সাজাইয়া রাণী।
নেহারি গোপালের৫ মুখ কাতর পরাণি॥

তরু ১২১৭

রবীন্দ্রনাথ ধৃত পাঠ—

(১) দাড়াঞা (২) বেশ (৩) বহু (৪) দিল (৫) গোপাল

(৮) মায়ের

দধি মন্থ-ধ্বনি শুনইতে নীলমণি
আওল সঙ্গে বলরাম।
যশোমতী হেরি মুখ পাওল মরমে সুখ
চুম্বয়ে চান্দ-বয়ান॥
কহে শুন যাদুমণি তোরে দিব ক্ষীর ননী
খাইয়া নাচহ মোর আগে।
নবনী-লোভিত হরি মায়ের বদন হেরি
কর পাতি নবনীত মাগে॥
রাণী দিল পুরি কর খাইতে রঙ্গিমাধর
অতি সুশোভিত ভেল তায়১।
খাইতে খাইতে নাচে কটিতে কিঙ্কিনী বাজে
হেরি হরষিত ভেল মায়॥
নন্দ-দুলাল নাচে ভালি।
ছাড়িল মন্থন দণ্ড উথলিল মহানন্দ
সঘনে দেই করতালি॥
দেখ দেখ রোহিণি গদ গদ কহে রাণী
যাদুয়া নাচিছে দেখ মোর।
ঘনরাম২ দাসে কয় রোহিনী আনন্দময়
দুহুঁ ভেল প্রেম বিভোর॥

মন্তব্য ঃ তরু ১১৫৭

পদরত্নাবলীতে 'ঘনরাম' স্থানে 'বলরাম' ভণিতা আছে।

রবীন্দ্রনাথধৃত অন্যান্য পাঠান্তর

(১) রাম। কিন্তু রাম শব্দের সহিত মায় শব্দের মিল হয় না তায় শব্দের মিল হয়: সুতরাং তরুধৃত পাঠই ঠিক।

(৯)

আজি এড়িয়া যারে
কালি গোপাল পাঠাব তোর সনে।
বাছুরি চরাইয়া এলো অমনি ঘুমাইল
কালি কিছু খায় নাই রাম রে॥

এলাইয়া কটীর ধটী বেড়ায় চরণ দুটি
আপনা আপনি পড়ে ফান্দে।
বালকে বালকে খেলে ঘর যাইতে পথ ভুলে
দুটি হাত মুখে দিয়া কান্দে॥
পরিবার ধড়া গাছি যারে হয় ভার।
কেমনে ব'বে শিংগা বেণু এই ভয় অপার॥
দণ্ডে দশবার খায় তার নাহি লেখা
নবনী লুব্ধ গোপাল পাছে এসে একা॥
আর এক কথা বলি শুন হলধর।
যশোদা-নন্দন বলি না ভাবিও পর॥
যাচিয়া নবনী দিও, নিকটে রাখিবে।
বেলা অবসান হৈলে সকলে আসিবে॥

পদকল্পলতিকা পৃঃ ১১

টীকা—আজি এড়িয়া যারে—আজকার মতন ছাড়িয়া দাও. আজ আর গোপালকে গোষ্ঠে লইয়া যাইও না।

রামরে—যশোদা বলরামকে এই কথা বলিতেছেন।

নবনীলুব্ধ গোপাল পাছে এসে একা—গোপাল ননী খাইতে এতই ভালবাসে যে হয়তো সে ননীর লোভে একাই গোষ্ঠ হইতে বাড়ীতে চলিয়া আসিতে যাইবে এবং পথ ভুলিয়া যাইবে।

(১০) শ্রীরাগ

আমার শপতি লাগে না ধাইহ ধেনুর আগে
পরাণের পরাণ নীলমণি।
নিকটে রাখিহ ধেনু পূরিহ মোহন বেণু
ঘরে বসি আমি যেন শুনি॥
বলাই ধাইবে আগে আর শিশু বাম ভাগে
শ্রীদাম সুদাম সব পাছে।
তুমি তার মাঝে ধাইয় সংগ ছাড়া না হইয়
মাঠে বড় রিপু-ভয় আছে॥
ক্ষুধা হৈলে লইয়া১ খাইয় পথ পানে চাহি যাইয়
অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে।
কারু বোলে বড় ধেনু ফিরাইতে না যাইয়া২ কানু
হাত তুলি দেহ মোর মাথে॥
থাকিবে৩ তরুর ছায় মিনতি করিছে মায়
রবি যেন না লাগয়ে গায়।

যাদবেন্দ্র৪ সঙ্গে লইয়া বাধা পানই হাতে থুইয়া৫
বুঝিয়া যোগাবে রাঙ্গা পায়॥

তরু ১১৮৯

রবীন্দ্রনাথ ধৃত পাঠ—

(১) চাহিয়া খাইয় (এই পাঠ 'লইয়া খাইয়' অপেক্ষা ভাল)।

(২) যাইহ (৩)থাকিহ (৪) যাদবেন্দ্রে (৫) বাধা পানুই থুইয়।

টীকা—

কারু বোলে বড় ধেণু—কাহারও কথায় যেন বড় বড় গোরু চরাইতে যাইও না।

বাধা পানই হাতে থুইয়া—বাধা শব্দ সংস্কৃত বধ্রা শব্দ হইতে উৎপন্ন, অর্থ—খড়ম। পানই 'উপানহ' শব্দের প্রাকৃত রূপ, অর্থ—চামড়ার জুতা। কবি যাদবেন্দ্র সখ্য ভাবের সেবার জন্য খড়ম ও জুতা হাতে করিয়া রাখিবেন, প্রয়োজন মত পরাইয়া দিবেন।

(১১) কামোদ

প্রণতি করিয়া মায় চলিলা যাদব রায়
আগে পাছে ধায় শিশুগণ।
ঘন বাজে শিঙ্গা বেণু গগনে গো খুর বেণু
শুনি১ সভাব হরষিত মন॥
আগে আগে বৎসপাল পাছে ধায় ব্রজবাল
হৈ হৈ শবদ২ ঘন রোল।
মধ্যে নাচি যায় শ্যাম দক্ষিণে সে বলরাম
ব্রজ বাসী হেরিয়া বিভোর॥
নবীন রাখাল সব আবা আবা কলরব
শিরে চূড়া নটবর-বেশ।
আসিয়া যমুনা-তীরে নানা রঙ্গে খেলা করে
কত কত কৌতুক বিশেষ॥
কেহো যায় বৃষ-ছান্দে কেহো কারো চড়ে কান্ধে
কেহো নাচে কেহো৩ গান গায়।
এ দাসে মাধব বলে কি শোভা যমুনা-কূলে
রাম কানাই আনন্দে খেলায়॥

রবীন্দ্রনাথধৃত পাঠ— তরু ১১৮৩

(১) সুর নব হরষিত মন (২) শব্দ (৩) কেহো কেহ গায়।

টীকা—

কেহো যায় বৃষ-ছান্দে—কেহ বা ষাঁড়ের মতন চলিতে লাগিল।

(১২) সারঙ্গ

নিরমল যমুনা— জল মাহা হেরই
আপন আপন তনু-ছাহ ১।
দশনহি অধর নয়ন করি বঙ্কিম
কোপ করয়ে পুন তাহ ২॥
খেনে তিরিভঙ্গ রঙ্গ করি রহতহিঁ
খেনে ৪ খেনে বেণু বাজায়।
খেনে ৫ তরুবর হীলন ৬ দেই রঙ্গহি
রঙ্গিম চরণ দোলায়॥
বিহরই নন্দ-দুলাল।
শৃঙ্গ মুরলি করে গলে গুঞ্জাবলি
চৌদিগে বেঢ়ি ব্রজবাল॥

তরু ১১৮৫

রবীন্দ্রনাথধৃত পাঠান্তর—

(১) ছায় (২) তায় (৩) করতহিঁ (৪) ক্ষণে ক্ষণে (৫) ক্ষণে (৬) হিলন

টীকা—

কোপ করয়ে পুন তাহ--শ্রীকৃষ্ণের চোখ-পাকানো দাঁত দিয়া ঠোঁটচাপা মূর্তির ছায়া জলে পড়িয়াছে, তাহা দেখিয়া তিনি ভাবিতেছেন অন্য কোন ছেলে বোধ হয় ঐরূপ করিয়া তাঁহাকে মারিতে আসিতেছে, তাই তাহার প্রতি কোপ প্রকাশ করিতেছেন।

(১৩) শঙ্করাভরণ

ভোজন সমাপি সবহুঁ ব্রজ-বালক
বৈঠল নীপক ছায়।
কালিন্দী-নীর সমীর বহই মৃদু
শীতল করু সব গায়॥
সুন্দর শ্যাম-শরীর।
শ্রীদামক কোরে অলসে তহিঁ শুতল ১
সুবল-কোরে বলবীর॥
নব নব পল্লব লেই সখাগণ
বীজই দুহুঁজন-অঙ্গে।
কোকিল ভ্রমর কানু-মুখ হেরি হেরি
গায়ই শবদ-তরঙ্গে॥

আলস তেজি বৈঠল নন্দ-নন্দন
দুরহি গেও সব ধেনু।
হেরইতে যতনে একযোগ কারণে
বায়ই ২ মোহন বেণু॥

তরু ১২০১

রবীন্দ্রনাথধৃত পাঠ—

(১) সুতল (২) বাজই

টীকা—

শ্রীদামক কোরে ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামের কোলে এবং বলরাম সুবলের কোলে শুইলেন।

বীজই—বীজন করে, বাতাস দেয়।

বায়ই—বাজায়।

(১৪) শ্রীরাগ

পাল জড় কর শ্রীদাম সান দেও শিঙগায়।
সঘনে বিষম খাই নাম করে মায়॥
আজি মাঠে আমাদের বিলম্ব দেখিয়া।
হেন বুঝি কান্দে মায় ১ পথ পানে চাইয়া॥
বেলি অবসান হৈল চল যাই ঘরে।
মায়ে না দেখিয়া প্রাণ কেমন জানি করে॥
বলরাম দাস কহে শুনি কানাইর বোল।
সকল রাখাল মাঝে পড়ে উতরোল॥

তরু ১২০৭

রবীন্দ্রনাথধৃত পাঠ—

(১) মা পথ পানে চাঞা

(১৫) ভাটিয়ারি

চাঁদমুখে বেণু দিয়া সব ধেনু নাম লইয়া
ডাকিতে লাগিলা উচ্চস্বরে।
শুনিয়া কানাইর বেণু ঊর্ধ্ব মুখে ধায় ধেনু
পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে॥
অবসান বেণু রব বুঝিয়া রাখাল সব
আসিয়া মিলল নিজ সুখে।
যে বনে যে ধেনু ছিল ফিরিয়া একত্র কৈল
চালাইলা গোকুলের মুখে॥

শ্বেত-কান্তি অনুপাম আগে ধায় বলরাম
আর শিশু চলে ডাহিন বাম।
শ্রীদাম সুদাম পাছে ভাল শোভা করিয়াছে
তার মাঝে নবঘন-শ্যাম॥
ঘন বাজে শিঙ্গা বেণু গগনে গো ক্ষুর-রেণু
পথে চলে করি কত ভঙ্গে।
যতেক রাখালগণ আবা আবা ঘনে ঘন
বলরাম দাস চলু সঙ্গে॥

তরু ১২০৮

(১৬) ইমন কল্যাণ

রাণী ভাসে আনন্দ-সাগরে।
বামে বসাইয়া শ্যাম দক্ষিণে বসাইয়া১ রাম
চুম্ব দেই মুখ-সুধাকরে॥
ক্ষীর ননী ছেনা সর আনিয়া সে থরে থর
আগে দেই রামের বদনে।
পাছে কানাইর মুখে দেয় রাণী মনসুখে২
নিরখয়ে চাঁদ-মুখ পানে॥
গোপের রমণী যত চৌদিগে শত শত
মুখ হেরি লহু লহু বোলে।
মাতা যশোমতী মেলি মঙ্গল হুলাহুলি
আরতি করয়ে কুতূহলে॥
জ্বালিয়া রতন-বাতি করে সব৩ আরতি
হরষিত যশোমতী মাই।
কহে বলরাম দাসে আনন্দ-সাগরে ভাসে
দোঁহ৪ রূপের বলিহারি যাই॥

রবীন্দ্রনাথ ধৃত পাঠ— তরু ১২১৪

(১) বসাই (২) মহাসুখে (৩) সভে (৪) দুহুঁ

টীকা—

দক্ষিণে বসাইয়া রাম—বলরামকে ডাহিন দিকে বসাইয়া। লহু লহু বোলে—মৃদু-স্বরে বলে।

(১৭) ভাটিয়ারি

আজু বনে আনন্দ বাধাই।
পাতিয়া বিনোদ খেলা আনন্দে হইলা ভোলা
দূর বনে গেল সব গাই॥

ধেনু না দেখিয়া বনে চমকিত১ রাখালগণে
শ্রীদাম সুদাম আদি সঙ্গে২
কানাই বলিছে ভাই খেলা ভাঙ্গা যাবে৩ নাই
আনিব গোধন বেণু-রবে॥
সব ধেনু নাম কৈয়া অধরে মুরলী লৈয়া
ডাকিয়া পুরিল উচ্চস্বরে।
শুনিয়া বেণুর রব ধায় ধেনু বৎস সব
পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে॥
ধেনু সব সারি সারি হাম্বা হাম্বা রব করি
দাঁড়াইল কৃষ্ণের নিকটে।
দুগ্ধ স্রবি পড়ে বাঁটে প্রেমের তরঙ্গ উঠে
স্নেহে গাভী শ্যাম-অঙ্গ চাটে॥
দেখি সব সখাগণ আবা আবা ঘনে ঘন
কানুরে করিল আলিঙ্গন।
প্রেমদাস কহে বাণী কানাইর মুরলী শুনি
পশুপাখী পাইল চেতন॥

তরু ১২০৩

রবীন্দ্রনাথধৃত পাঠান্তর—

(১) চকিত (২) সবে (৩) হবে

টীকা—

আনন্দ বাধাই—আনন্দ বর্দ্ধিত হইল, বাধাই শব্দের উৎসব অর্থও পাওয়া যায়।

(১৮) শ্রীরাগ

যমুনার তীরে কানাই শ্রীদামেরে লৈয়া।
মাথামাথি রণ করে শ্রমযুত হৈয়া॥
প্রখর রবির তাপে শুখাইল মুখ।
দেখি সব সখাগণের মনে হইল দুখ॥
আর না খেলিব ভাই চল যাই ঘরে।
সকালে যাইতে মা কহিয়াছে সভারে॥
মলিন হইল কানাই মুখখানি তোমার।
দেখিয়া বিদরে হিয়া আমা সভাকার॥
বেলি অবসান হৈল চল ঘরে যাই।
কহে বলরাম দূর বনে গেল গাই॥

তরু ১২০৬

(১৯) বরাড়ি

বড়ি মাই কানুরে পরাণ পোড়ে মোর।
যমুনা-পুলিন বনে দেখ্যাছি ১ রাখাল সনে
খেলা-রসে হৈয়াছিল ভোর॥
বংশী বটের তল ছায়া অতি সুশীতল
তাহাতে যাইতে না লয় মন।
রবির কিরণে চান্দ মুখখানি ঘামিয়াছিল
ভোখে আঁখি অরুণ-বরণ॥
পীত ধড়ার ২ অঞ্চল ঘামে তিতিয়াছিল
ধূলায় ধূসর শ্যাম কায়া।
মোর মনে হেন হয় ৩ যদি নহে লোক ভয়
আঁচর ঝাঁপিয়া করোঁ ৪ ছায়া॥
কি করিব কোথা যাব এ দুখ কাহারে কব
না কহিলে মনে লেথা লাগে।
বংশীবদনে কয় কি করিবে লোক-ভয়
কহ যাইয়া ৫ যশোদার আগে॥

তরু ১৩৫০

রবীন্দ্রনাথধৃত পাঠান্তর—

(১) দেখিয়াছি (২) ধড়া অঞ্চল (৩) লয় (৪) করি (৫) যাএগা

টীকা-

বড়িমাই—বড়াই, ঠান্‌দিদি।

(২০) ধানশী

খেনে খেনে নয়ন-কোণে ১ অনুসরই।
খেনে খেনে বসন ধূলি তনু ২ ভরই॥
খেনে খেনে দশন ৩ ছটাছটি ৪ হাস।
খেনে খেনে অধর আগে করু ৫ বাস॥
চৌঙকি ৬ চলয়ে খেনে খেনে চলু মন্দ।
মনমথ-পাঠ ৭ পহিল ৮ অনুবন্ধ॥
হৃদয়জ ৯ মুকুলিত হেরি হেরি থোর।
খেনে আঁচর দেই খেনে হয়ে ১০ ভোর॥
বালা শৈশবে ১১ তরুণে ভেট।
লখই না পারিয়ে ১২ জেঠ কনেঠ॥
বিদ্যাপতি কহে ১৩ শুন বর কান।
তরুণিম শৈশব চিহ্নই ১৪ না জান॥

পাঠান্তর :—

(১) নয়ন-কোণ—ক্ষ

(২) ভরে—ক্ষ

(৩) দশনকো—ক্ষ

(৪) ছটাছট—স

(৫) গহে—ক্ষ; গহ—রবীন্দ্রনাথ

(৬) চোঙর্মকিত—কী; চঙকি—ক্ষ

(৭) মনমথ-পাঠকো—ক্ষ

(৮) করি—ক্ষ

(৯) হৃদয় মুকুলিত হেরি থোরি থোরি—ক্ষ; রবীন্দ্রনাথ 'থোরি' স্থলে 'থোর' পাঠ লইয়াছেন।

(১০) ভই—ক্ষ

(১১) শৈশব তারুণ—স; রবীন্দ্রনাথ

(১২) পারই—স

(১৩) কহ—স, ক্ষ

(১৪) চিনই—কী

রবীন্দ্রনাথ 'খেনে খেনে' স্থলে 'ক্ষণে ক্ষণে' পাঠ ধরিয়াছেন।

টীকা—

চৌঙকি—চমকিত হইয়া

হৃদয়জ মুকুলিত—ছোট কুচ

ক্ষ ১।৬, স ৮২,
তরু ৮৩, কী ১৪০

(২১) সিন্ধুড়া

রাধার কি হৈল অন্তরে বেথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো ১ কথা॥
সদাই ধেয়ানে ২ চাহে মেঘ পানে
না ৩ চলে নয়ান-তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে
যেমত যোগিনী পারা॥
আউলাইয়া বেণী ফুলয়ে ৪ গাথনী
দেখয়ে খসাঞা ৫ চুলি।
হসিত-বদনে চাহে ৬ মেঘ পানে
কি কহে দুহাত তুলি॥

এক দিঠ করি ময়ূর ৮-ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরখনে।
চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়
কালিয়া বন্ধুর সনে॥

গী ১৪৯
তরু ৩০
কী ৪৮
নচ ৫০·

পাঠান্তর :—

(১) কাহারু—গী, রবীন্দ্রনাথ
(২) ধিয়ানে—গী
(৩) নাচান নয়ান তারা- কী
নয়নের তারা—রবীন্দ্রনাথ
(৪) ফুল সে- গী; ফুলেতে—কী, খুলয়ে- নী
(৫) খসাইয়া—গী, দেখয়ে—কী
দেখয়ে আপন চুলি—রবীন্দ্রনাথ
(৬) চাহি—গী; চাহে চন্দ্র পানে—নী
(৭) মাগয়ে দুই হাত তুলি--কী
কি চাহে দু হাত তুলি - রবীন্দ্রনাথ
(৮) মউরা মউরী—রবীন্দ্রনাথ

(২২) **শ্রীরাগ**

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনী বহিয়া যায়।
ঈষত হাসির তরঙ্গ হিলোলে
মদন মুরছা পায়॥
কি বা সে নাগর কি খেনে দেখিলু
ধৈরজ রহল দূরে।
নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল
কেন বা সদাই ঝুরে॥
হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া
নাচিয়া নাচিয়া যায়।
নয়ান-কটাখে বিষম-বিশিখে
পরাণ বিন্ধিতে ধায়॥
মালতী ফুলের মালাটি গলে
হিয়ার মাঝারে দোলে।

উড়িয়া পড়িয়া মাতল ভ্রমরা
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে॥
কপালে চন্দন— ফোঁটার ছটা
লাগিল হিয়ার মাঝে।
না জানি কি ব্যাধি মরমে বাঁধল
না কহি লোকের লাজে॥
এমন কঠিন নারীর পরাণ
বাহির নাহিক হয়।
না জানি কি জানি হয়ে পরিণামে
দাস গোবিন্দ কয়॥

গী ১৬২, স ৩৭
তরু ১৫২
কী ৭৮

কোন পাঠান্তর নাই।

(২৩) আশাবরী

রমণীর মণি পেখলুঁ আপনি
ভূষণ সহিতে গায়।
দেখিতে দেখিতে বিজুরি ঝলকে ১
ধৈরজে ধৈরজ যায়॥
সই, চাহনি মোহনি থোর।
মরম বান্ধলুঁ ২ হেরিয়া ভুলিলু
রূপের নাহিক ওর॥
বদন-ছান্দ ৩ কামের ফান্দ
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে।
কেশের আগ চুম্বয়ে চাগ
ফিরিয়া ফিরিয়া বান্ধে॥
বসন খসয়ে অঙ্গুলি চাপয়ে
কর ৪ সে কড়ছে থুইয়া।
দেখিয়া লোভয়ে মদন খোভয়ে
কেমনে ধরিব হিয়া॥
জলের কান্ধারে কেশের আন্ধারে
সাপিনী লাগয়ে মোয়।
কেমনে কামিনী আছয়ে আপনি
এমন সাপিনী থোয়॥

দশন-কাঁতি মুকুতা পাঁতি
হাস উগারয়ে৫ শশী।
পরাণ-পুতলী হইল পাগলী
মরমে৬ রহল পশি॥
শুনে৭ যে হিয়া রহল পড়িয়া
বস্তু৮ রহল তায়।
চণ্ডীদাস কয় ফিরি দেখা হয়
তবে সে পরাণ রয়৯॥

গী ৩৬৩
তরু ২০৩
কী ১৩৫

পাঠান্তর ঃ—

(১) চমকে—গী; বিজুরীময়—রবীন্দ্রনাথ
(২) মরমে লাগিল, হেরিয়া বুঝিল—গী
(৩) চান্দ—কী
(৪) কড়ছে কড়ছ থুয়া—গী
(৫) উগারে
(৬) মনে যে লাগিল পশি—গী; মনেতে না গল পশি—রবীন্দ্রনাথ
(৭) শুধু যে হিয়া—গী
(৮) বস্তু যে চলিল তায়—গী; বস্তু যে চলিয়া যায়—রবীন্দ্রনাথ
(৯) প্রায়—রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ 'ভূষণ সহিত গায়' স্থলে 'আভরণ সহিত গায়', 'চুম্বয়ে চাগ' স্থলে 'চুম্বয়ে টাগ' পাঠ ধরিয়াছেন।

(২৪) ধানশী

সজনি-ও ধনি কে কহ বটে।
গোরোচনা-গোরি নবীন কিশোরী
নাহিতে দেখিনু ঘাটে॥
শুন হে পরাণ সুবল সাঙ্গাতি
কে ধনি মাজিছে গা।
যমুনার১ তীরে বসি তার নীরে
পায়ের উপরে পা।
অঙ্গের বসন করাছে আসন
আলাঞা২ দিয়াছে বেণী।

উচ কুচ-মূলে ৩ হেমহার দোলে
সুমেরু-শিখর ৪ জানি॥
সিনিয়া উঠিতে নিতম্ব ৫ তটীতে
পড়্যাছে চিকুর-রাশি।
কান্দিয়া ৬ আন্ধার কনক-চান্দার
শরণ লইল আসি॥
কি বা সে দুগুলি শঙ্খ ঝলমলি
সরু সরু শশি-কলা।
মাজিতে উদয় শুধু সুধাময়
দেখিয়া হইনু ভোলা॥
চলে নীল শাড়ী নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি
পরাণ সহিত মোর।
সেই হৈতে মোর হিয়া ৭ নহে থির
মনমথ-জ্বরে ভোর॥
কহে চণ্ডীদাসে বাসুলী আদেশে
শুন হে নাগর ৮ চান্দা।
সে যে বৃষভানু রাজার নন্দিনী
নাম বিনোদিনী রাধা॥

গী ৩৬০
তরু ২১০
কী ১৩০
নচ ১৬০ (নী ১৩)

ঢাকা মিউজিয়মের ১১৬ সংখ্যক পুথিতে জগন্নাথ দাস ভণিতা।
পদকল্পতরুর খ-৮ পুথিতে, পদরসসারে এবং পদরত্নাকরে ভণিতা
দাস লোচন, কহয়ে বচন।

পাঠান্তর—গী

(১) কালিন্দীর তীরে
(২) আউলাইয়া
(৩) কুচযুগমূলে
(৪) সুমেরু শিখরে জনি
(৫) নিতম্ব তটেতে
১ কালিয়া আঁধার কনক চাঁপার, শরণ লৈয়াছে আসি
মন নহে থির; চিত বেয়াকুল—রবীন্দ্রনাথ
শুনহে শ্যামর চান্দা

রবীন্দ্রনাথ 'সজনি ও ধনি' স্থলে 'সখা হে ও ধনী কহ বটে' পাঠ ধরিয়াছেন।

টীকা—

কান্দিয়া আন্ধার কনক চাঁদার ইত্যাদি—স্নানের পর চুলের গোছা নিতম্বের উপর ও কয়েকটি অলকগুচ্ছ রাধার মুখের উপর পড়িয়াছে, দেখিয়া কবি বলিতেছেন যেন অন্ধকার আসিয়া কনক-চন্দ্র রূপে নায়িকার মুখের শরণ লইল।

কিবা সে দুগুলি শঙ্খ ঝলমলি সরু সরু শশি-কলা ইত্যাদি—রাধার হাতে যে শাঁখা আছে তাহাতে দুইটি গুল্ আছে; শাঁখা মাজিবা মাত্র মনে হয় অমৃত দিয়া তৈরী সরু সরু চন্দ্রকলা যেন নায়িকার করে আসিয়া উদিত হইয়াছে।

মন্তব্য :—

প্রাক্‌চৈতন্যযুগে সুবল শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম সখা মাত্র, নর্মসখা নহেন। রাধাও সে যুগে বৃষভানু রাজার নন্দিনী বলিয়া পরিচিত নহেন। সেই জন্য এই পদটি চৈতন্যোত্তর যুগের রচনা বলিতে হয়।

(২৫) তুড়ি

মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে এথা
শুন শুন পরাণের সই।
স্বপনে দেখিলু যে শ্যামল বরণ দে
তাহা বিনু আর কারো নই॥
রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া-গরজন
রিমি ঝিমি ১ শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ন রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে॥
শিখরে শিখণ্ড-রোল মত্ত দাদুরী-বোল
কোকিল কুহরে কুতূহলে।
ঝিঁঝা ঝিনিকি বাজে ডাহুকী ২ সে গরজে
স্বপন দেখিলু হেন কালে॥
মরমে পৈঠল সেহ হৃদয়ে লাগল দেহ
শ্রবণে ভরল সেই বাণী।
দেখিয়া তাহার রীত যে করে দারুণ চিত
ধিক্ রহু কুলের কামিনী॥
রূপে গুণে রস-সিন্ধু মুখ-ছটা জিনি ইন্দু
মালতীর মালা গলে দোলে।
বসি মোর পদতলে গায়ে হাত দেই ছলে
"আমা কিন বিকাইলু" বোলে॥

কিবা সে ভুরুর ভঙ্গ ভূষণ ৩-ভূষিত অঙ্গ
কাম মোহে নয়ানের কোণে।
হাসি হাসি কথা কয় পরাণ কাড়িয়া লয়
ভুলাইতে কত রঙ্গ জানে॥
রসাবেশে দেই কোল মুখে ৪ নাহি সরে বোল
অধরে অধর পরশিল।
অঙ্গ অবশ ভেল লাজ ভয় মান গেল
জ্ঞানদাস ৫ ভাবিতে লাগিল॥

গী ২৬৩
তরু ১৪৪
৬১ কী (অজ্ঞাত)

পদরত্নাকরে ভণিতা—

কি কহিব সখি আর অঙ্গ পরশিতে তার
আনন্দে হইলুঁ অগেয়ান।
বলরাম দাসে বটে সে জন তোমার বটে
ইথে কিছু না ভাবিহ আন॥

পাঠান্তর—

(১) ঝন ঝন শবদে বরিষে গী
(২) ডাহুকী সঘনে গর্জে কী
(৩) ভূষণের ভূষণ অঙ্গ গী
(৪) মুখে নিরসে বোল গী
(৫) জলদে বিজুরি আগোরল কী

এই পদটির পরিবেশটি রামানন্দ বসুর নিম্নলিখিত পদ হইতে লওয়া—

শাঙন মাসের দে রিমি ঝিমি বরিখে
নিন্দে তনু নাহিক বসন।
শ্যাম বরণ এক পুরুষ আসিয়া মোর
মুখ ধরি করয়ে চুম্বন॥
বলি সুমধুর বোল পুন পুন দেই কোল
লাজে মুখ রহিলুঁ মোড়াই।
আপনা করয়ে পণ সবে মাগে প্রেমধন
বলে কিন যাচিয়া বিকাই॥
চমকি উঠিলুঁ জাগি কাঁপিতে কাঁপিতে সখি
যে দেখিলুঁ সেহ নহে সতি।
আকুল পরাণ মোর দুনয়নে বহে লোর
কহিলে কে যায় পরতীতি॥

কিবা সে মধুর বাণী অমিয়ার তরঙ্গিণী
কত রঙ্গ-ভঙ্গিমা চালায়।
কহে বসু রামানন্দে আনন্দে আছিল নিন্দে
কেন বিধি চিয়াইল তায়॥

তরু ১৪৫

(২৬) শঙ্করাভরণ

এ ধনি কমলিনি শুন হিত বাণী।
প্রেম করবি অব[১] সুপুরুষ জানি॥
সুজনক প্রেম হেম সমতুল।
দহিতে কনক দ্বিগুণ হয় মূল॥
টুটইতে নাহি টুটে প্রেম অদভুত।
যৈছনে বাঢ়ত মৃণালক সুত॥
সবহুঁ মতঙ্গজে মোতি নাহি মানি।
সকল কণ্ঠে নাহি কোয়িল-বাণী॥
সকল সময় নহে ঋতু বসন্ত।
সকল পুরুখ নারি নহে গুণবন্ত॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
প্রেমক রীতি অব বুঝহ বিচারি॥

স ১০৭
তরু ১০৯
কী ১৬২

পদরসসারে অতিরিক্ত কলি--

সবহু মাহ না মুঞ্জরে চুত।
সম্পতি না রহে দিন বহুত॥
যাহা সম্পতি তাহা বিপতি হোয়।
তিন পঞ্চাশ তিন জিবই কোয়॥

পাঠান্তর—

(১) যব—স, কী

টীকা—

দহিতে কনক দ্বিগুণ হয় মূল—অগ্নিতে শোধিত হইলে স্বর্ণের মূল্য বৃদ্ধি পায়।

(২৭) মল্লার রাগ

কিশোর বয়স কত বৈদগধি ঠাম।
মূরতি মরকত অভিনব[১] কাম॥

প্রতি অংগ কোন বিধি নিরমিল কিসে।
দেখিতে দেখিতে কত অমিয়া বরিষে॥
মলু২ মলু কিবা রূপ দেখিনু স্বপনে।
খাইতে শুইতে মোর লাগিয়াছে মনে॥
অরুণ অধর মৃদু মন্দ মন্দ হাসে।
চঞ্চল নয়ন-কোণে জাতিকুল নাশে॥
দেখিয়া বিদরে বুক দুটি ভুরু ভংগী।
আই আই কোথা ছিল সে৩ নাগর রংগী॥
মন্থর চলন খানি আধ আধ ৪ যায়।
পরাণ যেমন করে কি কহব ৫ কায়॥
পাষাণ মিলাঞা যায় গায়ের বাতাসে।
বলরাম দাস বলে অবশ ৬ পরশে॥

গী ১০৮
তরু ১৪৬
কী ৫১

পাঠান্তর :—

(১) অতি নবকাম কী
(২) মৈলু মৈলু কিনা রূপ—গী
মরি মরি কিবা রূপ—কী
(৩) ও নাগর রংগী -কী
(৪) আধ আধ চায়—কী
(৫) কি কহিব -গী
কহন না যায়—কী
(৬) ও রস-পরশে গী
কি হয় পরশে- কী

টীকা—

বৈদগধি—বিদগ্ধতা, রসজ্ঞতা
আই আই—আশ্চর্য-বোধক অব্যয় শব্দ।

(২৮) **শ্রীরাগ**

ভালে সে চন্দন চান্দ কামিনী মোহন ফাঁদ
আন্ধারে১ করিয়া আছে আলা।
মেঘের উপরে কিবা সদাই উদয় করে
নিশি দিশি শশী ষোলকলা॥
সই—কিবা সেই ২ নয়ান-চাহনি

আঁখির হিলোলে মোর পরাণ-পুতলী দোলে
দিতে চাহি৩ যৌবন নিছনি॥
কিবা সে চূড়ার ঠাট দশ-নখ চান্দ-নাট
অপরূপ বাঁশী বাজাইতে।
হেরইতে সেই মুখ মনে হয় যত সুখ
জিতে কি পারিয়ে পাসরিতে॥
কুলশীল যত ছিল মনে লাগে সব৪ গেল
দেখিয়া বারেক সেই রূপ।
গোবিন্দদাসের চিতে ঐছন লাগয়ে গো
নব অনুরাগের স্বরূপ॥

স ৭৭
তরু ২৬৯

পাঠান্তর—স

(১) আন্ধারেতে করিয়াছে
(২) নয়ন নাচনি
(৩) চাঁহো; চাই—রবীন্দ্রনাথ
(৪) তাহা গেল

টীকা—

ভালে সে চন্দন চান্দ—কপালে চন্দন দিয়া অঙ্কিত চাঁদ

মেঘের উপরে কিবা ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ শ্যামবর্ণ বলিয়া তাঁহাকে মেঘ বলা হইয়াছে। চন্দনে আঁকা চাঁদ শ্রীকৃষ্ণরূপ মেঘের উপরে দিন রাত ষোলকলায় পূর্ণ চাঁদের মতন শোভা পাইতেছে।

(২৯) কামোদ

কপালে চন্দন চান্দ নাগরী মোহন ফান্দ
আধ টানিয়া চূড়া বান্ধে।
বিনোদ ময়ূরের পাখে জাতি কুল নাহি রাখে
মোঁ পুনি ঠেকিলুঁ ওনা ফান্দে॥
সই কি আর কি আর বল মোরে।
জাতি কুল শীল দিয়া ওরূপ নিছনি লইয়া
পরাণে বান্ধিয়া থোব তারে॥
দেখিয়া ওমুখ ছান্দ কান্দে পুনমিক চান্দ
লাজ ঘরে ভেজিয়া আগুনি॥
নয়ান কোণের বাণে হিয়ার মাঝারে১ হানে
কিবা দুটি ভুরুর নাচনি।

আই আই মলুঁ মলুঁ কি রূপ দেখিয়া আলু
কালা অঙ্গে পড়িছে বিজুরি।
স্বরূপ দঢ়াইলুঁ মনে এরূপ যৌবন সনে
আপনা সাজায়া দিব ডালি॥
কিখনে দেখিলুঁ তারে না জানি কি কৈল মোরে
আট প্রহর প্রাণ ঝুরে।
বলরাম ২ দাসে কয় ওরূপ দেখিয়া তায়
কোন বা পামরী রহে ঘরে॥

স ৭৮
কী৭৩

পাঠান্তর—

(১) ভিতরে কী
(২) বলরাম দাস বোলে ওরূপ দেখিলে-কি
বলরাম দাস কহে ওরূপ দেখিয়া গো
কোন বা পামরী রবে ঘরে রবীন্দ্রনাথ

(৩০) **ধানশী**

হাসিয়া হাসিয়া মুখ নিরখয়ে
মধুর কথাটি কয় ১।
ছায়ার সহিতে ছায়া মিশাইতে
পথের নিকটে রয়॥
আলো সই সে জন মানুষ নয়।
তাহার সঙ্গে যে পিরীতি করয়ে
কি জানি কি তার হয়॥
সহজ রসের আকর সে যে
ভাবের অন্ত না তায় ২।
বাতাসে বসন উড়িতে আপন
অঙ্গে ঠেকাইয়া যায়॥
চমক চলনি ও গীম-দোলনি
রমণী-মানস-চোর
জ্ঞানদাস কহে সে পিয়া-পিরিতী
মরমে পশিল তোর॥

তরু ৬৯১

পাঠান্তর :—

(১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ জ্ঞানদাসের পদাবলীতে পাঠ ধরা হইয়াছে—

হাসি হাসি মোর মুখ নিরখয়ে
মনে মনে কথা কয়।

ইহার চেয়ে পদকল্পতরু ও রবীন্দ্রনাথ ধৃত পাঠ ভাল। 'মনে মনে কথা কয়' পাঠ ধরার দরুণ ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে—"আবেগের আতিশয্যে শ্রোতা বিনা আপনার সঙ্গেই কথা বলে।" এত কষ্ট-কল্পনা না করিয়া 'মধুর কথাটি কয' বলিলে পূর্বরাগের ভাব ভাল প্রকাশ পায়।

(২) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণের পাঠ—

সহজে রসের আকার কতেক
ভাবের উদয় তায়॥

মাঝখানে যতি-বোধক কমা দিলেও অর্থ ভাল হয় না। পদকল্পতরু ও রবীন্দ্রনাথ ধৃত পাঠ অর্থ গৌরবে সমৃদ্ধ।

(৩১) ধানশী

হেন রূপ কবহুঁ১ না দেখি।
যে অঙ্গে নয়ন থুই সেই অঙ্গ হৈতে মুঞি
ফিরাইয়া লৈতে২ নারি আঁখি॥
অঙ্গে নানা অভরণ কালিন্দী-তরঙ্গে যেন
চাঁদ ঝলিছে৩ হেন বাসি।
মিশামিশি হৈল রূপে ডুবিলাম রসের কূপে
প্রতি অঙ্গে হেরি কত শশী।
কিবা মেঘে ঘন আভা পীত-বসন-শোভা
অলপ উড়িছে মন্দ বায়।
কিবা সে মোহন চূড়া দো-সূতী মুকুতা বেড়া
মত্ত-মউর-পুচ্ছ তায়॥
গলায় কদম্ব-মালা জিনিয়া মদন-কলা
অধরে মধুর মৃদু হাস।
তাহাতে মুরলী পূরে২ অবলা পরাণে ঝুরে
বলিহারি যায়৩ বংশীদাস।

পদকল্পলতিকা পৃঃ ২২
অঃ ৩৬৫ পদরসসার

পাঠান্তর :—

(১) কভু—পদকল্পলতিকা

(২) ফিরাইয়া আনিতে নারি আঁখি—রবীন্দ্রনাথ

(৩) চলিছে – রবীন্দ্রনাথ

(২) মুরলী ধ্বনি, অবলা পরাণে ঝুরি—রবীন্দ্রনাথ

(৩) যাও—পদকল্পলতিকা ও রবীন্দ্রনাথ

(৩২) **শ্রীরাগ**

কে যাবে মথুরা দিকে যাব তার সনে।
ভেটিব নাগর কানু সাধ আছে মনে॥
পরোক্ষে পরের মুখে শুনি কানু গুণ।
শুনিয়া আমার চিতে বিন্ধিলেক ঘুণ॥
নিতি নিতি অনুরাগে হারাব আপনা।
যে হকু সে হকু দেখিব কাল১ সোনা॥
অলখে লখিব কানুরে না দিব পরিচয়।
বিচ্ছিন্ন হইয়া যাব গুরুকুলের ভয়॥
না পরিব আভরণ না করিব বাস।২
তনু আচ্ছাদিয়া লব নিজ নীলবাস॥
যদি বা নাগর দিঠে দিঠি পড়ে মোর।
রাখিতে নারিব তনু হইব বিভোর॥
তোমরা যতেক সখী মোরে রাখিহ গোপতে।
রাধা বলি কানু যেন না পারে লখিতে॥
যদুনাথ দাস বলে একি মনে লয়।
পূর্ণিমার চাঁদ কভু হাত আড়ে রয়॥

পদকল্পলতিকা পৃঃ ১৫

রবীন্দ্রনাথধৃত পাঠান্তর—

(১) কেলেসোনা

(২) নাশ—(ছাপার ভুল) পদকল্পলতিকা।

(৩৩) **সিন্ধুড়া**

কি পেখলু বরজ— **রাজ-কুল-নন্দন**
রূপে হরল পরাণ।
নিরমিয়া রস-নিধি **আমারে না দিল বিধি**
প্রতি অঙ্গে লাখ '১ নয়ান॥

একে সে চিকণ তনু — কাঞ্চণ অভরণ
কিরণহি[১] ভুবন উজোর।
দরশনে লোরে — আগোরল লোচন
না চিনিলু কাল কি গোর॥
সহজে দৃগঞ্চল — অরুণ-কঞ্জ-দল
তাহে কত ফুল শর সাজে।
দিঠি[২] মোর পরশিতে — ও হাসি অলখিতে
শেল রহল হৃদি মাঝে॥
সরস কপোল — লোল মণি-কুন্ডল
ঝাঁপল দিনকর-ভাস।
ও রূপ-লাবণি — দিঠি ভরি না পেখনু
দুখিয়া অনন্ত দাস॥

ক্ষ ১৫।৩
স ৭৭

পাঠান্তর :—

(১) অধিক—রবীন্দ্রনাথ ও স
(২) ও রূপ বিলাস হাস — নাহি পেখলু
শেল রহল হৃদি মাঝে। —রবীন্দ্রনাথ

টীকা :—

সহজে দৃগঞ্চল অরুণ-কঞ্জদল—নয়নের প্রান্ত স্বভাবতঃ পদ্মের পাঁপড়ির ন্যায় অরুণ বর্ণ।

(৩৪) সুহই

বদন-চান্দ কোন — কুন্দারে কুন্দিলে গো
কে না কুন্দিলে দুই আঁখি।
দেখিতে দেখিতে মোর — পরাণ যেমন করে
সেই সে পরাণ তার সাখী॥
রতন[১] কাড়িয়া অতি[২] — যতন করিয়া গো
কে না গঢ়িয়া দিল কাণে।
মনের সহিতে মোর — এ পাঁচ পরাণি গো
যোগী হবে[৩] উহারি ধেয়ানে॥
অমিয়া মধুর বোল — সুধা খানি খানি গো
হাতের উপর নাহি পাঙ।
এমতি করিয়া যদি — বিধাতা গঢ়িত গো॥
ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া উহা খাঙ॥

মদন-ফান্দ গুনা   চূড়ার টালনি গো
উহা না শিখিয়া আইল কোথা।
এ বুক ভাসিয়া মুঞি   উহা না দেখিলুঁ গো
এ বড় মরমে মোর বেথা॥
নাসিকার আগে দোলে ৪   এ গজ মুকুতা গো
সোণায় মণ্ডিত তার পাশে।
বিজুরি জড়িত যেন   চাঁদের কণিকা ৬ গো
মেঘের আড়ালে থাকি হাসে॥
বলয় কঙ্কণ বাজন   বাহুর বলনি গো
হিঙ্গুলে মণ্ডিত তার আগে।
যৌবন বনের পাখী   পিয়াসে মরয়ে গো
উহারি পরশ রস মাগে।
নাটুয়া ঠমকে যায় ৯   বহিয়া বহিয়া চায়
চলে যেন গজরাজ মাতা।
শ্রীনিবাস দাসে কয়   লখিলে লখিল নয়
রূপসিনা গঢ়ল বিধাতা॥

ভ ৪৮২
স ৪২৭
তরু ৭৯০

পাঠান্তর ঃ—

(১) পদামৃতসমুদ্রে ভক্তিরত্নাকরে ও রবীন্দ্রনাথে অতিরিক্ত
সিন্দুর কপালে শোভিত   সুন্দর তিলক গো।
তাহে সাজে অলকার পাঁতি।
মেঘের (ক) উপরে যেন   ঝলমল করে গো
চাঁদে যেন ভ্রমরার ভাতি॥

(ক) হিয়ার মাঝারে মোর ভ
(২) কিবা, কেশ রবীন্দ্রনাথ
(৩) হৈল (৪) উপরে শোভা (৫) সহিতে (৬) কলিকা (৭) কবিবর
(৮) অতিরিক্ত পদামৃতসমুদ্রে ভক্তিরত্নাকরে এবং রবীন্দ্রনাথে
মধুর মধুর হাসা   গোলে খানি গো
হাতের উপরে লাগি পাই।
এমতি করিয়া যদি   বিধাতা গঢ়িত গো
ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া উহা খাই॥
(৯) চলিতে চলিতে যায়   ফিরিয়া ফিরিয়া চায়
যেন গজরাজ মদ মাতা।   (সমুদ্র)

ভক্তিরত্নাকরে—

ঠমকি ঠমকি যায়　　তেরছ নয়নে চায়
যেনমত গজরাজ মাতা।
শ্রীনিবাস দাসে কয়　　ও রূপ লখিল নয়
রূপ সিন্ধু গঢ়ল বিধাতা॥

রবীন্দ্রনাথে—

নাটুয়া ঠমকে যায়　　ফিরিয়া ফিরিয়া চায়

(৩৫) ভাটিয়ারী

অঙ্গে অঙ্গে মণি　　মুকুতা খেচনি
বিজুরী চমকে তায়।
ছি ছি কি অবলা　　সহজে চপলা
মদন মুরছা পায়॥
মরোঁ[1] মরোঁ সই ও রূপ নিছিয়া লৈয়া।
কি জানি কি খেণে　　কো বিহি গঢ়ল
কি রূপ মাধুরী দিয়া॥
ঢুলু ঢুলু দুটি　　নয়ন ২-নাচনি
চাহনি মদন-বাণে
তেরছ বন্ধানে　　বিষম সন্ধানে
মরমে মরমে হানে॥
চন্দন-তিলক　　আধ ঝাঁপিয়া
বিনোদ চূড়াটী বান্ধে।
হিয়ার ভিতরে　　লোটায়্যা লোটায়্যা
কাতরে পরাণ কান্দে॥
আধ চরণে　　আধ চলনি
আধ মধুর হাস।
এই সে লাগিয়া　　ভালে সে ঝুরিয়া
মরে বলরাম দাস॥

গী ১০৫
তরু ৭৯১
কী ৪২

পাঠান্তর—গী

(১) মরি সই

(২) নয়ান কোণেতে

(৩) মোহন

টীকা :—

ছি ছি কি অবলা সহজে চপলা ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখিয়া নারীর কথা দূরে থাকুক—নারী তো সহজেই চপল ভাবাপন্না—স্বয়ং মদন মূর্ছিত হন।

তেরছ বন্ধানে—বক্রভঙ্গিতে, তির্যক্ দৃষ্টিতে।

(৩৬) রামকেলী

আলো সই করিব কি।
পরাণ পরবশ জীবারে ১ জি॥
কি দিয়া নিরমিল কেমন বিধি।
রূপের নাহি সীমা গুণের নিধি॥
লখিল নহে রূপ লখিল নয়।
যে অঙ্গে পড়ে দিঠি সে অঙ্গে রয়॥
দেখিতে দেখিতে মনে এমনি ২ লয়।
সকল অঙ্গে যদি নয়ান হয়॥
যখন শ্যাম বন্ধু বাঁশীটি পুরে।
বনের পশু কান্দে বিরিখি ঝুরে॥
যখন তরুতলে বাঁশীটি বাজে।
পরাণ যেমন করে না কহি লাজে॥
নয়ান-কোণে তার আছে কি ধন।
যার লাগি জাতি কুল করিলু পণ॥

তরু ৭৯২

পদরত্নাবলীতে পাঠান্তর :—

(১) পরাণ পরবশ জী বারেঙ্গী (অর্থ, প্রাণ বাহির হইবে)

(২) এমন

টীকা :—

জীবারে জি—বাঁচতে হয়, তাই বাঁচি। বিরিখি—বৃক্ষ।

(৩৭) শ্রীরাগ

রাই! কত পরখসি আর।
তুয়া আরাধন মোর বিদিত সংসার॥
যজ্ঞ দান তপ জপ সব তুমি ১ মোর।
মোহন মুরলী আর নয়ানকো ২ লোর॥

বিনোদিনি! হাসিয়া৩ বোলাও।
ফুল ৪-শরে জর জর জনেরে জীয়াও॥
কুটিল কুন্তল বেঢ়ি কুসুমকো জাদ।
নয়ন-কটাক্ষ তোমার বড় পরমাদ॥
সীঁথের সিন্দুর দেখি দিনমণি ৫ ঝুরে।
এত রূপ গুণ যার সে কেন নিঠুরে॥
বিনোদিনি! চাহ মুখ তুলি।
(তোমার) নয়ন-নাচনে নাচে পরাণ পুতলী॥
পীত পিন্ধন মোর তুয়া অভিলাষে।
পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিশ্বাসে॥৬
হিয়ার মাঝারে উঠে রসের হিলোলি।
পরশিতে করি সাধ (তোর) ৬ পায়ের অংগুলি॥
যদুনাথ দাস কহে এ নহে যুকতি।
কানু কাতর বড় রাখহ পিরীতি॥

ক্ষ ৯।৯, ২০।৬

(১) তুয়া—রবীন্দ্রনাথ
(২) বয়ানকো বোল—তরু নয়ানকো লোর—প।
(৩) চাহ মুখ তুলি—রবীন্দ্রনাথ
(৪) তোমার নয়ান নাচিলে নাচে পরাণ পুতলি—প
(৫) দিনকর—রবীন্দ্রনাথ
(৬) তুয়া—রবীন্দ্রনাথ

ক্ষ ২০।৬ তে

"পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিশ্বাসে'র পর আছে—

রতন মঞ্জীর কিবা পরাণ-পুতলী।
কত সাধে সুধা-সাঁচে বিধি নিরমিলি॥
তাহে ভূষণ দিল রস-পরসংগ।
সো মানে মলিন ভেল মনমথ ভংগ॥

টীকা:—

পরখসি—পরীক্ষা করিতেছ।

(৩৮) ইমন

কি মোহন নন্দকিশোর।
হেরইতে রূপ মদন-মন ১ ভোর॥
অংগহি অংগ তরংগ বিথার।
জলদ-পটল বরিখত রসধার॥

মুখে হাসি মিশা বাঁশী বায়।
বমিয়া ২ অমিয়া নিধু জগত মাতায়॥
গলে গজ মোতিম মাল।
করিবর কর কিয়ে বাহু বিশাল॥
কুলবতি পরশ না পাই।
অনুখন চন্দন দিন যাই ভাই॥
শুনিতে চিনি সুধা খানি।
জ্ঞানদাস আশ করত সোই বাণী॥

গী ৮
তরু ২৪৩৬

পাঠান্তর—গী

(১) ভেল (২) অমিয়া বমিয়া
বমিয়া অমিয়া নিধু রবীন্দ্রনাথ
(৩) কুলবতী পরশ না পাই রবীন্দ্রনাথ

(৩০) সুহই

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥
রাতি কৈলুঁ দিবস দিবস কৈলুঁ রাতি
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পিরীতি॥
ঘর কৈলু বাহির বাহির কৈলু ঘর।
পর কৈলু আপন আপন কৈলু পর॥
কোন বিধি সিরজিলে১ সোতের শেহলি।
এমন ব্যথিত নাই ডাকে বাঁধা বলি॥
বঁধু ২ তুমি যদি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥
বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়।
পরের লাগিয়া কি আপনা পর হয়॥

তরু ৮০৫
কী ৩১০

পাঠান্তর কী

(১) নিরমিল, কোন বিধি সিরজিল স্রোতের সেঁয়লি—রবীন্দ্রনাথ
(২) নিদারুণ নৈয় বঁধু নিদারুণ নৈয়।
মরিব তোমার আগে দাঁড়ায়া চাহিয়॥

ক্ষী এবং পদরত্নাকারে পাঠ—

চণ্ডীদাস কহে হিয়া শুনিতে যুড়ায়।
এমন পিরীতি আর না দেখি কোথায়॥

রবীন্দ্রনাথে পাঠ—

তুমি মোরে যদি প্রভু নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥
চণ্ডীদাস কহে এই বাশুলি কৃপায়।
পরের লাগিয়া কি আপন পর হয়॥

(৪০) **ধানশী**

শরদ-পূর্ণিমা নিরমল রাতি
উজোর সকল বন।
মল্লিকা মালতী বিকসিত তথি১
মাতল ভ্রমরাগণ॥
তরু কুল ভল ফুল ভরি ডাল
সৌরভ পূরিল তায়।
দেখিয়া সে শোভা জগমনলোভা
ভুলিলা নাগর-রায়॥
নিধুবনে আছে রতন-বেদিকা
মণি মাণিকেতে বান্ধা।
ফটিকের তরু শোভিয়াছে চারু
তাহাতে হীরার ছান্দা॥
চারি পাশে সাজে প্রবাল মুকুতা
গাঁথনি মাঠনি কত।
তাহাতে বেঢ়িয়া কুঞ্জ-কুটীর
নিরমাণ শত শত॥
নেতের পতাকা উড়িছে উপরে
কি তার কহিব শোভা।
অতি রম্য স্থল বেদ অগোচর
কি কহিব তার আভা॥
মাণিকের ঘটা কিরণের ছটা
এমতি মণ্ডপ-ঘর।
চণ্ডীদাস বোলে অতি অপরূপ
নাহিক যাহার পর॥ তরু ১২৯১

রবীন্দ্রনাথের পাঠান্তর— (১) অতি

(৪১) ভৈরবী

মধুর সময় রজনি-শেষ
শোহই মধুর কানন-দেশ
গগনে উয়ল মধুর মধুর
বিধু নিরমল-কাঁতিয়া।
মধুর-মাধবি-কেলি-নিকুঞ্জ
ফুটল মধুর কুসুম পুঞ্জ
গাবই মধুর ভ্রমরা ভ্রমরি
মধুর মধুহি মাতিয়া॥
আজু খেলত আনন্দে ভোর
মধুর যুবতি নব কিশোর।
মধুর বরজ-রঙ্গিণি মেলি
করত মধুর রভস কেলি॥
মধুর পবন বহই মন্দ
কুজয়ে কোকিল মধুর ছন্দ
মধুর বিহসি শবদ-সুভগ
নদাহ ১ বিহগ-পাঁতিয়া।
রবই ২ মধুর শারি কীর
পঢ়ই ৩ ঐছন অমিয়া-গীর
নটই মধুর মউর মউরি
রটই মধুর ভাতিয়া॥
মধুর মিলন খেলন হাস
মধুর মধুর রস-বিলাস
মদন হেরই ধরণি লুঠই
বেদন ফুটই ছাতিয়া।
মধুর মধুর চরিত-রীত
বলরাম-চিতে ফুরউ নীত
দুহুঁক মধুর চরণ সেবন
ভাবনে জনম যাতিয়া ৪॥

পাঠান্তর—কী

(১) নন্দই বিহগ
(২) বড়ই মধুর
(৩) অমিয়া যৈছন পড়ই থির
(৪) ছাতিয়া; জাতিয়া—রবীন্দ্রনাথ

তরু ২৪৯৭
কী ২০৮

রবীন্দ্রনাথ 'মধুর মাধবি-কেলি নিকুঞ্জ' স্থলে পাঠ ধরিয়াছেন—'মধুর মাধুরী কেলি নিকুঞ্জ'।

টীকা :—

শোহই—শোভা পাইতেছে

নীত—নিত্য

(৪২) ধানশী

তুমি মোর নিধি রাই তুমি মোর নিধি।
না জানি কি দিয়া তোমা নিরমিল বিধি॥
বসিয়া দিবস রাতি অনিমিখ আঁখি।
কোটি কলপ যদি নিরবধি দেখি॥
তভু তিরপিত নহে দুইটি নয়ান।
জাগিতে তোমারে দেখি সপন সমান॥
নীরস * দরপণ দূরে পরিহরি।
কি ছার কমলের ফুল বটেক না করি॥
ছি ছি কি শরদের চান্দ ভিতরে কালিমা।
কি দিয়া করিব তোমার মুখের উপমা॥
যতনে আনিয়া ১ যদি ছাকিয়া বিজুরি।
অমিয়ার সাথে ২ যদি গড়াইয়ে পুতলি॥
রসের সায়রে ৩ যদি করাইয়ে সিনান।
তভুত না হয় তোমার নিছনি সমান॥
হিয়ার ভিতরে থুইতে নহে পরতীত।
হারাঙ হারাঙ হেন সদা করে চীত॥
হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈলে বাহির।
তেঞি বলরামের পহুঁর চীত নহে থীর॥

স ৩৯৬
সং ১৭০
তরু ২০০৫
কী ৩১৫

পাঠান্তর :—

(১) বিধি—কী
(২) সাচে—রবীন্দ্রনাথ
সাজে যদি গড়ায় পুতলি ছানিয়া বিজুলি—রবীন্দ্রনাথ

(৩) নিতি

* অতিরিক্ত কলি —কী—
দেখিতে দেখিতে আঁখি কাঁদে দেখিবারে।
পরশিতে চাহে অঙ্গ পরশিবার তরে॥
শুনিতে শুনিতে তোমার মুখের মধুর বাণি।
শুনিবারে কাঁদে মোর পোড়য়ে পরাণি॥
নিরমল কুলশীলের তুমি ত ভূষণ।
তুমি মোর দারিদ্র্যের অমূল্য রতন॥
ঘৃত দধি করি পিউ হেন লয় মনে।
অঞ্জন করিয়া পড়ু এ দুই নয়নে॥
চন্দন করিয়া তোমা মাখ মুঞি গায়।
না জানি দগধ প্রাণ তবে কী জুড়ায়॥
রাই আর না লয় মোর চিতে।
রাতি দিন প্রাণ কাঁদে নাহি পাসরিতে॥
মথিয়া সুধার সিন্ধু লইয়া তার সারে।
পরাণ পুতলি করি গড়ল তোমারে॥

টীকা :—

বটেক—আট মাষায় এক বটক

(৪৩) ধানশী

কুল-মরিযাদ- কপাট উদঘাটলুঁ
তাহে কি কাঠ কি ১ বাধা।
নিজ মরিযাদ সিন্ধু সঞে পঙরলুঁ
তাহে কি তটিনি অগাধা॥
সহচরি মঝু পরিখণ কর দূর।
যৈছে হৃদয় করি পন্থ হেরত হরি
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর॥
কোটি কুসুম-শর বরিখয়ে যছু পর
তাহে কি জলদ-জল লাগি।
প্রেম-দহন ৩-দহ যাক হৃদয় সহ
তাহে কি বজরক ৪ আগি॥
যছু পদতল নিজ জীবন সোঁপলুঁ
তাহে কি তনু অনুরোধ।
গোবিন্দদাস ৫ কহই ধনি অভিসর
সহচরি পাওল ৬ বোধ॥

স ১৪৪
র ৩৩
তরু ৯৮৮
কী ১৮১

পাঠান্তর—

(১) কপাট কি—স এবং কী
(২) পৈরলু; ডারনু—রবীন্দ্রনাথ
(৩) প্রেম দহনে—রবীন্দ্রনাথ
(৪) বজর কি—রবীন্দ্রনাথ
(৫) গোবিন্দদাস কহ ধনি ধনি অভিসার—স ও রবীন্দ্রনাথ
গোবিন্দদাস কহু ইথে কি বিচার—কী
(৬) পায়ল—রবীন্দ্রনাথ

টীকা ঃ—

কুল-মরিয়াদ কপাট উদঘাটলু ইত্যাদি—

কুলমর্যাদারূপ কঠিন কপাটই যখন খুলিয়া ফেলিয়াছি তখন আর ছার কাঠের কপাট কি বাধা দিবে? নিজের মর্যাদারূপ সমুদ্র হইতে যখন পার হইয়া আসিয়াছি, তখন আর যমুনা নদীর জল অগাধ বলিয়া কি ভয় দেখাইতেছ?

কোটি কুসুমশর ইত্যাদি—যাহার উপর কোটি কোটি মদন বাণ নিক্ষেপ করিতেছে, সে আর সামান্য মেঘের বর্ষণে কি ভয় করিবে?

যছু পদতল নিজ জীবন ইত্যাদি—যাঁহার পায়ের তলায় নিজের জীবনই উৎসর্গ করিয়াছি তাঁহার কাছে যাইতে যদি দেহকে বিপন্নই করিতে হয় তাহাতে কি আসে যায়?

(৪৪) সুহই

এই১ ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে।
না জানি কানুর প্রেম তিলে জনি ছুটে॥
গড়ন ভাঙ্গিতে সই আছে কত খল।
ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে সে বড় বিরল॥
যথা তথা যাই আমি যত দুখ২ পাই।
চাঁদমুখের মধুর হাসি৩ তিলেক জুড়াই।
সে৪ হেন বন্ধুরে মোর যে জন ভাঙ্গায়।
হাম নারী অবলার বধ লাগে তায়॥
চণ্ডীদাস কহে রাই ভাবিছ অনেক।
তোমার পিরিতি বিনে না জিয়ে তিলেক॥

তরু ৮১৪
কী ৩০৩

রবীন্দ্রনাথে পাঠান্তর—

(১) সেই মনে অই ভয় উঠে,

শ্যাম বন্ধুর পিরীতখানি তিলেকে জানি টুটে।

ভাঙিগলে গঢ়িতে পারে সে বড় সুজন।

(২) যতদূর (খুব সম্ভব ছাপার ভুল, কেননা 'যতদূর পাই' শব্দের সঙ্গত অর্থ এখানে পাওয়া যায় না)।

(৩) হাসে তিলেকে।

(৪) এমন বন্ধুরে মোর যে জন ভাঙিগবে।

অবলা রাধার বধ তাহারে লাগিবে॥

(৪৫) ধানশী

আপন শপতি করি হাত দিয়া মাথে।
সুধুই শরীর মোর, প্রাণ তোমার হাতে॥ ১
বন্ধু হে তোমারে বুঝাই।
সভাই বলে আমি তোমার তেঁঞি জীতে চাই॥
নিরবধি তোমা লাগি দগধে পরাণ।
তিলেক দাঁড়াও কাছে জুড়াকু নয়ান ২॥
কি লাগি দারুণ চিত কাঁদে দিন রাতি।
কহে বলরাম বড় বিষম পিরিতি॥

তরু ৮১৮
কী ৩১৩

পাঠান্তর—কী

(১) সাথে (২) পরাণ

(৪৬) ললিত রাগ

রাস জাগরণে নিকুঞ্জ-ভবনে
আলুয়্যা আলস-ভরে।
শুতলি কিশোরী আপনা পাসরি
পরাণনাথের কোরে॥
সখি হের দেখসিয়া বা।
নিন্দ যায় ধনী ও চাঁদ-বদনী
শ্যাম-অঙ্গে দিয়া পা॥
নাগরের * বাহু করিয়া শিথান
বিথান ১ বস ভূষা।

নিশ্বাসে দুলিছে রতন ২-বেশর
হাসিখানি ৩ তাহে মিশা॥
পরিহাস ৫ করি নিতে চাহে হরি
সাহস ৪ না হয় মনে।
ধীরি করি বোল না করিহ রোল
দাস জগন্নাথ ভণে॥

স ২৩৬
তরু ১০৮৩
কী ২৮৮ (গোবিন্দ দাস)
পদরসসার

পাঠান্তর—
(১) বিথার বসন ভূষা—কী
(২) বেশর মুকুতা—সা, রবীন্দ্রনাথ
(৩) মুখে হাসি আছে মিশা—কী
(৪) সোথায় না পায়—স, রবীন্দ্রনাথ
সাহস নাহিক হয়—কী
* কীতে অতিরিক্ত—
জলদ বরণে অধিকে শোভিছে
রাইয়ের বরণ খানি
এ তিন ভুবনে তুলনা নাহিক
কোরে নব কামিনী॥
(৫) পরিহাস করি, নিতে চায় হরি, সাহস নাহিক হয়।
ধীর করি বোল, নাহি কর রোল, দাস গোবিন্দ কয়॥ কী
পদরসসারের পুথিতে পাঠ—দ্বিজ চণ্ডীদাসে ভণে।

(৪৭) শ্রীরাগ

আজু রসে বাদর নিশি।
ভাবে নিমগন ভেল বৃন্দাবনবাসী॥
প্রেম পিছল পথ গমন ভেল বঙ্ক।
মৃগমদ চন্দন কুঙ্কুমে ভেল পঙ্ক॥
শ্যাম-ঘন বরিখয়ে প্রেম-সুধা-ধার।
কোরে রঙ্গিণী রাধা বিজুরী সঞ্চার॥
দিগ বিদিগ নাহি প্রেমের পাথার।
ডুবিল অনন্ত দাস না জানে সাঁতার॥

ক্ষণদা ১৪।৮
তরু ১২৯৭

পাঠান্তর—

তরুতে ভণিতা "ডুবল নরোত্তম না জানে সাঁতার।"

টীকা—

শ্যামঘন বরিখয়ে ইত্যাদি—

শ্যামরূপ মেঘ যেন প্রেমসুধারূপ বারি বর্ষণ করিতেছেন, আর সেই মেঘের কোলে যেন রঙ্গিনী রাধারূপ বিদ্যুৎ খেলিয়া যাইতেছে।

(৪৮) সুহই

বঁধু কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈয় তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিব প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী॥
ভাবিয়াছিলাম এ তিন ভুবনে
আর মোর কেহ আছে।
রাধা বলি কেহ সুধাইতে নাই
দাঁড়াব কাহার কাছে॥
একুলে ওকুলে দুকুলে গোকুলে
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটি কমল-পায়॥
না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর।
আঁখির১ নিমিষে যদি নাহি হেরি
গতি যে নাহিক মোর॥
ভাবিয়া২ দেখিনু প্রাণনাথ বিনে
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কহে পরশ-রতন
গলায় গাঁথিয়া পরি॥

ক°: ৭৪১

রবীন্দ্রনাথ ধৃত পাঠ—

(১) ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিনে

(২) আঁখির নিমিখে যদি নাহি দেখি

মৎসম্পাদিত 'চণ্ডীদাসের পদাবলী'র (সাহিত্য পরিষদ সং) ৫৪-৫৫ পৃষ্ঠায় এই পদের পূর্ণতর রূপ দেওয়া হইয়াছে।

(৪৯) শ্রীরাগ

বিবিধ কুসুম যতনে আনিয়া
গাঁথিলুঁ পিরীতি-মালা।
শীতল নহিল পরিমল গেল
জ্বালাতে জ্বলিল গলা॥
সই মালী কেন হেন হৈল।
মালায় করিয়া বিষ মিশাইয়া
হিয়ার মাঝারে দিল॥
জ্বালায় জ্বলিয়া উঠিল যে হিয়া
আপদ মস্তক চুল।
কি কহিব সখি না শুনি না দেখি
আগুন হইল ফুল॥
ফুলের উপর চন্দন লাগল
সংযোগ হইল ভাল।
দুই এক হৈয়া পোড়াইল হিয়া
পাঁজর ধসিয়া গেল॥
ধসিতে ধসিতে সকলি ধসিল
নির্মূল১ হৈল দেহ।
চণ্ডীদাসে কয় কহিলে না হয়
ঐছন কানুর লেহ॥

তরু ৮৮৩

পাঠান্তর—

(১) নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'নির্মল হইল দেহ' পাঠ ধরিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে পদটির ভাবের পৌর্বাপর্য রক্ষা পায় না।

(৫০) সিন্ধুড়া

দেখিলে কলঙ্কীর মুখ কলঙ্ক হইবে।
এ জনার মুখ আর দেখিতে না হবে॥
ফিরি ঘরে যাও নিজ ধরম লইয়া।
এ দেশে না রব মুঞি যাব বাহিরাইয়া॥
কালা মাণিকের মালা গাঁথি নিব গলে।
কানু-গুণযশ কাণে পরিব কুণ্ডলে॥

কানু-অনুরাগ-রাঙ্গা বসন পরিয়া।
দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া॥
চন্ডীদাসে কহে কেনে হইলে উদাস।
মরণের সাথী যেই সে কি ছাড়ে পাশ॥

তরু ৮৪৪

(৫১) সুহই

নিধুবনে শ্যাম বিনোদিনী ভোর।
দুহুঁক রূপের নাহিক উপমা
প্রেমের নাহিক ওর॥
হিরণ কিরণ আধ বরণ
আধ নীল-মণি-জোতি।
আধ ১ উরে বন- মালা বিরাজিত
আধ গলে ২ গজমোতি॥
আধ শ্রবণে মকর-কুন্ডল
আধ রতন-ছবি।
আধ কপালে চান্দের উদয়
আধ কপালে রবি॥
আধ শিরে শোভো ময়ুর-শিখণ্ড
আধ শিরে দোলে বেণী।
কনক কমল করে ঝলমল
ফণী উগারয়ে মণি॥
মন্দ পবন মলয় শীতল
কুন্তল উড়য়ে বায়।
রসের পাথারে না জানে সাঁতারে
ডুবল ৩ শেখর রায়॥

তরু ৩০০

রবীন্দ্রনাথে পাঠান্তর—

(১) আধ পরে বন (উরে মানে বক্ষে, কিন্তু 'আধ পরে' পাঠ ধরিলে সম্মিলিত রাধাকৃষ্ণের অর্ধদেহ পরে, মানে করিতে হয়)।

(২) আধ পরে গজমোতি

(৩) ডুবিল

পদকল্পলতিকায় (পৃঃ ৩৪) পাঠ—

শিরিষ কুসুম ঝলমল করে, ফণী যেন উগরল মণি॥
প্রেমের নাহিক ওর॥

আধ শিরে শোভে ময়ূর মুকুট, আধ পিঠে দোলে বেণী।
শিরিষ কুসুম ঝলমল করে, ফণী যেন উগরল মণি॥
এক শ্রবণে মকর কুণ্ডল, এক শ্রবণে রতন ছবি॥
সৌরভে আকুল কুঞ্জ ভবন, তরু লতা দোলে মন্দ বায়।
নিকুঞ্জ মন্দিরে, রসের সায়র, বাহিরে শেখর রায়॥

(৫২) ভূপালি

পৌখলি রজনি পবন বহে ১ মন্দ।
চৌদিশে ২ হিম হিমকর কর বন্ধ॥
মন্দিরে রহত সবহুঁ তনু কাঁপ।
জগজন শয়নে নয়ন রহুঁ ঝাঁপ॥
এ সখি হেরি চমক মোহে লাই।
ঐছে সময়ে অভিসারল রাই॥
পরিহরি তৈছন সুখময় শেজ।
উচ-কুচ-কঞ্চুক ভরমহি তেজ॥
ধবলিম এক ৩ বসনে তনু গোই।
চললিহ কুঞ্জে লখই নাহি ৪ কোই॥
কোমল চরণ তুহিনে নাহি দলই।
কণ্টক ৫ বাটে কতিহুঁ নাহি টলই॥
গোবিন্দদাস কহ ইথে কি সন্দেহ।
কিয়ে বিঘিনি যাঁহা নূতন নেহ॥

স ১৩৮
তরু ৩২৬
কী ২১৮

পাঠান্তর—

(১) বহ—কী ও রবীন্দ্রনাথ
(২) চৌদিকে হিমবার হিমহি বন্ধ—কী
(৩) একু—স
(৪) নহ—স
(৫) কণ্টকি—স

টীকা-

পৌখলি রজনি—পৌষ মাসের রাত্রি

বিঘিনি—বিঘ্ন

(৫৩) বিভাস

মীটল ১ চন্দন টুটল অভরণ
ছুটল কুন্তল-বন্ধ।
অম্বর খলিত গলিত কুসুমাবলি
ধূসর দুহুঁ মুখ-চন্দ॥
হরি হরি অব দুহুঁ শ্যামর-গোরি।
দুহুঁক পরশ-রভসে দুহুঁ মুরছিত
শূতল হিয়ে হিয়ে জোরি॥
রাইক বাম জঘন পর নাগর
ডাহিন চরণহি আপি।
নওল কিশোরি অগোরি কোর পহু
ঘুমল মুখে মুখ ঝাঁপি॥
কিয়ে মদন-শর-ভীতহি সুন্দরি
পৈঠলি ২ পিয়-হিয় মাহ।
কব বলরাম নয়ন ভরি হেরব
করব অমিয়া-অবগাহ॥

তরু ২৪৭৭
কী ২৩৭

রবীন্দ্রনাথ ধৃত পাঠ—

(১) মিটল

(২) বৈঠলি পিয়া হিয়া মাহ

টীকা—

এটি সম্ভোগের ও তৎপর রসালসের পদ।

কিয়ে মদন-শর ভীতহি ইত্যাদি—শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের বুকের মধ্যে শুইয়া আছেন দেখিয়া কবি বলিতেছেন যে তিনি কি মদনের শরে ভীত হইয়া দয়িতের হৃদয়ের মধ্যে (প্রবেশ পূর্বক) আশ্রয় লইলেন?

(৫৪) কামোদ

রমণী-মোহন বিলসিতে মন
হইল মরমে পুনি।
গিয়া বৃন্দাবনে বসিলা ১ যতনে
রমিতে বরজ-ধনি॥
মধুর মুরলী পূরে বনমালী
রাধা রাধা করি গান।

একাকী গভীর বনের ভিতর
বাজায় যতেক তান॥
অমিয়া-নিছন ২ বাজিছে সঘন
মধুর মুরলী-গীত।
অবিচল কুল— রমণী সকল
শুনিয়া হরল চিত॥
শ্রবণে যাইয়া রহল পশিয়া
বেকতে বাজিছে বাঁশী।
আইস আইস বলি ডাকয়ে মুরলী
যেন ভেল সুখ-রাশি॥
আনন্দ-অবশ পুলক-মানস
সুকুমারী ধনি রাধে।
গৃহ-কর্ম যত হৈল বিসরিত
সকল করিল বাধে॥
রাইয়ের অগ্রেতে যতেক রমণী
কহয়ে মধুর বাণী।
ওই ওই শুন কিবা বাজে তান
কেমন করয়ে প্রাণী॥
সহিতে না পারি মুরলীর ধ্বনি
পশিল হিয়ার মাঝে।
বরজ-তরুণী হইল বাউরী
হরিল কুলের লাজে॥
কেহো পতি সনে আছিল শয়নে
ত্যজিয়া তাহার সঙ্গ।
কেহো বা আছিল সখীর সহিত
কহিতে রভস রঙ্গ॥
কেহো বা আছিল দুগ্ধ-আবর্তনে
চুলাতে রাখি বেসালি।
তেজি আবর্তন হই আনমন ৩
ঐছনে সে গেল চলি॥
কেহো শিশু লৈয়া কোলেতে করিয়া
দুগ্ধ করায়ে ৪ পান।
শিশু ফেলি ভূমে চলি গেল ক্রমে
শুনি মুরলীর গান॥

কেহো বা আছিল শয়ন করিয়া
নয়ানে আছিল নিন্দ।
যেন ৫ কেহো আসি চোরাই লইল
মানসে কাটিয়া সিন্ধ॥
কেহো বা আছিল রন্ধন করিতে
তেমতি চলিয়া গেল।
কৃষ্ণ-মুখী হৈয়া মুরলী শুনিয়া
সব বিসরিত ভেল॥
সকল রমণী ধাইল অমনি
কেহো কাহো ৬ নাহি মানে।
যমুনার কূলে কদম্বের মূলে
মিলল শ্যামের সনে ॥
ব্রজ-নারীগণ দেখিয়া তখন
হাসিয়া নাগর-রায়।
রসে-বিলসন করল বচন
দ্বিজ চন্ডীদাসে গায়॥

তরু ১২৯২

রবীন্দ্রনাথে পাঠান্তর—

(১) বসিয়া (২) নিছনি (৩) আগুয়ান (৪) করায়েন
(৫) কেহ বা আছিল রন্ধন করিতে
মানসে কাটিয়া সিন্দ।
যেমন চোবাই লইল হরিয়া
তেমনি চলিযা গেল॥
(৬) কাহা

(৫৫) শ্রীরাগ

পিরীতি পিরীতি সব জন কহে
পিরীতি সহজ কথা।
বিরিখের ফল নহে ত পিরীতি
নাহি মিলে যথা তথা॥
পিরীতি অন্তরে পিরীতি মন্তরে
পিরীতি সাধিল যে।
পিরীতি রতন লভিল যে জন
বড় ভাগ্যবান সে॥

পিরীতি লাগিয়া আপনা ভুলিয়া
পরেতে মিশিতে পারে।
পরকে আপন করিতে পারিলে
পিরীতি মিলয়ে তারে॥
পিরীতি সাধন বড়ই কঠিন
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস।
দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও
থাকিলে পিরীতি আশ॥

নী ৩৮৪

নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসের পদাবলী বাহির হইবার ৩০ বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ এই পদ সংগ্রহ করেন।

(৫৬) ভূপালি

মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল১ পঙ্কিল বাট॥
তহিঁ২ অতি দূরতর বাদর দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল॥
সুন্দরি৩ কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস-সুরধুনি পার॥
ঘন ঘন ঝন-ঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণ মরম জরি যাত॥
দশ দিশ দামিনি দহন-বিথার।
হেরইতে উচকই লোচন-তার৫॥
ইথে যব সুন্দরি তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ॥
গোবিন্দদাস কহ ইথে কি বিচার।
ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার॥

র ৩৩
তরু ৯৮৭
কী ১৮১

পাঠান্তর :—

(১) সঙ্কেত—কী
(২) তাহে অতি বাদর দর দর দোল—রবীন্দ্রনাথ এবং কী
(৩) এ সখি—রবীন্দ্রনাথ এবং কী

(৪) জ্বলি—রবীন্দ্রনাথ
(৫) লোচন ভার—রবীন্দ্রনাথ
(৬) ইথে যদি অব তুহুঁ তেজবি গেহ—রবীন্দ্রনাথ

(৫৭) ইমন

কানুর লাগিয়া জাগি পোহাইলুঁ
এ ঘোর আন্ধার রাতি।
এত দিনে সই নিচয়ে১ জানিলুঁ
নিঠুর২ পুরুষ জাতি॥
মেঘ দুরু দুরু দাদুরির বোল
ঝিঝা ঝিঝি ঝিনি৩ বোলে।
ঘোর আন্ধিয়ারে বিজুরির৪ ছটা
হিয়ার পুতলি দোলে॥
যতনে সাজালুঁ৫ ফুলের সেজ
গন্ধে মোহ মোহ করে।
অঙ্গ ছটফটি সহনে না যায়
দারুণ বিরহ জ্বরে॥
মনের আগুনি মনে নিভাইতে
যেমন করয়ে প্রাণে।
কানুর এমন নিঠুর চরিত
এ দাস অনন্ত ভণে॥

তরু ৩৪৮

রবীন্দ্রনাথ ধৃত পাঠ—
(১) নিশ্চয় জানিনু
(২) নিষ্ঠুর
(৩) নিকি বোলে
(৫) বিজুরির ছটা
(৬) সাজাইনু

(৫৮) গুর্জরী

মাধব তোহে পিরীতি করু কোই।
সুকপট কঠিন হৃদয় তুয়া পুন পুন
কত পরবোধব১ তোই॥
আন সঙ্কেত২ আন সঞে মীলন
আন কহিতে কহ আনে।৩

ঐছন চাতুরি শঠপন পুন পুন
মানিনি সহজে পরাণে ৪॥
হামারি মরম তুহু ভালে ভাল জানসি
হাম নহ কামিনি নারী।
কাম-কলঙ্কিনি যব কহ দুরজনে
সো দুখ সহই না পারি॥
প্রেম-অধিন হাম নিরমল প্রেমহি
মো সঞে করহ বিলাস।
কামিনি ঠাম হেরি পুন তেজব
প্রেমদাস অভিলাষ॥

তরু ৫৬৯

রবীন্দ্রনাথ ধৃত পাঠ—

(১) পর বোধিব
(২) আন সঙ্কেতে
(৩) কহ আন
(৪) সহজে পরাণ

(৫৯) সিন্ধুড়া

পিরীতি বিষম কাল।
পরাণে পরাণ মিলাইতে জানে
তবে সে পিরীতি ভাল॥
ভ্রমরা সমান আছে কত জন
মধু লোভে করে প্রীত।
মধু ফুরাইলে উড়ি যায় চলি
এমতি তাদের রীত॥
হেন ভ্রমরার সাধ্য নহে কভু
সে মধু করিতে পান।
অজ্ঞানী পাইতে পারয়ে কি কভু
রসিক জ্ঞানীর সন্ধান॥
মনের সহিত যেঁ করে পিরীতি
তারে প্রেম-কৃপা হয়।
সেই সে রসিক অটল রূপের
ভাগ্যে দরশন পায়॥
মনের সহিত করিয়া পিরীতি
থাকিব স্বরূপ আশে।

স্বরূপ হইতে ওরূপ পাইব
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

নী ৩৭৬

(৬০) ধানশী

কত কত অনুনয় করু বর-নাহ।
ও ধনি মানিনি পালটি না চাহ॥
বহুবিধ বাণি বিলাসয়ে১ কান।
শুনইতে শতগুণ বাঢ়য়ে মান॥
গদ গদ নাগর হেরি ভেল ভীত।
বচন না নিকসয়ে চমকিত চীত॥
পরশিতে চরণ সাহস নাহি২ হোয়।
কর৩ যুড়ি ঠাড়ি বদন পুন জোয়॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বর কান।
কি করবি তুহু অব দুর্জয় মান॥

তরু ৫১২

রবীন্দ্রনাথ ধৃত পাঠ—

(১) বিলাপয়ে কান (এই পাঠই সংগত মনে হয়; 'বিলাসয়ে কান' বলিলে কানাইয়ের শুধু বাকচাতুর্য বুঝায়, তাঁহার অনুতাপ প্রকাশ পায় না।)

(২) সাহস না হোয়

(৩) কর জোড়ি ঠাড়ি বদন নেহারয়

(৬১) গান্ধার

ছোড়ল অভরণ১ মুরলি-বিলাস।
পদতলে লুঠয়ে সো পিত-বাস॥
যাক দরশ বিনে ঝরয়ে নয়ান।
অব নাহি হেরসি তাক বয়ান॥
সুন্দরি তেজহ দারুণ মান।
সাধয়ে চরণে রসিকবর কান॥
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ শ্যাম রসবন্ত।
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ সময় বসন্ত॥
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ প্রেম সাংগাতি।
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ সুখময় রাতি॥
আজু যদি মানিনি তেজবি কান্ত।
জনম গোঙায়বি রোই একান্ত॥

বিদ্যাপতি কহে প্রেমক রীত ২।
যাচিত তেজি না হয় সমুচীত॥

রবীন্দ্রনাথ ধৃত পাঠ— **তরু ২০৩৮**

(১) আভরণ

(২) প্রেমক রীতি

(৬২) শ্রীরাগ

সে কাল গেল বৈয়া বন্ধু
সে কাল গেল বৈয়া।
আঁখি ঠারাঠারি মুচকি হাসি
কত না করিতা রৈয়া॥
বেশের লাগিয়া দেশের ফুল
না রহিত ১ কিছু বনে।
নাগরীর ২ সনে নাগর হইলা
আর ৩ যে চিনিবা কেনে॥
বুলি বেড়াইয়া নাম লইয়া
ফিরিতে বংশী বাইয়া ৪।
মুখের কথা শুনিতেহ ৫ কত
লোক পাঠাইতা ধাইয়া॥
হাতে করিয়া মাথায় করিলু
কলঙ্কের ডালা।
শেখর কহে পরের বেদন
নাহি জানে কালা॥

তরু ৮০৬
কী ৩০৯

পাঠান্তর-

(১) না রহিত বনে—রবীন্দ্রনাথ

(২) নগরে আসিয়া নাগর হইলা—কী

(৩) আর চিনিবে কেনে—রবীন্দ্রনাথ

(৪) বাজাইয়া—কী

(৫) শুনিতে কত

(৬৩) করুণ বরাড়ি

বড়ই বিষম কালার প্রেম এঘর বসতি শালি।
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে পরাণ-পুতলি॥
কাহারে ১ কহিব সই মরমের কথা।

কান্ বিন্ কে জানিবে মরমের বেথা॥
যত যত পিরিতি কর়য়ে পিয়া মোরে।
আখরেতে লিখা আছে হিয়ার মাঝারে ২॥
নিরবধি বুকে থুইয়া চাহে চৌখে চৌখে।
এ বড় বিষম ৩ শেল ফুটি আছে বুকে॥
মনের ৪ সে দুখ মোর মনেতে রহিল।
ফুটিল শ্যামের শেল বাহির নহিল॥
নিশ্চয় ৫ মরিব সখি তারে না দেখিয়া।
জ্ঞানদাস কহে শ্যাম মিলাব আনিয়া॥

স ৪২৭
তরু ২৫৩৩

রবীন্দ্রনাথ পদরত্নাবলীতে ভণিতা ধরিয়াছেন **বলরাম**
পাঠান্তর—স
(১) কাহারে কহিব মরম কথা।
কান্ বিন্ কে জানিবে মরম বেথা॥ স ও রবীন্দ্রনাথ
(২) ভিতরে—স ও রবীন্দ্রনাথ
(৩) দারুণ
(৪) মনের কথা মনে সে রহিল
(৫) নিচয়ে মরিব আমি তাঁরে না দেখিয়া।
জ্ঞানদাস কহে মিলাব আনিয়া॥
ষষ্ঠ চরণের পর রবীন্দ্রনাথ পাঠ ধরিয়াছেন—
হাসিয়া পাঁজর কাটা কহিয়াছে কথাখানি।
সোঙরিতে চিতে উঠে আগুনের খনি॥
নিরবধি বুকে থুইয়া চাহিলে চক্ষে চক্ষে।
এ বড় দারুণ শেল ফুটি রৈল বুকে॥
হিয়ায় করিয়া নয়ান ভরিয়া
কবে সে দেখিব মুখ খানি।
বলরাম দাস বলে হিয়ার ভিতরে জ্বলে
দারুণ শেল আগুনি॥

এই পাঠে দেখা যায় যে পয়ার শেষে ত্রিপদীতে পরিবর্তিত হইয়াছে। এরূপ পরিবর্তন সন্দেহজনক।

(৬৪) শ্রীরাগ

সুখের লাগিয়া এঘর বান্ধিলু
অনলে পুড়িয়া ১ গেল।
অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে
সকলি ২ গরল ভেল॥

সখি হে কি মোর করমে লেখি!
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিলুঁ ৩
রবির ৪ কিরণ দেখি॥
নিচল ছাড়িয়া ৫ উচলে উঠিতে
পড়িলুঁ অগাধ জলে।
লছিমী চাহিতে দারিদ্র ৬ বাঢ়ল
মাণিক হারালুঁ হেলে॥
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিলুঁ
বজর পড়িয়া গেল।
জ্ঞানদাস কহে কানুর পিরিতি
মরণ ৭-অধিক শেল॥

তরু ৪৮৭
কী ৩০২

পাঠান্তর—কী

(১) জ্বলিয়া
(২) সুধাই গরল ভেল
(৩) সেবিতে
(৪) ভানুর
(৫) বলিয়া। উচল বলিয়া অচলে চড়িনু—রবীন্দ্রনাথ
(৬) দারিদ্র্যে বেঢ়ল
(৭) হৃদয়ে রহল শেল

(৬৫) গান্ধার

কানু নহ নিঠুর চলত যো মধুপুর
মঝু মনে এ বড় সন্দেহ।
সে হেন রসিক পিয়া পিরিতি-পূরিত হিয়া
কাহে ভেল শিথিল-সনেহ ১॥
চল ২ চল সহচরি অক্রুর-চরণে ধরি
তিল এক ৩ হরি বিলম্বাহ।
করুণা-ক্রন্দন শুনাইতে ঐছন
জানি ৪ ফিরয়ে বর নাহ॥
পরিহরু গুরুজন হসউ বা দুরজন
কি করিব পরিজন পাপ।
কানু বিনে জীবন জ্বলতহিঁ অনুখণ
কো সহ ৫ এ হেন সন্তাপ।
ওমুখ সমুখে ধরি নয়ন-অঞ্জলি ভরি

পিবইতে জিউ করে সাধ ৬।
গোবিন্দদাস ভণ সো বিহি নিকরুণ
যো করু ইহ ৭ রস-বাধ॥

স ২৮৬
তরু ১৬২৫

পাঠান্তর—
(১) সুলেহ —রবীন্দ্রনাথ
(২) শুন শুন সহচরি—স; অক্রুর রবীন্দ্রনাথ
(৩) ক্ষণ এক – স
(৪) জনি—স
(৫) সোহ—স
(৬) জীউ করি সাধ– রবীন্দ্রনাথ
(৭) হেন—স

(৬৬) জয়জয়ন্তী

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভর বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥
ঝম্পি ঘন গর- জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া॥ ১
কুলিশ কতশত পাত-মোদিত
মউর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরি ডাকে ডাহুকি
ফাটি যায়ত ছাতিয়া॥
তিমির ভরি ভরি ঘোর যামিনি
ন থির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া॥

তরু ১৭৩৫
পদরসসারে ৯৫৯
পদরত্নাকর ৪০।৮৯

পাঠান্তর—
পদরত্নাকরে
'শর হন্তিয়া' র পরে আছে
দরকে দামিনী বেরি চৌদীসে
অম্বুধর গরজন্তিয়া।

কায়ে কামিনি সমন মনসিজ
খড়্গ খরতর হনিতয়া॥

'বিদ্যাপতি কহ' স্থলে পদরসসারে এবং পদরত্নাকরে ভণিতা

ভণয়ে **শেখর** কৈছে নিরবহ
সো হরি বিনু ইহ রাতিয়া॥

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত "রায় শেখরের পদাবলীতে" এই পদটি ধৃত হয় নাই।

টীকা—

সখি, আমার দুঃখের শেষ নাই। এই ভরা বাদল, ভাদ্রমাস, অথচ আমার গৃহ শূন্য। মেঘ চারিদিক ঝাঁপিয়া গর্জন করিতেছে আর সারা ভুবনে বর্ষণ করিতেছে। কান্ত প্রবাসী, কাম দারুণ, সে সঘনে তীক্ষ্ণ শর হানিতেছে। কত শত বজ্র পড়িতেছে, আনন্দিত ময়ূর মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছে, মত্ত দাদুরি ও ডাহুকী ডাকিতেছে, আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। দিক ব্যাপিয়া অন্ধকার, ঘোর রজনী, বিদ্যুৎ সমূহ অস্থির। বিদ্যাপতি বলেন হরি বিনা কেমন করিয়া দিন-রজনী যাপন করিবে?

(৬৭) **ধানশী**

শ্যাম বন্ধুর কত আছে আমা হেন নারী।
তার অকুশল কথা সহিতে না পারি॥
আমারে মরিতে সখি কেন কর মানা।
মোর দুখে দুখী নহ১ তাহা গেল জানা॥
দাব দগধি ধিক্ ছট ফটি এহ।
এ ছাড় নিলাজ প্রাণ না ছাড়য়ে দেহ॥
কানু বিনু নাহি যায় দণ্ড ক্ষণ পল।
কেমনে গোঙাব আমি এদিন সকল॥
এ বড় শেল আমার হৃদয়ে রহল।
মরণ সময়ে তারে দেখিতে না পাইল॥
বড় মনে সাধ লাগে সো মুখ সঙরি।
পিয়ার নিছনি লৈয়া মুঞি যাও২ মরি॥
নরোত্তম যাই তথা জানুক তার সতি।
শ্যাম-সুধা না মিলিলে সভার সেই গতি॥

স ৩৭০
তরু ১৯৫৫

রবীন্দ্রনাথধৃত পাঠ—
(১) নও ইহা—স
(২) মুই

(৬৮) ধানশী

তোমা না দেখিয়া শ্যাম মনে বড় তাপ।
অনলে পশিব কি ১ যমুনায় দিব ঝাঁপ॥
এই ২ বার পাইলে রাঙ্গা চরণ দুখানি।
হিয়ার মাঝারে থুইয়া জুড়াব পরাণী॥
মুখের মুছিব ঘাম খাওয়াব পান গুয়া।
শ্রমেতে বাতাস দিব ৩ চন্দন আর চুয়া॥
মালতী ৪-ফুলের গাঁথিয়া দিব মাল।
বনাইয়া বান্ধব চূড়া কুন্তল-ভার॥
কপালে তিলক ৫ দিব চন্দনের চান্দ।
নরোত্তম দাস কহে পিরিতির ফান্দ॥

স ৩৭২
তরু ১৬৫৯
১৯৫৯

পাঠান্তর—স
(১) কিবা
(২) ইবার
(৩) বাতাস দিব চন্দন চুয়া
(৪) পদরসসারে—শ্রীবৃন্দাবনের ফুলে গাঁথি দিব হার
(৫) কপালে চন্দন দিব তীতল চাঁদ—স

(৬৯) পাঠমঞ্জরী

কহিয় কানুরে সই কহিয় কানুরে।
এক বার পিয়া যেন আইসে ব্রজ-পুরে॥
নিকুঞ্জে রাখিল ১ মোর এই গলার হার।
পিয়া যেন গলায় পরয়ে এক বার॥
এই তরু-শাখায় রহিল শারী শুকে।
এই দশা পিয়া যেন শুনে ইহার মুখে॥
এই বনে রহিল মোর রঙ্গিনী হরিণী।
পিয়া যেন ইহারে পুছয়ে সব বাণী॥
শ্রীদাম সুবল আদি যত তায় সখা।
ইহা সভার সনে তার পুন হবে দেখা॥
দুখিনী আছয়ে তার মাতা যশোমতী।
আসিতে যাইতে তার নাহিক শকতি॥
তারে আসি যেন পিয়া দেয় দরশন।

কহিয় বন্ধুরে এই সব নিবেদন॥
শুনিয়া আকুল দূতী চলু মধুপুর।
কি কহিব শেখর বচন না ফুর॥

তরু ১৬৮১

রবীন্দ্রনাথধৃত পাঠ—

(১) রাখিনু এই মোর হিয়ার হার

(৭০) কানড়া

সখি কহবি কানুর পায়।
সে সুখ-সায়র দৈবে শুকায়ল
তিয়াসে পরাণ যায়॥
সখি ধরবি কানুর কর।
আপনা বলিয়া বোল না তেজবি
মাগিয়া লইবি বর॥
সখি যতেক মনের সাধ।
শয়নে স্বপনে করিলুঁ১ ভাবনে
বিহি ২ সে করিলে বাদ॥
সখি হাম সে অবলা তায়।
বিরহ-আগুন দহয়ে দ্বিগুণ
সহনে নাহিক যায়॥
সখি বুঝিয়া কানুর মন।
যেমন করিলে আইসে৩ সে জন
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণ॥

সমুদ্র ৩১৭
তরু ১৭১৬

পাঠান্তর—স

(১) করিল ভাবনে
(২) বিহি সে করিল বাদ
(৩) আসয়ে

(৭১) সুহই

হামক মন্দিরে যব আওব কান।
দিঠি ভরি হেরব সো চাঁদ-বয়ান॥
নহি নহি বোলব যব হাম নারি।
অধিক পিরিতি তব করব মুরারি॥
করে ধরি হামক বৈঠায়ব কোর।

চির দিনে হৃদয় জুড়ায়ব মোর॥
করব আলিঙ্গন দূরে করি মান।
ও রসে পূরব হাম মূদব নয়ান॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
তোহারি পিরিতিক যাঙ বলিহারি॥

স ৩৮০
তরু ১৯৮২

কোন পাঠান্তর নাই

(৭২) পাঠমঞ্জুরী

যেখানে সতত বৈসে রসিক মুরারি।
সেখানে লিখিয় মোর নাম দুই চারি॥
সখীগণ২ গণইতে লৈয় মোর নাম।
পিয়া বড় বিদগধ বিহি৩ মোরে বাম॥
দিনে এক বেরি৪ পিয়া লিয়ে মোর নাম।
অরুণ-দুলভ করে দিয়ে জল-দান॥
এই সব অভরণ৫ দিহ পিয়া ঠাম।
জনম অবধি মোর এই পরণাম॥
ভণয়ে৬ বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
দিন দুই চারি বহি মিলব মুরারি৭॥

স ৩২৭
সং ৪৬৭, তরু ১৬৮০

পাঠান্তর—

(১) বস্যে—সং
(২) নিজগণ গণইতে লত্র
অরুণ দুলহ করে দেই জলদান। সং
(৩) বিধি ভেল বাম—স ও রবীন্দ্রনাথ
(৪) বার—স ও রবীন্দ্রনাথ
(৫) নেহ সব অভরণ—সং
(৭) ধৈরজ ধর চিতে মিলব মুরারি—সং

টীকা—

এটি বাঙ্গালী বিদ্যাপতির পদ।

(৭৩) গান্ধার শ্রীরাগ

আজু রজনি হাম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলুঁ২ পিয়া-মুখ-চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ৩

দশ দিশ ভেল নিরদন্দা॥ ৪
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ ৫
আজু মঝু ৬ দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকুল হোয়ল ৭
টুটল সবহুঁ সন্দেহা॥
সোই কোকিল অব লাখ লাখ ৮ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ হউ
মলয় পবন বহুঁ মন্দা॥
অবহন ৯ যবহুঁ মোহে পরি হোয়ত
তবহুঁ মানব ১০ নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহ
ধনি ধনি তুয়া নব নেহা॥

স ৩৮৫
তরু ১৯৯৬

পাঠান্তর—

(১) ভাগ্যে—রবীন্দ্রনাথ
(২) পেখনু—রবীন্দ্রনাথ
(৩) মানলং—স
(৪) ভেল আনন্দ—রবীন্দ্রনাথ
(৫) মানল—স
(৬) মোর—স
(৭) হোয়লু—রবীন্দ্রনাথ
(৮) লাখ ডাক ডাকত—রবীন্দ্রনাথ
(৯) অব মঝু যহুঁ পিয়া সঙ্গ হোয়াত —রবীন্দ্রনাথ
(১০) ধনি—স (অর্থাৎ ধন্য)।

(৭৪) সিন্ধুড়া

আইস আইস বন্ধু আধ আঁচরে আসি বৈস
নয়ান ভরিয়া তোমা দেখি।
অনেক দিবসে মনের মানসে
সফল করিয়ে আঁখি॥
বন্ধু আর কি ছাড়িয়া দিব।
হিয়ার মাঝারে যেখানে পরাণ
সেই খানে লঞা ১ থোব॥
কাল কেশের মাঝে তোমারে ২ রাখিব
পুরাব মনের সাধ।

গুরুজন জিজ্ঞাসিলে তাহারে৩ প্রবোধিব
পরিয়াছি কাল পাটের জাদ॥
নহেত৪ লেহের নিগড় করিয়া
বান্ধিব৫ চরণারবিন্দ।
কেবা নিতে পারে নেউক আসিয়া
পাঁজরে কাটিয়া সিন্ধ৬॥

তরু ১৯৮৭

রবীন্দ্রনাথধৃত পাঠ—

(১) রাখিয়া থোব
(২) তোমা বন্ধু রাখিব
(৩) তাহে
(৪) নহে তান হের
(৫) রাখিব

পদরত্নাবলীতে পাঠান্তর:—

"আমরা নবদ্বীপে কোন বৈষ্ণব গায়কের মুখে এই গানটির নিম্নলিখিত-রূপ অসম্পূর্ণ পাঠান্তর পাইয়াছি—

এস হে এস হে বঁধু আধ আঁচরে বস
নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।
তুয়া বঁধু পড়ে মনে চাই বৃন্দাবন পানে
আলুইলে কেশ নাহি বান্ধি।
রন্ধনশালাতে যাই ধুঁয়াতে যাতনা পাই
ধুঁয়ার ছলনা করি কাঁদি॥
মণি নও মাণিক নও হার করে গলে পরি
ফুল নও যে কেশের করি বেশ।
নারী না করিত বিধি তুয়া হেন গুণনিধি
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ॥
দীনু দাসেতে১ কয় দোঁহা রূপ তুলনা নয়
একাসনে বৈঠহ কিশোরী।

(১) সূচিপত্রের ৬ পৃষ্ঠায় পাদটীকায় শেষ দুই চরণ দেওয়া হইয়াছে—
কাজর করিয়া তোমা নয়নেতে রাখি যদি
তাহে গুরুজনা অপবাদ।
ও রাঙ্গা চরণে নূপুর হইতে
লোচন দাসেরি সাধ॥

বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তের দপ্তরে এই পদটির অন্য এক পাঠান্তর ধরিয়াছেন—

এসো এসো বঁধু এসো আধ আঁচরে বসো
নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।
অনেক দিবসে মনের মানসে
তোমা ধনে মিলাইল বিধি॥
মণি নও মাণিক নও যে হার করে গলে পরি
ফুল নও যে কেশের করি বেশ।
নারী না করিত বিধি তোমা হেন গুণনিধি
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ॥
বঁধু তোমায় যখন পড়ে মনে আমি চাই বৃন্দাবন পানে
আলুইলে কেশ নাহি বাঁধি।
রন্ধন শালাতে যাই তুয়া বঁধু গুণ গাই
ধুয়ার ছলনা করি কাঁদি॥

এই পাঠ বোধ হয় কোন গায়কের মুখে বঙ্কিমচন্দ্র শুনিয়াছিলেন। প্রথম কলিতে 'দেখি'র সহিত 'বিধি'র মিল হয় নাই।

(৭৫) শ্রীরাগ

শুন শুন অহে পরাণ পিয়া।
চির দিন পরে পাইয়াছি লাগি ১
আর না দিব ছাড়িয়া॥
তোমায় আমায় একই পরাণ
ভালে সে জানিয়ে আমি।
হিয়ায় হইতে বাহির হইয়া
কিরূপে আছিলা তুমি॥
যে ছিল আমার মরমের ২ দুখ
সকল করিলু ভোগ।
আর না করিব আঁখির আড়
রহিব একই যোগ॥
খাইতে শুইতে তিলেক পলকে
আর না যাইব ঘর।
কলঙ্কিনী করি খেয়াতি হৈয়াছে
আর কি কাহাকে ডর॥

এতহুঁ কহিতে বিভোর হইয়া
পড়িল৩ শ্যামের কোরে।
জ্ঞানদাস কহে রসিক নাগর
ভাসিল নয়ান৪ লোরে॥

তরু ২০০৬

রবীন্দ্রনাথে পাঠান্তর—

(১) শ্যাম
(২) মনের
(৩) পড়িলা
(৪) নয়ন—লোরে

(৭৬) **ধানশী**

দারুণ ঋতুপতি১ যত দুখ দেল।
হরি-মুখ হেরইতে সব দূর গেল॥
যতহুঁ আছিল মঝু হৃদয়ক সাধ।
সো সব পূরল পিয়া—পরসাদ॥
৩রভস-আলিঙ্গনে পুলকিত ভেল।
অধর কি পানে বিরহ দূরে গেল॥
(চিরদিনে৪ বিহি আজু পূরল আশ।
হেরইতে নয়নে নাহি অবকাশ॥)
ভণয়ে বিদ্যাপতি আর নহ আধি।
সমুচিত ঔখধে না রহে বেয়াধি॥

স৩৮৫
তরু ১১১৭

পাঠান্তর—স

(১) বসন্ত
(২) হরি
(৩)×× অতিরিক্ত—
কি কহব রে সখী আনন্দ ওর।
চির দিনে মাধব মন্দিরে মোর॥
(৪) বন্ধনীর অংশ পদামৃতসমুদ্রে নাই
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে (২।৩) আছে
কি কহব রে সখি আজুক আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥

এই পদ গাই হর্ষে করেন নর্তন।
আচার্য নাচেন প্রভু করেন দর্শন॥

শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের গৃহে এই পদ শুনিয়া শ্রীচৈতন্য ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন।

(৭৭) কামোদ

বহুদিনের সাধ আছে হরি।
বাজাইতে মোহন মুরলী॥
তুমি লহ মোর নীল সাড়ী।
তব পীত ধড়া দেহ পরি॥
তুমি লহ মোর গজমতি।
মোরে দেহ তোমারি মালতী॥
ঝাঁপা খোঁপা লহ খসাইয়া।
মোরে দেহ চূড়াটি বান্ধিয়া॥
তুমি লহ সিন্দুর কপালে।
তোমার চন্দন দেহ ভালে॥
তুমি লহ কঙ্কন কেওড়ি।
তোর তাড় বলো দেহ পাড়ি॥
তুমি লহ মোর আভরণ।
মোরে দেহ তোমার ভূষণ॥
শুন মোর এই নিবেদন।
শুনি হরষিত বৃন্দাবন॥

পদকল্পলতিকা পৃঃ ৩৬

(৭৮) কানাড়া

মুরলী করাও উপদেশ।
যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে জানহ বিশেষ॥
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী অতি অনুপাম।
কোন্ রন্ধ্রে রাধা বলি ডাকে আমার নাম॥
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী সুললিত ধ্বনি।
কোন্ রন্ধ্রে কেকা-রবে১ নাচে ময়ূরিণী॥
কোন্ রন্ধ্রে রসালে ফুটয়ে পারিজাত।
কোন্ রন্ধ্রে কদম্ব ফুটে হে প্রাণনাথ॥
কোন্ রন্ধ্রে ষড়ঋতু হয় এক কালে।
কোন্ রন্ধ্রে নিধুবন হয় ফুলে ফলে॥

কোন্ রন্ধ্রে কোকিল পঞ্চম স্বরে গায়।
একে একে শিখাইয়া দেহ শ্যামরায়॥
জ্ঞানদাস২ শুনিয়া কহয়ে হাসি হাসি।
রাধা রাধা বলি মোর বাজিবেক বাঁশী॥

পদকল্পলতিকা পৃঃ ৩৬
ল ১০২

পাঠান্তর—

রবীন্দ্রনাথে—

(১) শব্দে

(২) জ্ঞানদাস কহে হাসি।

"রাধে মোর" বোল বাজিবেক বাঁশী॥

পদরত্নাবলীতে "বাজিবে বাঁশী," কিন্তু রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলীতে (পৃঃ ১১৭০) "বাজিবেক বাঁশী।"

(৭৯) **বিভাষ**

পরাণ নিমাই মোর খেপা বড় বটে গো
একদিন দেখিনু নয়ানে:
ধূলায় ধূসর তনু কিবা অপরূপ গো
হামাগুড়ি ফিরয়ে অঙ্গনে॥
সুচাঁদ বদনে হাসি মা বলিয়া ডাকে গো
অমনি আইল শচী ধাঞা।
কোলেতে চড়িয়া অতি কাঁদিয়া বিকল গো
তা দেখি বিদরে যেন১ হিয়া॥
কত যতন করি তবু প্রবোধ না মানে গো
অঙ্গ২ আছাড়ায় বারে বারে।
(কি হৈল কি হৈল বলি কাঁদে পুণ্যবতী গো
কেহ স্থির হইতে না পারে॥
হেনই সময়ে এক নারী অতি খেদে গো
হাতে তালি দিয়া বোলে হরি।
তা শুনি চঞ্চল শিশু ক্রন্দন সম্বরি গো)
হাসয়ে তাহার গলা ধরি॥
সবাই হরষ হৈয়া হরি হরি বলে গো
নিমাই নামিয়া কোলে হৈতে।
দাঁড়াইতে নারে তবু৩ নাচয়ে কৌতুকে গো
হাত দিয়া জননীর হাতে॥

কি লাগি কাঁদিল কেউ বুঝিতে নারিল গো
সবাই ভাবয়ে মনে মনে।
নরহরি-পরাণ নিমাই এই রূপে গো
খেপামি করিতে ভাল জানে॥

পদকল্পলতিকা পৃঃ ১
গৌ ৭২ পৃঃ

রবীন্দ্রনাথধৃত পাঠ—

(১) মোর
(২) হাসয় তাহার গলা ধরি (বন্ধনীর ভিতরকার অংশ পদরত্নাবলীতে নাই)
(৩) তমু

(৮০) **মঙ্গল রাগ**

আপাদ-মস্তক, প্রেম-ধারা বরিষত
চৌদিগে ঝলকত কিরণে।
মত্ত গজেন্দ্র জিনি গমন সুলাবণি ১
চাঁদ উদয় করু চরণে॥
কেমন বিধাতা সে গোরাঙ্গ-চাঁদের দে
গঢ়িল আপন তনু দঢ়িয়া।
কেমন কেমন তার কাষ্ঠ-পাষাণ হিয়া
তখনি না গেল কেনে গলিয়া॥
আমার গৌরাঙ্গের গুণে দারু পাষাণ কিবা
গলিয়া গলিয়া পড়ে অবনী।
অরণ্যের মৃগ পাখী ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে
নাহি কান্দে হেন নাহি পরাণী॥
যেমন তেমন কুলে জনম হউক মোর
যেমন তেমন দেহ পাইয়া।
অনন্ত দাসের মন ঠাকুর গৌরাঙ্গের গুণ
দেশে দেশে ফিরি যেন গাইয়া॥

রবীন্দ্রনাথধৃত পাঠ— তরু ২২০৮

(১) সুনাচনী

(৮১) **তুড়ি**

বিহরে আজু রসিক-রাজ
গৌরচন্দ্র নদিয়া মাঝ
কুঞ্জ কেশরপুঞ্জ উজোর
কনক-রুচির-কাঁতিয়া।

কোটি কাম রূপ-ধাম
ভুবন মোহন লাবণি ঠাম
হেরত জগত-যুবতি উমতি
ধৈরজ ধরম ১ তেজিয়া॥

অসিম ২ পূর্ণিম-শরদ-চন্দ—
কিরণ ৩-দমন বদন-ছন্দ
কুন্দ-কুসুম নিন্দি সুষম
মঞ্জু দশন ৪-পাঁতিয়া।

বিম্বু ৫-অধরে মধুর হাসি
বমই কতহিঁ অমিয়া-রাশি
শুধই ৬ সীধু-নিকর নিঝর
বচন ঐছন ভাতিয়া॥

মধুর বরজ-বিপিন-কুঞ্জ
মধুর পিরীতি-আরতি-পুঞ্জ
সোঙরি সোঙরি অধিক অবশ
মুগধ দিবস রাতিয়া।

ভাবে ৭ অবশ অলস ধন্দ
চলত চলত খলত মন্দ
পতিত-কোর পড়ত ভোর
নিবিড় আনন্দে মাতিয়া॥

অরুণ নয়ানে করুণ চাই
সঘনে জপয়ে রাই রাই
নটত উমত লুঠত ভ্রমত
ফুটত মরম ছাতিয়া।
উত্তম মধ্যম অধম জীব
সবহু প্রেম-অমিয়া পীব
তহিঁ বলরাম বঞ্চিত একলে
সাধু ঠামে অপরাধিয়া॥

তরু ২১১১

রবীন্দ্রনাথধৃত পাঠ—

(১) ধৈরজ ধরণ তেজিয়া

(২) অসীম পূর্ণিমার শরদ চন্দ

(৩) কিরণ মদন বদন ছন্দ

(এখানে কিরণ মদন বোধ হয় দমনের বদলে ছাপার ভুল; 'মদন' পাঠ ধরিলে অর্থ সঙ্গতি হয় না)।

(৪) মঞ্জু বসন পাঁতিয়া—'বসন' শব্দ অপেক্ষা 'দশন' শব্দ অধিকতর সঙ্গত, কেননা একজনে এক বা দুই খানি বসন পরে, বসনের পংক্তি পরিধান করে না।

(৫) বিম্ব অধরে

(৬) সুধুই সীধুনি ঝরে নিঝর

(৭) আবেশে

(৮২) ধানশী

নিরবধি মোর হেন লয় মনে
খেণে খেণে অনিমেষে।
নয়ন ভরিয়া গৌরাঙ্গ-বদন
হেরিয়ে মন হরিষে॥
আই আই কিয়ে সে রূপ-মাধুরী
নিরমিল কোন বিধি।
নদীয়া-নাগরী সোহাগ-আগরি
পাইল রসের নিধি॥
অপরূপ রূপ কেশর করিয়া
ইচ্ছা যে হিয়ায় লেপি ১।
সোনার বরণ বসন পরিয়া
জীবন যৌবন সোঁপি।
চুলের ২ চাঁপার ফুল হেন করি
আউল্যায়্যা করিয়ে ৩ দেখা।
লাজ ভয় ছাড়ি কোলে ৪ উঁড়ি পড়ি
দু বাহু করিয়া পাখা॥
পিরীতি-মুরতি চিত্র বনাইয়া
কহিয়ে মনের কথা।
বুকে বুকে সুখে মুখে মুখ ভরি
ঘুচাই মনের বেথা॥

তরু ৯৩৬

রবীন্দ্রনাথধৃত পাঠ—

(১) ইচ্ছায় হিয়ার লেপি

(২) চুলের চাঁপা

(৩) করিয়া
(৪) লোকে উড়ি পুড়ি (ছাপার ভুলে 'কালে' 'লোকে' হইয়াছে)
(৫) পিরীতির মুরতি

(৮৩) **কল্যাণি**

অমিয়া মথিয়া কেবা নবনী ১ তুলিল গো
তাহাতে গড়িল গোরা-দেহ।
জগত ছানিয়া কেবা রস নিঙ্গারিল গো
এক কৈল সুধই সুলেহ॥
অখণ্ড পিযূষ ২ ধারা কেবা আউটিল গো ৩
সোনার বরণে ৪ হৈল চিনি।
সে চিনি মারিয়া কেবা ফেনি তুলিল গো ৫
হেন ৬ বাসি গোরা-অঙ্গ খানি॥
অনুরাগের দধি প্রেমার সাচনা দিয়া
কে না পাতিয়াছে আঁখি দুটি।
তাহাতে অধিক মহু লহু লহু কথাখানি
হাসিয়া কহয়ে গুটি গুটি॥
বিজুরী বাটিয়া কেবা গাখানি মাজিল গো
চাঁদে মাজিল ৭ মুখখানি।
লাবণ্য বাটিয়া কেবা চিত ৮ নিরমাণ কৈল
অপরূপ রূপের বলনি॥
সকল-পূর্ণিমা-চাঁদে বিকল ৯ হইয়া কান্দে
কর-পদ পদ্মের গন্ধে।
কুড়িটি নখের ছটায় জগত আলো কৈল গো
আঁখি পাইল জনমের অন্ধে॥
এমন বিনোদ রূপ কোথাও ১০ না দেখি গো
অপরূপ প্রেমের বিনোদে।
পুরুষ প্রকৃতি ভাবে কান্দিয়া আকুল গো
নারী ১১ কেমনে প্রাণ বান্ধে॥
সকল রসের সার বিনোদ ১২ হৃদয় খানি
কে না গড়িল রঙ্গ দিয়া।
মদন বাটিয়া কেবা বদন গড়িল গো
বিনি ভাবে মু মলু কান্দিয়া॥
ইন্দ্রধনুক ১৩ আনি গোরার কপালে গো
কেবা দিল চন্দনের রেখা।

পুরুষের স্বরূপ যত ১৪ কুলের কামিনী গো ১৫
দু হাত ১৬ করিতে চাহে পাখা॥
রঙ্গের মন্দির খানি নানা রত্ন দিয়া গো
গড়াইল বড় অনুবন্ধে।
লীলা-বিনোদ কলা ভাবে অভিলাষি গো
মদন-বেদন ভাবি কান্দে॥
নাচায় আঁখির কোণে সদাই সভার মনে
দেখিবারে আঁখি-পাখী ধায়।
আঁখির তিয়াস দেখি মুখের লালস গো
আলসল জর জর গায়॥
কুলবতী কুল ছাড়ে পংগু ধায় উভ ১৭-লড়ে
গুণ গায় অসুর পাষণ্ড।
ধুলায় লোটাইয়া কান্দে কেহো থির নাহি বান্ধে
গোরা-গুণ অমিয়া অখণ্ড॥
ধাওরে ১৮ ধাওরে বলি প্রেমানন্দে কোলাকুলি
কেহো নাচে অট্ট অট্ট হাসে।
সুশীলা কুলের বহু সেবনে সকল যাও
গোরা-গুণ রূপের বাতাসে॥
নদীয়া নগর-বধূ হেরি গোরা-মুখ বিধু
ঝর ঝর নয়ান সদাই।
অনুরাগে বুক ভরে পুলকিত কলেবরে
মন মাঝে সদাই জাগাই॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র কিবা মনে গণে রাত্রি দিবা
গোরা-রূপে লাগি গেল ধান্দা।
অখিল ভুবন-পতি ধুলায় লোটাঞা কান্দে
সদাই সোঙরে রাধা রাধা॥
লখিমী-বিলাস ছাড়ি প্রেম-অভিলাষী গো
অনুরাগে রাঙগা দুটি আঁখি।
রাধার ধেয়ানে হিয়া বাহির না হয় গো
এই গোরা তনু তার সাখী॥
দেখরে দেখরে লোক হেন প্রেমা অপরূপ
ত্রিজগত-নাথ নাথ হৈয়া।
অকিঞ্চনের সনে কি লাগি কি ধন মাগে
কি না সুখে বুলয়ে নাচিয়া॥

জয় রে জয় রে জয়   হেন প্রেম-রসালয়
ভাঙিগ বিলাইল১৯ গোরা রায়।
নির্জীবে জীবন পাইল   পঙগু গিরি ডিঙগাইল
আনন্দে লোচন দাস গায়॥

তরু ২১২৯

রবীন্দ্রনাথ ধৃত পাঠ—

(১) নুনি
(২) বিজুরি
(৩) আউটিল গোরা
(৪) বরণ
(৫) গা খানি মাজিল গো
(৬) হেমবাসে গোরা অংগ খানি
(৭) মাখিল
(৮) চিত্ত
(৯) আকুল
(১০) কোথায় দেখিয়ে নাই
(১১) নারী বা
(১২) বিশাল হৃদয় খানি
(১৩) ইন্দ্রের ধনুক
(১৪) ওরূপ স্বরূপা যত
(১৫) কুলের কামিনী ছিল
(১৬) দুহাতে করিতে চায় পাখা
(১৭) উভরড়ে
(১৮) ধাওয়ে ধাওয়ে
(১৯) বনাইল (এস্থানে 'বিলাইল' পাঠই অধিক সংগত মনে হয়)

(৮৪) গান্ধার

যাঁহা পহুঁ অরুণ-চরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণি হইয়ে মঝু গাত॥
যো সরোবরে পহু নিতি নিতি নাহ।
হাম ভরি সলিল হোই তথি মাহ॥
এ সখি বিরহ-মরণ নিরদন্দ।
ঐছনে মিলই যব গোকুলচন্দ॥
যো দরপণে পহুঁ নিজ-মুখ চাহ।
মঝু অঙ্গ জোতি হোই১ তথি মাহ॥

যো বীজনে পহুঁ বীজই গাত।
মঝু অঙ্গ তাহি হোই২ মৃদু বাত॥
যাঁহা পহুঁ ভরমই জলধর-শ্যাম।
মঝু অঙ্গ-গগন হোই তছু ঠাম॥
গোবিন্দ দাস কহ কাঞ্চন-গোরি।
সো মরকত-তনু তোহে কিয়ে ছোড়ি॥

রস ১১৫
স ৩৬৯
তরু ১৯৫৩

পাঠান্তর—স

(১) হইয়ে
(২) হইয়ে

(৮৫) **শ্রীরাগ**

চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি।
পরশিতে১ চাহি তুয়া চরণের ধূলি॥
(অভিমান দূরে করি চাহ একবার।
দূরে যাউ সব মোর হিয়ার আন্ধার॥)
পীত পিন্ধন মোর তুয়া অভিলাষে।
পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিশ্বাসে॥
লেহ লেহ লেহ রাই সাধের মুরলি।
নয়ান-নাচনে নাচে হিয়ার পুতলি॥ ২
তুয়া মুখ নিরখিতে আঁখি ভেল ভোর।
নয়ন-অঞ্চল তুয়া পর-চিত-চোর॥
রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে আগলি ৩।
বিহি নিরমিল তোহে ৪ পিরিতি-পুতলি॥
এত ধনে ধনী যেই সে কেনে কৃপণ।
জ্ঞানদাস কহে কেবা জানিবে মরম॥

তরু ৪৪৬। ৫১৩

রবীন্দ্রনাথধৃত পাঠ—

(১) নয়ান নাচনে নাচে হিয়ার পুতলি
(২) পরশিতে চাহি তোমার চরণের ধূলি
(৩) আগুলি
(৪) তুয়া

বন্ধনীর মধ্যেকার অংশ পদরত্নাবলীতে নাই।

(৮৬) সুহই

যাহাঁ১ যাহাঁ নিকসয়ে তনু তনু-জোতি।
তাহাঁ২ তাহাঁ বিজুরি চমকময়৩ হোতি॥
যাহাঁ৪ যাহাঁ অরুণ চরণ চল চলই।
তাহাঁ৫ তাহাঁ থল-কমল-দল খলই৬॥
দেখ৭ সখি কো ধনি সহচরি মেলি।
হামারি জিবন সঞে করতহি খেলি৮॥
যাহাঁ১ যাহাঁ ভঙগুর ভাঙু বিলোল।
তাহাঁ২ তাহাঁ উছলই কালিন্দি-হিলোল৯॥
যাহাঁ১ যাহাঁ তরল বিলোচন১০ পড়ই।
তাহাঁ২ তাহাঁ নিল-উতপল (বন)১১ ভরই॥
যাহাঁ১ যাহাঁ হেরিয়ে মধুরিম হাস।
তাহাঁ২ তাহাঁ কুন্দ কুমুদ পরকাশ॥
গোবিন্দদাস কহ মুগধল কান।
চিনলহু রাই চিনই১২ নাহি জান॥

ক্ষণদা ১২।৩
গী ৩৮৯
স৯৪
সং ২৬
তরু ৮৬
কী ১৮৩

পাঠান্তর—

(১) (৪) যাঁহি যাঁহি—ক্ষ, রবীন্দ্রনাথ
(২)(৫) তাঁহি তাঁহি—ক্ষ, রবীন্দ্রনাথ
(৯) কালিন্দী কলোল—সং, ক্ষ
(৬) লখই—স
(৭) দেখলু কো ধনী—ক্ষ
সজনি! সো ধনী—গী
(৮) কেলি—সং
(৩) চমক মতি—ক্ষ
(১০) দৃগঞ্চল—ক্ষ
(১১) উতপল ভরই—স
(১২) চিনল—রবীন্দ্রনাথ

(৮৭) ধানশী

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে, গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥
সই কি আর বলিব।
যে পুনি১ করিয়াছি মনে সেই সে করিব॥
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা॥
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধু ধার।
লহু লহু হাসে পহু পিরীতির সার॥
গুরু গরবিত মাঝে রহি সখী সঙ্গে।
পুলকে পুরয়ে তনু শ্যাম-পরসঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥
ঘরের যতেক সভে করে কাণাকাণি।
জ্ঞান কহে লাজ ঘরে ভেজাইলাম আগুণি॥

স ২৪৬
র ১৪৭
তরু ৭৪৮
কী ২৮৪

রবীন্দ্রনাথধৃত পাঠ—
(১) পণি

(৮৮) মাথুর

নব বৃন্দাবন নবীন তরুগণ
নব নব বিকশিত ফুল।
নবিন বসন্ত নবিন মলয়ানিল
মাতল নব অলিকুল॥
বিহরই নওল কিশোর।
কালিন্দি-পুলিন কুঞ্জ নব শোভন
নব নব প্রেম বিভোর॥
নবিন-রসাল মুকুল-মধু-মাতিয়া
নব কোকিলকুল গায়।

নব যুবতীগণ চিত উমতায়ই
নব-রসে কাননে ধায়॥
নব যুবরাজ নবিন নব নাগরি
মীলয়ে নব নব ভাতি।
নিতি নিতি ঐছন নব নব খেলন
বিদ্যাপতি-মতি মাতি॥

তরু ১৪৩২

(৮৯) **বিহাগড়া**

মধু-ঋতু মধুকর-পাঁতি।
মধুর-কুসুম-মধু-মাতি॥
মধুর বৃন্দাবন মাঝ।
মধুর মধুর রস-রাজ॥
মধুর যুবতিগণ সঙ্গ।
মধুর মধুর রস-রঙ্গ॥
মধুর যন্ত্র রসাল।
মধুর মধুর করতাল॥
মধুর নটন গতি-ভঙ্গ।
মধুর নটিনি১ নট-রঙ্গ॥
মধুর মধুর রস-গান।
মধুর বিদ্যাপতি ভাণ॥

তরু ১৫০০

রবীন্দ্রনাথধৃত পাঠ—
(১) নটন

(৯০) **বিভাস**

অহে নাথ কিছুই না জানি।
তোমাতে মগন মন দিবস রজনি॥
জাগিতে ঘুমিতে চিতে তোমাকেই দেখি।
পরাণ-পুতলি তুমি জীবনের সখী॥
অঙ্গ-অভরণ তুমি শ্রবণ-রঞ্জন।
বদনে বচন তুমি, নয়নে অঞ্জন॥
নিমিখে শতেক যুগ হারাই হেন বাসি।
রায়-বসন্ত-পহু প্রেম-পুঞ্জ রাশি১॥

রবীন্দ্রনাথধৃত পাঠ— তরু ২৯৪৩
(১) রায় বসন্ত কহে পহু প্রেমরাশি

(৯১) মল্লার

বড় অপরূপ দেখিলুঁ সজনি
নয়লি নিকুঞ্জ মাঝে।
ইন্দ্রনীল-মণি কনকে জড়িত ১
হিয়ার উপরে সাজে॥
কুসুম-শয়নে মিলিত নয়নে ২
উলসিত অরবিন্দা।
শ্যাম-সোহাগিনী কোরে ঘুমায়লি
চান্দের উপর চন্দা॥
কুঞ্জ কুসুমিত সুধাকরে রঞ্জিত
তাহে পিককুল গান।
মরমে মদন-বাণ দোঁহে অগেয়ান
কি বিধি কৈল নিরমাণ॥
মন্দ মলয়জ পবন বহু মৃদু
ও সুখ কো করু অন্ত।
সরবস ধন দোঁহার দুহুঁ জন
কহয়ে রায় বসন্ত॥ তরু ১৩০২

রবীন্দ্রনাথধৃত পাঠ—

(১) কেতকে জড়িত

(২) কুসুম শয়ানে মিলিত নয়ানে

(৯২) বরাড়ি

ভুলে ভুলে রে দোহাঁর রূপে নয়ন ভুলে।
কনক-লতিকা রাই তমালের কোলে॥
বীজই ১ বনে বনে ভ্রমই দুহুঁ।
দোঁহার কান্ধে শোভে দোঁহার বাহু॥
দীপ সমীপে যেন ইন্দ্রনীল-মণি।
জলদে জড়ায়ল যেন সৌদামিনী॥
কষিতে কষিল নহে কুন্দন হেম।
তুলনা দিবার নাহি দোহাঁকার ২ প্রেম॥
বদনে বদন দিতে মদন জাগে।
আলিঙ্গন দিয়া শ্যাম কিবা ধন মাগে॥
চান্দ ৩ উপরে চান্দ পিয়ে রস-সুধা।
গোবিন্দদাস কহে না ভাঙ্গিল ক্ষুধা॥ তরু ৬৪৯
কী ২১৬

পাঠান্তর—

(১) কীর্তনানন্দে আরম্ভ—
বিজন বনে বনে ভ্রমই দুহুঁ।

(২) দুঁহার প্রেম—রবীন্দ্রনাথ

(৩) দোঁহা দোঁহা নিরখিত দোঁহা দোঁহা ভুলে
গোবিন্দ দাসের চিত সদাই বুলে॥

(৯৩) **বিভাস**

প্রাণনাথ কেমন করিব আমি।
তোমা বিনে মন করে উচাটন
কে জানে কেমন তুমি॥
না দেখি নয়ন ঝুরে অনুখণ১
দেখিতে তোমায় দেখি॥
সোঙরনে মন মুরছিত হেন
মুদিয়া২ রহিয়ে আঁখি॥
শ্রবণে শুনিয়া তোমার চরিত
আন না ভাবয়ে মনে।
নিমিষের আধ পাসরিতে নারি
ঘুমাল্যে৩ দেখি স্বপনে॥
জাগিলে চেতন হারাইয়ে আমি
তোমা নাম করি কান্দি।
পরবোধ দেই এ রায় বসন্ত
তিলেক থির নাহি বান্ধি॥

তরু ২৯৫৩

রবীন্দ্রনাথধৃত পাঠ—

(১) ঝরে অনুক্ষণ

(২) মুদিয়ে

(৩) ঘুমাইলে

(৯৪) **কামোদ**

কদম্ব তরুর ডাল ভূমে নামিয়াছে ভাল
ফুল ফুটিয়াছে সারি সারি।
পরিমলে ভরল সকল বৃন্দাবন
কেলি করে ভ্রমরা ভ্রমরী॥
রাই কানু বিলসই রঙ্গে।
কিয়ে দুহুঁ১ লাবণি বৈদগধি ধনি ধনি

মণিময় অভরণ অঙ্গে ॥
রাইর দক্ষিণ কর ধরি প্রিয় গিরিধর
মধুর মধুর চলি যায়।
আগে পাছে সখীগণ করে ফুল বরিষণ
কোন সখী চামর ঢুলায় ॥
পরাগে ধূসর স্থল চন্দ্র-করে সুশীতল
মণিময় বেদীর উপরে।
রাই কানু-কর ধরি ২ নৃত্য করে ফিরি ফিরি
পরশে পুলক অঙ্গ ৩ ভরে ॥
মৃগমদ চন্দন করে করি সখীগণ
বরিখয়ে ফুল গন্ধরাজে।
শ্রম-জল বিন্দু বিন্দু শোভে রাই মুখ-ইন্দু ৪
অধরে মুরলী নাহি ৫ বাজে ॥
কুসুমিত বৃন্দাবন কলপ-তরুগণ
পরাগে ভরল অলিকুল।
রতনে খচিত হেম মন্দির সুন্দর যেন
নরোত্তম-মনোরথ পুর ॥ ৬

ক্ষণদা ৩০।৭
স ২৩০
তরু ১০৭৪
কী ২০৭

পাঠান্তর—

(১) রূপ-লাবণি—ক্ষ
(২) কর জোরি—ক্ষ, রবীন্দ্রনাথ
(৩) তনু—ক্ষ, রবীন্দ্রনাথ
(৪) শোভা করে মুখ ইন্দু—ক্ষ
(৫) অধরে মুরলী লহু বাজে (অতি সুন্দর পাঠ)—রবীন্দ্রনাথ
(৬) কীর্তনানন্দে—

হাস বিলাস রস কলা মধুর ভাষ
লোচন মোহন লীলা ধরু।
দুহু রূপ লাবণি হেম মরকত মণি
নরোত্তম মনোরথ ভরু ॥

(৯৫) **কেদার**

একে সে মোহন যমুনা কূল।
আরে সে কেলি-কদম্ব-মূল ॥

আরে সে বিবিধ ফুটল-ফুল।
আরে সে শরদ-যামিনি॥
ভ্রমরা ভ্রমরি করত রাব
পিক কুহু কুহু করত গাব
সঙ্গিনি রঙ্গিণি মধুর বোলনি
বিবিধ ১ রাগ গায়নি।
বয়স কিশোর মোহন ঠাম
নিরখি মুরছি পড়ত কাম
সজল-জলদ-শ্যাম-ধাম
পিয়ল বসন দামিনি।
শাঙল ২ ধবল কালি গোরি
বিবিধ বসন বনি কিশোরি
নাচত গায়ত রস-বিভোরি ৩
সবহুঁ ৪ বরজ-কামিনি।
বিণা কপিনাস পিনাক ভাল
সপ্ত ৫-সুর বাজত তাল
এ সর-মণ্ডল মন্দিরা ডম্ফ
মেলি কতহুঁ গায়নি।
নুপুর ঘুংগুর মধুর বোল
ঝনন ননন নটন লোল
হাসি হাসি কেহ করত কোল
ভালি ভালি বোলনি।
বলরাম ৬ দাস পঢ়ত তাল
গাওত মধুর অতি রসাল
শুনত শুনত জগত উমত
হৃদয়-পুতলি দোলনি॥

তরু ১২৭৮
কী ২২৪
প্রাঃ ৯০ পৃঃ—
জ্ঞানদাস ভণিতা

পাঠান্তর—কী

(১) কেদার

(২) সঙ্গিনী ধবলী কালী গোরী; সাঙল ধবল কালিম গোরি—রবীন্দ্রনাথ

(৩) নাচত গায়ত করত কেলি

(৪) সঙ্গিনী

(৫) সপ্তসরণি

(৬) জ্ঞানদাস পড়ত তাল—প্রাচীন কবির গ্রন্থাবলী (হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত) ১৩০৪ সাল

টীকা—

এই পদটির ছন্দ ও শব্দ যোজনার সহিত ১০১ সংখ্যক পদ (গোবিন্দদাসের শরদ চন্দ পবন মন্দ) তুলনা করিলে দেখা যায় যে এই বলরাম দাস গোবিন্দদাসের বংশজ কবি; তিনি তাঁহার পূর্বপুরুষের রচনার অনুকরণ করিয়াছেন। প্রথম বলরাম দাস (দ্বিজ) গোবিন্দদাসের পূর্বের পীঠির লোক। অনুকরণ হইলেও পদটি সুন্দর।

(৯৬) **সুহই**

সই পিরিতি পিয়া সে জানে
যে দেখি যে শুনি চিতে অনুমানি
নিছনি দিয়ে পরাণে॥
মো যদি সিনাঙ আগিলা ঘাটে
পিছিলা ঘাটে সে নায়।
মোর অঙ্গের জল পরশ লাগিয়া
বাহু পসারিয়া রয়।
বসনে বসন লাগিবে লাগিয়া
একই রজকে দেয়।
মোর ১ নামের আধ আখর পাইলে
হরিষ হইয়া লেয়॥
ছায়ায় ছায়ায় লাগিব লাগিয়া
ফিরয়ে কতেক পাকে।
আমার অঙ্গের বাতাস যে দিগে
সে মুখে সে দিন থাকে॥ ২
মনের আকুতি বেকত করিতে
কত না সন্ধান জানে।
পায়ের সেবক রায় শেখর
কিছু বুঝে অনুমানে॥ ৩

তরু ৬৭৯
কী ২৯০

পাঠান্তর—কী

(১) মোর নামের যে আদি আখর
সে নাম সদাই লয়।

(২) গায়ের বায়ের পরশ লাগিয়া—
সদাই সে মুখে থাকে॥
(৩) দয়ার সেবক শেখর রায়
জানে কিছু অনুমানে॥

(৯৭) **ললিত**

প্রাণনাথ তোহে ১ কিছু কহিতে নারিলু।
জাতি কুলশীল লাজে তিলাঞ্জলি দিলু॥
না জানি মিলন আজি কি খেণে হইল।
গোকুল ভরিয়া এই খেয়াতি রহিল॥
মুখ দেখাইতে লোকে মরণ হেন গণি।
বিধির লিখন ছিল হইল এমনি॥
সব দুখ পাসরিয়ে তোমার মুখ দেখি।
রায় বসন্ত কহে ঝরে দুটি আঁখি॥

তরু ২৯৫০

রবীন্দ্রনাথধৃত পাঠ—

(১) তোমারে

(৯৮) **বিভাস**

বঁধু তুহুঁ দয়ার সাগর।
হাম নারী মতিহীনে এতেক আদর॥
আহিরিণী গোয়ালিনী মুঞি কোন ছার।
পরাণ নিছিয়া দেই পিরীতে তোমার॥
তোহারি গরবে ব্রজে হাম গরবিনী।
গহীন পিরীতে তোর আমি কিবা জানি॥
আমি সোনা, তুহুঁ বঁধু নিকষ পাষাণ।
পরশে করিলা মোরে হেম লাখ বাণ॥
সাধ করে সীঁথায় তোমা সিন্দুর করি ধরি।
হারা বানাইয়া কিয়ে গলায় গাঁথি পরি॥
যত যত দেখি আঁখি নহে তিরপিত।
রায় বসন্ত কহে নিগূঢ় পিরীত॥

মন্তব্য :

এই পদটি অন্য কোন সংকলন গ্রন্থে ধৃত হয় নাই।

(৯৯) **বিভাস**

আলো ধনি সুন্দরি কি আর বলিব।
তোমা না দেখিয়া আমি কেমনে রহিব॥

তোমার মিলন মোর পুণ্য-পুঞ্জ রাশি।
না১ দেখিলে নিমিখে শতেক যুগ বাসি॥
বদন-কমল তোমার সম্পূরণ শশী।
মরমে লাগিয়াছে মধুর মৃদু হাসি॥
আনন্দ-মন্দির তুমি জ্ঞান শকতি।
বাঞ্ছা-কল্পলতা মোর কামনা-মূরতি॥
সঙ্গের সঙ্গিনী তুমি সুখময় ঠাম।
পাসরিব কেমনে জীবনে রাধা-নাম॥
গলে বনমালা তুমি মোর কলেবর।
রায় বসন্ত কহে প্রাণের গুরুতর॥

রবীন্দ্রনাথধৃত পাঠ— তরু ২৯৫৫

(১) মরমে লাগিছে মধুর মৃদু হাসি

(এটি মূলের ষষ্ঠ চরণ; রবীন্দ্রনাথ চতুর্থ ও পঞ্চম চরণ বাদ দিয়াছেন)

এই পদের ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ কেমন ভাবে করিয়াছেন তাহা এই গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

(১০০) ধানশী

রাতি দিনে চৌখে চৌখে বসিয়া সদাই দেখে
ঘন ঘন মুখখানি মাজে।
উলটি পালটি চায় সোয়াস্ত নাহিক পায়
কত বা আরতি হিয়ার মাঝে॥
সই ও দুখ লাগিয়া১ আছে মনে।
যারে বিদগধ-রায় বলিয়া জগতে গায়
মোর আগে কিছুই না জানে॥
জ্বালিয়া উজ্জ্বল বাতি জাগিয়া২ পোহায় রাতি
নিদ নাহি যায় পিয়া ঘুমে।
ঘন ঘন করে কোলে খেনে করে উতরোল
তিলে শতবার মুখ চুমে॥
খেনে বুকে খেনে পিঠে খেনে রাখে দিঠে দিঠে
হিয়া হৈতে শেজে না ছোয়ায়৩।
দরিদ্রের ধন হেন রাখিতে না পায় স্থান
অঙ্গে অঙ্গে সদাই ফিরায়॥
ধরিয়া দুখানি হাতে কখন ধরয়ে মাথে
খেনে ধরে হিয়ার উপরে।

খেনে পুলকিত হয় খেনে আঁখি মুদি রয়
বলরাম কি কহিতে পারে॥

তরু ৬৮২

রবীন্দ্রনাথধৃত পাঠ—

(১) ল্যাগিয়াছে
(২) জাগি পোহাল রাতি
(৩) শোয়ায়

(১০১) **কানড়া**

শরদ চন্দ পবন মন্দ
বিপিনে ভরল কুসুম-গন্ধ
ফুল্ল মল্লিকা মালতি যুথি
মত্ত-মধুকর-ভোরণি ১।
হেরত ২ রাতি ঐছন ভাতি
শ্যাম মোহন মদনে মাতি
মুরলি-গান পঞ্চম তান
কুলবতি-চিত চোরণি॥
শুনত ৪ গোপী প্রেম রোপি
মনহি॰ মনহি॰ আপন ৫ সোঁপি
তাঁহি চলত যাঁহি বোলত
মুরলিক কল লোলনি ৬।
বিসরি ৭ গেহ নিজহুঁ দেহ
এক নয়নে কাজর-রেহ
বাহে রঞ্জিত কঙ্কণ ৮ একু
একু কুন্তল ডোলনি ৯॥
শিথিল ছন্দ নিবিক ১০ বন্ধ
বেগে ধাওত যুবতিবৃন্দ
খসত বসন রসন চোলি
গলিত বেণি লোলনি।
ততহি॰ বেলি সখিনি মেলি
কেহু কাহুক পথ না হেরি
ঐছে মিলল গোকুল-চন্দ
গোবিন্দ দাস গাওনি ১১॥

ক ২৯।৪
স ২২১

সং ২৭৮
তর, ১২৫৫
কী ২২০

পাঠান্তর—

(১) বোলনি—সং
(২) হেরই—ক্ষ
(৩) শ্যামর মোহন মদন মাতি—রবীন্দ্রনাথ
(৪) সুতল গোপী—রবীন্দ্রনাথ
(৫) আপনা—ক্ষ, রবীন্দ্রনাথ
(৬) বোলনি—সং; রোলনী—রবীন্দ্রনাথ
(৭) বিছুরি—ক্ষ, স, রবীন্দ্রনাথ
(৮) মঞ্জীর—ক্ষ, স, রবীন্দ্রনাথ
(৯) লোলনি—সং; দোলনি—সং
(১০) নীবিবন্ধ—রবীন্দ্রনাথ
(১১) বোলনি—স, রবীন্দ্রনাথ

টীকা—

মনহি মনহি আপন সোঁপি—মনে মনে আত্মসমর্পণ করিয়া।

বিসরি গেহ—গৃহ ভুলিয়া

বাহে—বাহুতে

এক নয়নে কাজর-রেহ ইত্যাদি—

"শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।২৯।৭ শ্লোকের ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ"র ভাব লইয়া লেখা।

কেহু কাহুক পথ না হেরি—ভাগবতের ১০।২৯।৪ "আজগ্মুরন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ" ভাব লইয়া রচিত।

(১০২) জয়জয়ন্তী

কানন দেবতি, বৃন্দা সখী তথি
রাইয়ের সরসি কূলে।
বিচিত্র ঝুলনা করিয়া রচনা
সুখদ বকুল মূলে॥
ঝুলনা উপরি নাগর নাগরী
আসিয়া বসিয়া রঙ্গে।
ঝুলায় ঝুলনা সকল ললনা
মদ গদ ভরে অঙ্গে॥
ঝুলনা ঝমকে রাধিকা চমকে
তা দেখি নাগর ডরে।

হাসিয়া হাসিয়া বাহু পসারিয়া
ধনীরে করল কোরে॥
রসবতী লৈয়া কোরে আগোরিয়া
ঝুলয়ে রসিক রায়।
সহচরী গণ ঝুলায় দ্বিগুণ
সুস্বরে পঞ্চম গায়॥
ঝুলনা ধরিয়া মধুর করিয়া
কহয়ে শেখর রায়।
দেবতা পূজিতে যাইবে তুরিতে
দিবস বহিয়া যায়॥

এই পদটি প্রাচীন কোন সংকলনে ধৃত হয় নাই।

(১০৩) মল্লার

দেখ সখী ঝুলত রাধা শ্যাম।
বিবিধ যন্ত্র সু— মেলি সুস্বর
তান মান সুঠাম॥
আষাঢ় গত পুন মাহ শাঙন
সুখদ যমুনা-তীর
চান্দিনি রজনী সুখময় সুখদয় ১
মন্দ মলয় সমীর॥ ২
পরিপূর্ণ সরোবর প্রফুল্লিত তরুবর
গগনে গরজে গভীর।
ঘোর ঘটা ঘন দামিনি দমকত
ঝিন্দু বরিখত নীর॥
(তাঁহি) কলপদ্রুম-তল ছাহ শীতল
রচিত-রতন-হিংডোর। ৩
ঝুলয়ে তছু পর গোরি শ্যামর
ঝুলায়ে সখী দুই ওর॥
তড়িত ঘন জনু দোলয়ে দুহুঁ তনু
অধরে মৃদু মৃদু হাস।
বদন হেম নিল কমল বিকশিত
স্বেদ-বিন্দু পরকাশ॥
ছরম হেরি কোই বিজন বীজই
কপূর তাম্বুল যোগায়।
সুরট মেঘ-ম- ল্লার গাওত

মোহন মৃদঙ্গ বাজায়॥
কুসুমচয় বর হার লটকত
ভ্রমর গুণ গুণ রোল ৪।
হংস সারস সুসর-শব্দিত
দাদুরি ঘন ঘন বোল॥
(দুহুঁ) ভালে চন্দন— চাঁদ চমকিত
তিলক রচিত কপোল ৫।
চঞ্চল মুকুট সুচারু চন্দ্রিক
পীঠ পর বেণি দোল॥
(দুহুঁ) শ্রবণে কুণ্ডল চপল ঝল মল
হৃদয়ে শশি-মণি-হার।
ঝলকে অভরণ ঝঙ্কৃত ঝন ঝন
ঝর্ঝিকত ঝুলন-বিহার॥
(কোই) মসৃণ ঘুসৃণ সুগন্ধি ছিরকত
শ্যাম-গোরি অঙ্গ হেরি।
সখী-ভাষ ৭ ইঙ্গিতহি দাস উদ্ধব
করত কুসুমক ঢেরি॥

রবীন্দ্রনাথধৃত পাঠ— তরু ১৫৬৯

(১) সুখোদয়
(২) মন্দ মন্দ মলয় সমীর
(৩) রচিত রতনহি ডোল
(৪) বোল
(৫) কপোল
(৬) দোলে
(৭) সখী ভাবে ইঙ্গিতহি

(১০৪) ধানশী

ঝুলনা হইতে আসিয়া ত্বরিতে
গগনে নিরখি বেলা।
ফুল তুলিবারে চলিলা সত্বরে
সকল আভীর-বালা॥
ভরি ফল-ফুলে শাখা সব লোলে
আসিয়া পরশে মূল।
সখী সব মেলি করিয়া ঢামালি
তোলয়ে বিবিধ ফুল॥

সকল কানন মণিতে বাধন
পরাগে পূরিত বাট।
করি মধু পান অলি করে গান
ময়ূর ময়ূরী নাট॥
সুগন্ধি করবী তোলয়ে গরবী
অশোক কিংশুক জবা।
এ থল-কমল তোলয়ে সকল
দিনমণি জিনি আভা॥
জাতী যূথি-ততি তোলল যুবতি
মল্লিকা মালতী চাঁপা।
পুন্নাগ কেশর তোলয়ে নাগর
গড়ল বিনোদ ঝাঁপা॥
রসিক নাগর গুণের সাগর
কুসুম রচন করে।
হাসিয়া হাসিয়া আইলা লইয়া
রাইয়েরে দিবার তরে॥
ভুজযুগ তুলি রাই সুবদনী
তোলয়ে লবঙ্গ ফুল।
রসিক-শেখর হইল বিভোর
দেখিয়া ভুজের মূল॥
ফুল ঝাঁপা লৈয়া যতন করিয়া
রাইর নিকট আসি।
ধনীর আঁচলে দিলেন বিভোলে
ফুলের সহিতে বাঁশী॥
পাইয়া মুরলী রাধিকা সে বেলি
রাখিলা বিশাখা পাশে।
বিশাখা যতনে করিলা গোপনে
শেখর দেখিয়া হাসে॥

টীকা— তরু ২৬২৯

ঢামালি—ধামালি, রং ঢং করিতে করিতে

(১০৫) বেহাগ রাগ

মন্দ পবন কুঞ্জ ভবন
মদন রাজ নব সমাজ
ভ্রমর ১ ভ্রমণ চাতুরি॥

দেখরি সখি শ্যাম চান্দ
ইন্দু-বদনি রাধিকা।
বিবিধ যন্ত্র সখিনি ২ বৃন্দ
গাওত রাগ মালিকা॥
তরল তাল গতি দুলাল ৩
নাচে নটিনি নটন সুর।
প্রাণনাথ ধরত হাত
রাই তাহে অধিক পুর॥
অংগ অংগ পরশ ৪ ভোর
কেহ রহত কাহুক ৫ কোর।
জ্ঞান দাস কহত ৬ রাস
যৈছন ৭ জলদ বিজুরি জোর॥

ক্ষণদা ২৯।৯
স ২০০
তরু ১০৬৬

পাঠান্তর—

তরু এবং বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ জ্ঞানদাসের পদাবলীতে আরম্ভ
দেখ রি সখী শ্যাম চন্দ ইন্দু বদনি রাধিকা

(১) ভ্রমর ভ্রমরী চাতুরী—ক্ষ
(২) যুবতীবৃন্দ—ক্ষ
(৩) তরল তার গতি দুলার—ক্ষ
(৪) পরশি—ক্ষ
(৫) কাহুক—স; কাহু কোর—রবীন্দ্রনাথ
(৬) গাওত রাস—ক্ষ
(৭) যৈছে—ক্ষ

টীকা—

এটি রাসের বর্ণনা।

(১০৬) **মায়ুর**

আজু বিপিনে যাওত ১ কান
মুরলি মুরত কুসুম-বাণ
জনু জলধর রুচির অংগ
ভংগ-নটবর শোহনি।
ইষত ২ হসিত বয়ন—চন্দ
তরুণি-গণ-নয়ন ৩ ফন্দ

বিম্বু-অধরে মুরলি-খুরলি
ত্রিভুবন-মন-মোহনি॥
কুসুম-মিলিত চিকুর-পুঞ্জ
চৌদিকে ভ্রমর ভ্রমরি গুঞ্জ
পিঞ্ছ-নিচয়—রচিত-মুকুট
মকর-কুণ্ডল-৪ ডোলনি।
চঞ্চল নয়ন খঞ্জন জোর
সঘন ধাওত শ্রবণ-ওর
গীম ৫ শোহন রতন-রঞ্জ
মোতিম-হার লোলনি॥
কটি পিত-পট কিঙ্কিনি বাজ
মদগতি ৬ আতি কুঞ্জর-রাজ
জানু লম্বিত কদম্ব-মাল
মত্ত মধুকর-ভোরণি।
অরুণ-বরণ চরণ-কঞ্জ
তরুণ-তরণি-কিরণ গঞ্জ
গোবিন্দ দাস-হৃদয় রঞ্জ ৭
মঞ্জু-মঞ্জির বোলনি॥

ভ ২৩০
স ৪১০
সং ২২৪
তরু ১৩০৫
কী ৩১

পাঠান্তর—

(১) আওত—সং
(২) হসিত মন্দ—সং
(৩) নয়ন ফন্দ—সমুদ্র; তরুণী নয়ন বয়ন ফন্দ—সং
(৪) দোলনী—সং
(৫) গীম শোহত রতন রাজ—সং, তরু
(৬) মদময় গতি—সং!
(৭) হৃদয় রঞ্জন—রবীন্দ্রনাথ

টীকা—

মুরতি মুরত কুসুম-বাণ—যেন মূর্তিমান কামদেব।

মুরলি-খুরলি—মুরলি বাদন অভ্যাস করেন।

সঘন ধাওত শ্রবণ-ওর—তাঁহার নয়ন যুগল যেন বারংবার কর্ণের দিকে ধাইয়া যাইতেছে; অর্থাৎ আকর্ণবিস্তৃত নয়ন।

গীম—গ্রীবা

শোহতর—অধিক শোভা করে

মঞ্জু—সুন্দর

(১০৭) সুহই

মরম কহিলুঁ মো পুন ঠেকিলুঁ
সে জনার পিরীতি-ফান্দে।
রাতি দিন চিতে ভাবতে ভাবিতে
তারে সে পরাণ কান্দে॥
বুকে বুকে মুখে চৌখে ১ লাগিয়া থাকে
তমু ২ মোরে সতত হারায়।
ও বুক চিরিয়া হিয়ার মাঝারে
আমারে রাখিতে চায়॥
হার নহোঁ পিয়া গলায় পরয়ে
চন্দন নহোঁ মাখে গায়।
অনেক যতনে রতন পাইয়া
থুইতে সোয়াস্ত না পায়॥
কপূর্র তাম্বুল আপনি সাজিয়া
মোর মুখ ভরি দেয়।
হাসিয়া হাসিয়া চিবুক ধরিয়া
মুখে মুখ দেই লেয়॥
সাজঞা কাচাঞা বসন পরাঞ
আবেশে লইয়া কোরে।
দীপ লৈয়া হাতে মুখ নিরখিতে
তিতিল নয়ান লোরে॥
চরণে ধরিয়া যাবক রচই
আউলাঞা বান্ধয়ে কেশ।
বলরাম চিতে ভাবিতে ভাবিতে
পাঁজর হইল শেষ॥

রবীন্দ্রনাথধৃত পাঠ— তরু ৬৭৭, ২৫২৬

(১) চোখে লাগি থাকি

(২) তভু পিয়া সদাই হারায়

(৩) সোয়াথ

টীকা—

বুকে বুকে মুখে চৌখে লাগিয়া থাকে
তমু মোর সতত হারায়॥
ইহাকেই প্রেমবৈচিত্ত্য বলে।

উজ্জ্বল নীলমণিতে শ্রীরূপ বলিয়াছেন যে নায়ক-নায়িকা যে প্রেম-তন্ময়তার জন্য নিকটে থাকিলেও একজন অন্যের সংগ অনুভব করিতে না পারিয়া বিরহে ব্যাকুল হন তাহাকেই প্রেমবৈচিত্ত্য বলে। ইহা প্রেমবৈচিত্র্য নহে।

যাবক রচই- আলতা পরাইয়া দেন।

(১০৮) **ধানশী**

শিশু কাল হৈতে বন্ধুর সহিতে
পরাণে পরাণে নেহা।
না জানি কি লাগি কো বিহি গঢ়ল
ভিন ভিন করি১ দেহা॥
সই কিবা সে পিরীতি তার।
আলস করিয়া নারি২ পাসরিতে
কি দিয়া শোধিব ধার॥
আমার অঙ্গের বরণ লাগিয়া
পীত বাস পরে শ্যাম।
প্রাণের অধিক করের মুরলী
লইতে আমার নাম॥
আমার অঙ্গেব বরণ সৌরভ
যখন যে দিগে পায়।
বাহু পসারিয়া বাউল হইয়া
তখন সে দিগে ধায়॥
লাখ কামিনী ভাবে রাতি দিনি
যে পদ সেবিতে চায়।
জ্ঞানদাস কহে আহীর-নাগরী
পিরিতে বান্ধিলা তায়॥

তরু ৬৮৭
কী ২৯১

পাঠান্তর—

(১) কৈলে—কী
(২) নারে পাশ দিতে—রবীন্দ্রনাথ
লাখ লাখ মিলি তারে রাতি দিন—কী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানদাসের পদাবলীর পাঠ এখানে মূলে ধৃত পাঠ অপেক্ষা ভাল মনে হয়—

জাগিতে ঘুমাতে নারি পাসরিতে

(১০৯) সওয়ারি

নিতুই নৌতুন পিরীতি দুজন
তিলে তিলে বাঢ়ি যায়।
ঠাঞি নাহি পায় তথাপি বাঢ়য়
পরিণামে নাহি থায়॥
সখী হে অদভুত দুহুঁ প্রেম।
এতদিন চাই ১ অবধি না পাই
ইথে ২ কি কষিল হেম॥
উপমার গণ সব কৈল আন
দেখিতে শুনিতে ধন্দ।
এ কি অপরূপ তাহার স্বরূপ
স্বভাবে করিলে অন্ধ॥
চণ্ডীদাস কহে দোহ ৩ সম হয়ে
এখানে সে বিপরীত।
এ তিন ভুবনে হেন কোন জনে
শুনি না দরবে চীত॥

তরু ৯১৩

রবীন্দ্রনাথধৃত পাঠ—

(১) ঠাঞি
(২) ইয়ে কি কারল হেম
(৩) দুহুঁ

টীকা—

পদটি খুব সম্ভব শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত রচিত হইবার পর চণ্ডীদাস ভণিতায় কোন ভক্ত কবি লিখিয়াছিলেন।

চরিতামৃতে আছে—

রাধাপ্রেম বিভু—যার বাঢ়িতে নাহি ঠাঞি।
তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়য়ে সদাই॥ (১।৪)

কৃষ্ণদাস কবিরাজ অবশ্য এই ভাবটি পাইয়াছিলেন ১।৪ শ্রীরূপের দান কেলি-কৌমুদী ভাণিকায়—

বিভুরপি কলয়ন্ সদাভিবৃদ্ধিং
গুরুরপি গৌরচর্য্যয়া বিহীনঃ।

মুহুরুপচিতবক্রিমাপি শুদ্ধো
জয়তি মুরদ্বিষি রাধিকানুরাগঃ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাধার সেই অনুরাগ জয়যুক্ত হউক, যে অনুরাগ বিভু অর্থাৎ সর্বব্যাপক হইয়াও ক্ষণে ক্ষণে বৃদ্ধিশীল হইতেছে, যাহা গুরু অথবা শ্রেষ্ঠ হইয়াও গৌরবচর্যা বা সম্মানাদি বিহীন হইয়াছে এবং যাহা মুহুর্মুহু বক্রিমা ভাবকে ধারণ করিয়াও বিশুদ্ধ হইয়াছে।

(১১০) **ধানশী**

সখী হে কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি১ অনু— রাগ বাখানিয়ে
অনুখণ নৌতুন হোয়।
জনম অবধি হৈতে ও রূপ নেহারলু
নয়ন না তিরপিত ভেলা।
লাখ লাখ যুগ হাম হিয়ে হিয়ে মুখে মুখে
হৃদয় জুড়ন নাহি গেলা॥
বচন-অমিয়া রস অনুখন শুনলু
শ্রুতি-পথে পরশ না ভেলি।
কত মধু-যামিনি রভসে গোঙায়লু
না বুঝলু কৈছন কেলি॥
কত বিদগধ জন রস অনুমোদই
অনুভব কাহু না পেখি ২।
কহ কবিবল্লভ হৃদয় জুড়াইতে
মিলয়ে কোটিমে একি ৩॥

পদরত্নাবলীতে পাদটীকা— তরু ৯৩৭

এই কবিতা সাধারণতঃ বিদ্যাপতির বলিয়া পরিচিত॥

রবীন্দ্রনাথ ধৃত পাঠান্তর—

(১) অনুভব বাখানিতে

(২) না দেখি

(৩) লাখে না মিলল একে—রবীন্দ্রনাথের চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি প্রবন্ধে ধৃত পাঠ।

বঙ্কিমচন্দ্র ১২৭৩ সালে কপালকুণ্ডলার 'আত্মমন্দিরে' অধ্যায়ে এই পদটি বিদ্যাপতির ভণিতায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ধৃত পাঠের সঙ্গে পদরত্নাবলীর পাঠের অনেক তফাত দেখা যায়—বঙ্কিমচন্দ্রের ধৃত পাঠ—

জনম অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুননু শ্রুতিপথে পরশ না গেল॥

কত মধুযামিনি রভসে গোঁয়ায়নু না বুঝনু কৈছনা কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ান না গেল॥
যত যত রসিক জন রসে অনুমগন অনুভব কাহু না পেখ।
বিদ্যাপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে লাখে না মিলল এক॥

সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বহরমপুরে বিদ্যাপতি ভণিতায় এই পদ পাইবার অনেক পূর্বে, বঙ্কিমচন্দ্র ইহা বিদ্যাপতি ভণিতায় পাইয়াছিলেন কিন্তু সারদাচরণের পাঠ অনেক ভাল। উহা নীচে দেওয়া হইল—

সখী কি পুছসি অনুভব মোয়।
সেই পিরীতি-অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিল ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহিঁ শুনলুঁ
শ্রুতি পথে পরশ না গেল॥
কত মধু যামিনি রভসে গোঁয়াইলুঁ
না বুঝলুঁ কৈছন কেলি।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি॥
কত বিদগধ জন রস অনুমগন
অনুভব কাহু না পেখ।
বিদ্যাপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলিল এক॥

আমাদের সম্পাদিত বিদ্যাপতি গ্রন্থে নগেন্দ্রনাথ গুপ্তকৃত এই পদের মৈথিল সংস্করণ মূল পাঠ রূপে দেওয়া হইয়াছে এবং পাদটীকায় সারদাচরণ মিত্র ধৃত পাঠ পাঠান্তর হিসাবে দেখানো হইয়াছে।

পদকর্তাদের পরিচয়

(কালানুযায়ী সজ্জিত)

১। **বিদ্যাপতি**—ইনি চতুর্দশ শতাব্দীর শেষপাদে মিথিলায় জন্মগ্রহণ করেন। অনেকগুলি স্মৃতির নিবন্ধ, গল্পের বই, ভ্রমণ কাহিনী, লিখনাবলী নামে আদর্শ পত্র লিখিবার বই এবং বিভাগসার নামে আইনের বইও লেখেন। লিখনাবলীর অনেক পত্রে তারিখ আছে ২৯৯ লক্ষ্মণ সম্বৎ বা ১৪১৮ খৃষ্টাব্দ। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইনি পদ রচনা করেন। ইনি শৈবধর্মাবলম্বী ছিলেন। নেপালের পুঁথি ও রাগভদ্রপুরের পুঁথিতে তাঁহার পদের যে ভাষা পাওয়া যায় তাহার সংগে বাংলাদেশে প্রচলিত পদের সাদৃশ্য খুব কম। বাঙালী বৈষ্ণবেরা তাঁহার পদ নিজেদের রুচি অনুযায়ী পরিবর্তন করিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে একজন বাঙালী কবিও বিদ্যাপতি ভণিতায় পদ লিখিতেন। ৭২ সংখ্যক পদটি খুব সম্ভব বাঙালী বিদ্যাপতির।

২। **চণ্ডীদাস**—শ্রীচৈতন্য বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদ আস্বাদন করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিতেন। প্রাক্-চৈতন্য চণ্ডীদাস খুব সম্ভব শুধু চণ্ডীদাস ভণিতায় পদ লিখিতেন। শ্রীচৈতন্যের পরে একজন কবি দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণিতায় অনেকগুলি ভাল ভাল পদ লিখিয়াছেন, কিন্তু পদগুলিতে শ্রীরূপ গোস্বামীর রচনার প্রভাব পড়িয়াছে। কৃষ্ণকীর্তনের রচয়িতা চণ্ডীদাসও কয়েকটি পদ রচনা করিয়াছেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে আর একজন চণ্ডীদাসের উদ্ভব হয়। তিনি বহু পদে নিজেকে দীন চণ্ডীদাস আখ্যায় পরিচিত করিয়াছেন। ইনি দুই হাজারের উপর পদ লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু খুব কম পদেই কবিত্বের ছাপ আছে। পদরত্নাবলীর ৫৪ সংখ্যক পদটি দীন চণ্ডীদাসের রচনা।

৩। **নরহরি**—শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয় শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ সহচর ছিলেন। তিনি সহজ সরল ভাষায় শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে অনেক পদ লিখিয়া গিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নরহরি চক্রবর্তী নামে আর একজন কবির উদ্ভব হইয়াছিল। তাঁহার ভাষা কৃত্রিম এবং তাঁহার রচিত পদ সাধারণতঃ আকারে দীর্ঘ; আর নরহরি সরকারের পদ আকারে ছোট অথচ রসে ভরা। নরহরি সরকার বৈদ্য জাতিসম্ভূত; তিনি বহু শিষ্যকে মন্ত্র প্রদান করেন। লোচনদাস তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে সর্বপ্রধান।

৪। **বলরাম দাস**—এই নামের দুইজন সুপ্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। একজন শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক। তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর অনুগত ছিলেন। দেবকীনন্দের বৈষ্ণব বন্দনায় আছে

সঙ্গীতকারক বন্দো শ্রীবলরাম দাস।
নিত্যানন্দচন্দ্রে যাঁর অকথ্য বিশ্বাস॥

ইঁহার রচিত পদগুলি চণ্ডীদাসের ভাষার মতন সহজ ভাষায় লেখা। সখ্য ও বাৎসল্য রসের পদ রচনায় ইনি অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন।

দ্বিতীয় বলরাম দাস জাতিতে বৈদ্য। গোবিন্দদাস কবিরাজের ইনি বংশধর ছিলেন। ইঁহার রচনার উপর গোবিন্দ দাসের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ব্রজবুলি মিশ্রিত আলংকারিক পদগুলি ইঁহার রচনা। পদরত্নাবলীর ৪১, ৫৩, ৮১, ৯৫ সংখ্যক পদগুলির রচনাশৈলির সহিত বলরাম-ভণিতাযুক্ত অন্যান্য পদের মিল নাই, কিন্তু গোবিন্দদাসের ১০১ সংখ্যক পদের ঝঙ্কার এই সব পদে পাওয়া যায়।

৫। **বংশীদাস**—ইনি শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক। কুলিয়ার ছকড়ি চট্টোপাধ্যায় ইঁহার পিতা। শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের পরে এবং সম্ভবতঃ শচীদেবীরও অপ্রকটের পর ইনি নবদ্বীপে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। ইনি কখনও বংশীবদন, কখনও বংশীদাস ভণিতায় পদ লিখিয়াছেন। ইঁহার পদের লালিত্য ও মাধুর্য সকলেরই হৃদয় হরণ করে। রবীন্দ্রনাথ ইঁহার দান লীলার কোন পদ ধরেন নাই বটে, কিন্তু সেই সব পদের—কবিত্ব অনুপম।

৬। **যদুনাথ দাস**—ইনি শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক; শ্রীচৈতন্যের পিতৃবন্ধু রত্নগর্ভ আচার্যের পুত্র। বৃন্দাবন দাস ইঁহারই উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—

যদুনাথ কবিচন্দ্র প্রেমরসময়
নিরবধি নিত্যানন্দ যাঁহার সদয়॥

ইঁহার 'ভ্রমর গীতার' বঙ্গপুঁথি অনেকস্থলে পাওয়া যায়। ইঁহার রচিত পদগুলিও চণ্ডীদাস রীতিতে লেখা। ইনি যদুনন্দন দাস হইতে পৃথক্ ব্যক্তি।

৭। **অনন্ত দাস**—ইনি অদ্বৈত আচার্যের পরিকর এবং শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক। অনন্ত রায় এবং অনন্ত আচার্য ভণিতায় যে সব পদ দেখা যায় তাহা অন্য কবির রচনা মনে হয়। অনন্ত দাসের ভাষাও বিদ্যাপতি-ঘেঁসা নহে, চণ্ডীদাসের তুল্য।

৮। **মাধব দাস**—ইঁহারই কথা বোধ হয় দেবকীনন্দনের বৈষ্ণব বন্দনায় বলা হইয়াছে—

মাধব আচার্য বন্দো কবিত্ব শীতল।
যাঁহার রচিত গীত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল॥

আচার্য উপাধি ধারী বৈষ্ণবের পক্ষে দাস ভণিতা দেওয়া কিছু বিচিত্র নহে। কবি গোবিন্দ আচার্যও গোবিন্দদাস ভণিতায় পদ লিখিতেন। মাধব নাম সেকালের বহু লোকের ছিল; সুতরাং মাধবদাস অন্য লোকও হইতে পারেন।

৯। **লোচন**—লোচনের পুরো নাম ত্রিলোচন, পিতার নাম কমলাকর দাস, মাতার নাম সদানন্দী, নিবাস বর্ধমান জেলার কোগ্রামে। ইতি শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল গ্রন্থে নিজের পরিচয় দিয়া লিখিয়াছেন—'শ্রীনরহরি দাস মোর প্রেমভক্তিদাতা,' লোচনের ধামালীগুলি

কথ্য ভাষায় লেখা এবং অত্যন্ত সুমিষ্ট। ইনি শ্রীগৌরাঙ্গের নাগরীভাবের উপাসক ছিলেন। শ্রীচৈতন্যকে ইনি দর্শন করেন নাই।

১০। **জ্ঞানদাস**—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে নিত্যানন্দ-শাখাভুক্ত যে জ্ঞানদাসের উল্লেখ আছে তিনিই সম্ভবতঃ অদ্বিতীয় কবি জ্ঞানদাস। নিত্যানন্দের বেশভূষা, চালচলন সম্বন্ধে তিনি যে ভাবে লিখিয়াছেন তাহাতে মনে হয় যে ইনি তাঁহাকে স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন। বর্ধমান জেলায় কাঁদড়ায় ইঁহার বাসস্থান ছিল। জ্ঞানদাসের কতকগুলি পদে ব্রজবুলির সংমিশ্রণ দেখা যায়; অন্য পদগুলি চণ্ডীদাসী রীতিতে রচিত। পূর্বোক্ত পদগুলি শেষোক্ত পদসমূহের তুলনায় কবিত্বাংশে হীন। ইহা দেখিয়া মনে হয় যে জ্ঞানদাস প্রথমে বিদ্যাপতির অনুসরণ করিয়া পদ লিখিয়াছিলেন, কিন্তু পরিণত বয়সে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে প্রাণের ভাষা যাহা তাহা সহজ ও সরল হয়। শ্রীচৈতন্যোত্তর কবিদের মধ্যে জ্ঞানদাস সর্বশ্রেষ্ঠ।

১১। **শ্রীনিবাস**—শ্রীনিবাস আচার্য পাঁচটি মাত্র পদ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। রবীন্দ্রনাথ যে পদটি তুলিয়াছেন সেটিই শ্রীনিবাসের শ্রেষ্ঠ রচনা। শ্রীনিবাস পুরী যাইবার পথে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের কথা শুনিতে পান। সুতরাং তিনি ১৫১৭-১৮ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি শ্রীবৃন্দাবন হইতে গোস্বামীদের রচিত শাস্ত্র সমূহ আনিয়া বাংলা দেশে প্রচার করেন। গোবিন্দদাস কবিরাজ ইঁহার শিষ্য। ইঁহার পুত্র গতিগোবিন্দও একজন কবি ও সংগীতজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহারই বংশে রাধামোহন ঠাকুর জন্মগ্রহণ করিয়া পদামৃত-সমুদ্র সঙ্কলন করেন।

১২। **নরোত্তম**—ইনি শ্রীনিবাস অপেক্ষা বয়সে কিছু ছোট ছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীনিবাসের সহিত ইঁহার ঘনিষ্ঠতা হয়। নরোত্তমের অভিন্নহৃদয় বন্ধু রামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীনিবাসের শিষ্য ছিলেন। নরোত্তম কীর্তনগানের গড়ণহাটি রীতির প্রবর্তন করেন। ইনি একাধারে উচ্চশ্রেণীর কবি, সাধক ও সংগীতশাস্ত্রবেত্তা ছিলেন। ইঁহার 'প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা' ও 'প্রার্থনা' বৈষ্ণবদের নিত্য পাঠ্য। খেতুরির মহোৎসবে ইনি কীর্তন গান প্রচার করেন ও রাধাকৃষ্ণের মূর্তির সঙ্গে সঙ্গে গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার মূর্তি স্থাপন করেন।

১৩। **গোবিন্দদাস**—গোবিন্দদাস কবিরাজের পিতা চিরঞ্জীব সেন নরহরি সরকার ঠাকুরের অনুগতজন হিসাবে শ্রীচৈতন্যের চরণ দর্শন করিয়াছিলেন। ইঁহার নিবাস ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলার নিকটে তেলিয়া-বুধুরি গ্রামে। চল্লিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত ইনি শাক্ত ছিলেন, দেবী বিষয়ক পদ লিখিতেন এবং পুত্রের নাম দিব্যসিংহ রাখিয়াছিলেন। পরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র কবিরাজের মধ্যস্থতায় শ্রীনিবাস আচার্যের কৃপা লাভ করেন। শ্রীজীব গোস্বামী ইঁহার রচিত পদ পাঠ করিয়া পরম আনন্দ পাইতেন। তিনি পত্র দ্বারা কবিকে সম্বর্ধিত করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণব সমাজে গোবিন্দদাসই সর্বাপেক্ষা অধিক জনপ্রিয় কবি। কিন্তু তাঁহার আলঙ্কারিক ভাষা টিকা-টিপ্পনি ছাড়া বুঝা যায় না।

১৪। **রায় বসন্ত**—ইনি নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য; জাতিতে ব্রাহ্মণ। রবীন্দ্রনাথ ইঁহার পদের খুব সমাদর করিতেন।

১৫। **রায় শেখর**—রায় শেখর শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকারের ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দনের শ্রীচরণাশ্রিত ছিলেন। গোবিন্দদাসের ন্যায় ইনিও রাধাগোবিন্দের অষ্টকালীয় লীলার পদ লিখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ ধৃত ৬২ সংখ্যক পদটি বোধ হয় তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা। কবিশেখর ভণিতাযুক্ত পদগুলির ভাব ও ভাষার সহিত রায় শেখরের রচনার মিল নাই। কবি শেখর রায় শেখর হইতে ভিন্ন ব্যক্তি।

১৬। **উদ্ধব দাস**—উদ্ধব দাস নামে দুইজন কবি ছিলেন। প্রথম জন হইতেছেন নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য; আর দ্বিতীয় জন রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য। সুতরাং দুইজন কবির মধ্যে একশত বৎসরের অধিক ব্যবধান।

১৭। **কবিবল্লভ**—গোবিন্দদাস কয়েকটি পদে তাঁহার কবি-বন্ধু বল্লভের নাম করিয়াছেন। ইনি কবিবল্লভ হইতে পারেন। 'রসকদম্ব' গ্রন্থের লেখকেরও নাম কবিবল্লভ—কিন্তু তিনি পদকর্তা নহেন। পদকর্তা বল্লভদাস নরোত্তম দাসের শিষ্য ছিলেন। 'জনম অবধি' পদটি বিদ্যাপতির কি কবিবল্লভের তাহা বলা কঠিন।

১৮। **যদুনন্দন দাস**—শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা দেবীর শিষ্য; নিবাস মালিহাটি গ্রামে। ইনি অনুবাদে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামীর বিদগ্ধ মাধবের অনুবাদ এতই সুন্দর যে ইহাকে স্বতন্ত্র কাব্য বলা চলে। ইনি বহু পদ লিখিয়াছেন। 'কর্ণানন্দ' ইঁহার রচনা বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

১৯। **জগন্নাথ দাস**—পদকল্পতরুতে জগন্নাথ দাসের নয়টি পদ আছে। একটি পদের ভণিতায় তিনি 'অভিনব সৎকবি দাস জগন্নাথ' লিখিয়াছেন। ইঁহার যে পদটি প্রচলিত পদের সাদৃশ খুব কম। বাঙ্গালী বৈষ্ণবেরা তাঁহার পদ নিজেদের রুচি পাওয়া যায়। জগন্নাথ দাসের পরিচয় অজ্ঞাত।

২০। **নরসিংহ দাস**—পরিচয় জানা যায় না। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় অনুমান করেন যে তোটকছন্দে গোষ্ঠের পদ-লেখক দেব নৃসিংহ এবং নরসিংহ দাস এক ব্যক্তি হইতে পারেন।

২১। **যাদবেন্দ্র**—ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বীরভূম জেলায় প্রাদুর্ভূত হন। সখ্যরসের পদ রচনায় ইনি খুব কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন (ভারতবর্ষ ১৩৩৬ শ্রাবণ) যে ইঁহার স্ত্রী স্বর্ণলালীও পদ রচনা করিতেন।

২২। **প্রেমদাস**—১৬৩৪ শকে বা ১৭১২ খৃষ্টাব্দে ইনি কবিকর্ণপুর রচিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক স্বাধীন ভাবে পদ্যানুবাদ করেন। তাহার চার বৎসর পরে বংশীশিক্ষা গ্রন্থ লেখেন। এই গ্রন্থে আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে তিনি জানাইয়াছেন যে

তাঁহার আসল নাম পুরুষোত্তম মিশ্র; পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি সিদ্ধান্তবাগীশ উপাধি পাইয়াছিলেন।

২৩। **বিপ্রদাস ঘোষ**—কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

২৪। **বৃন্দাবন**—শ্রীচৈতন্যভাগবতের রচয়িতা বৃন্দাবন দাস পদরত্নাবলী ধৃত বংশীশিক্ষার পদলেখক বৃন্দাবন নহেন। এই বৃন্দাবন কে. কোথায় ছিলেন, কিছুই জানা যায় না।

ভণিতা বিভ্রাট

প্রাচীন পুথি ও সঙ্কলনগ্রন্থাদিতে কতকগুলি পদের যে ভণিতা পাওয়া যায় তাহা রবীন্দ্রনাথ-ধৃত ভণিতা হইতে পৃথক। পদসংখ্যা প্রথমে উল্লেখ করিয়া ভণিতার পার্থক্য নির্দেশ করিতেছি—

পদসংখ্যা ৪—রবীন্দ্রনাথের ধৃত পদে ভণিতা নাই। পদরসসারের পুথিতে যাদবেন্দ্র ভণিতা পাওয়া যায়।

৮—রবীন্দ্রনাথ বলরাম ভণিতা ছাপিয়াছেন কিন্তু পদকল্পতরুতে উহা ঘনরাম ভণিতায় দেখা যায়। ব্রহ্মচারী অমর চৈতন্যও বলরাম ভণিতায় ঐ পদ পাইয়া বলরাম দাসের পদাবলীতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

২৪—গীতচন্দ্রোদয়ে, পদকল্পতরুতে ও কীর্তনানন্দে পদটি চণ্ডীদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়, কিন্তু ঢাকা মিউজিয়মের পুথিতে জগন্নাথ দাস এবং পদরত্নাকরে ভণিতা লোচন দাস।

২৫—গীতচন্দ্রোদয় প্রভৃতি প্রাচীন সংকলন গ্রন্থে জ্ঞানদাস ভণিতা, কিন্তু পদরত্নাকরে বলরাম দাস ভণিতা।

৪৬—পদটি অধিকাংশ সংকলন গ্রন্থেই জগন্নাথ দাস ভণিতায় আছে, কিন্তু কীর্তনানন্দে গোবিন্দদাস ও পদরসসারে দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণিতা দেখা যায়।

৪৭—ক্ষণদা গীতচিন্তামণিতে ভণিতায় অনন্তের নাম, কিন্তু পদকল্পতরুতে নরোত্তমের। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীনতর ক্ষণদার ভণিতাই মানিয়া লইয়াছেন।

৬৩—পদামৃতসমুদ্রে ও পদকল্পতরুতে জ্ঞানদাস ভণিতা আছে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পদরত্নাবলীতে ভণিতা ধরিয়াছেন বলরামের।

৬৬—পদকল্পতরু প্রদত্ত বিদ্যাপতি ভণিতাই রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন, কিন্তু পদরস-সারে ও পদরত্নাকারে শেখর ভণিতা পাওয়া যাইতেছে।

৭৪—রবীন্দ্রনাথ পদটির দীনুদাস ভণিতাযুক্ত পাঠান্তর দিয়াছেন, আবার সূচীপত্রের পাদটীকায় লোচনদাসেরও ভণিতা দিয়াছেন। পদকল্পতরুতে ভণিতা দেওয়া নাই; বঙ্কিমচন্দ্রও কমলাকান্তের দপ্তর লিখিবার সময় ভণিতা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই।

৯৫—পদকল্পতরু ও কীর্তনানন্দের প্রমাণবলে রবীন্দ্রনাথ বলরাম দাস ভণিতায় পদটি ছাপিয়াছেন। "বসুমতী"র প্রাচীন কবির গ্রন্থাবলীতে জ্ঞানদাস ভণিতা আছে।

১০৮—রবীন্দ্রনাথ পদকল্পতরু অনুসারে পদটি জ্ঞানদাসের ভণিতাসহ ধরিয়াছেন; কীর্তনানন্দে উহা নরহরি ভণিতায় পাওয়া যায়।

১১০—পদকল্পতরুতে কবিবল্লভ ভণিতা আছে, কিন্তু ১২৭৩ সালে বঙ্কিমচন্দ্র উহা বিদ্যাপতির ভণিতাসহ কপালকুণ্ডলায় তুলিয়াছেন। সারদাচরণ মিত্র ইহার উৎকৃষ্টতর পাঠ বিদ্যাপতি ভণিতায় পাইয়াছেন।

নির্ঘণ্ট